বরণীয়



শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বরণীয়

BARANIYA

An Authentic Narrative of the Author's Contact with some of the prominent figures of the Bengali Society

Price Rs. 5·00 (Rupees Five only)

By **Jogesh Chandra Bagal**

বরণীয়

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

এ. মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ,- কলিকাতা-১২

এম

প্রথম সংস্করণ, কার্তিক ১৩৬৬

প্রকাশক :
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেকটার
এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট
সুভাষ সিংহ রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীভোলানাথ হাজরা
রূপবাণী প্রেস
৩১, বাদুড়বাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মূল্য : ৫·০০ পাঁচ টাকা মাত্র

ভূমিকা

মনীষী রাজনারায়ণ বসু "সেকাল আর একাল" পুস্তকে বাংলা দেশের শিক্ষিত ও ভদ্রসমাজে অর্ধশতাব্দীর ব্যবধানে যে আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে তদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কোন দেশ বা জাতির ইতিহাসে পঞ্চাশ বা ষাট বৎসর সময়ের দিক হইতে সামান্য বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে যে কত বিস্ময়কর পরিবর্তন— কি সামাজিক কি রাজনৈতিক নানা বিষয়ে ঘটিতে পারে তাহা আমরা আমাদের জীবনে প্রত্যক্ষ করিতেছি। এবম্বিধ সামাজিক বিবর্তন বা যুগান্তকারী পরিবর্তনের কথা বিভিন্ন ধরনের পুস্তক পাঠে আমরা অবগত হইতে পারি। মনীষী রাজনারায়ণের উক্ত গ্রন্থ এইরূপ এক ধরনের ইতিহাস-পুস্তক। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক বিবর্তন বা রূপান্তরের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই আর এক খানি গ্রন্থ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" হইতে। সামাজিক বিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাস বাংলায় এইখানিই মনে হয় প্রথম।

আর এক শ্রেণীর গ্রন্থ হইতেও আমরা এই সামাজিক বিবর্তনের ক্রম অনুধাবন করিতে পারি। ইহা হইল "আত্মজীবনী"। উনবিংশ শতাব্দীর কথা কয়েকখানি বিশিষ্ট আত্মজীবনীতে বিধৃত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমরা রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মজীবনী, রাসসুন্দরীর আত্মকথা এবং বিপিনচন্দ্র পালের "আমার ৭০ বৎসর" বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন নামে প্রকাশিত আত্মজীবনী হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিককার অনেক কথা আমাদের জ্ঞান-গোচর হইয়াছে। বাঙালীদের লিখিত কয়েকখানি তথ্যপূর্ণ ইংরেজী আত্মজীবনীও রহিয়াছে। বর্তমান যুগেও কয়েকজন প্রবীণ ও বিখ্যাত শিল্পী, বৈজ্ঞানিক ও কথা-সাহিত্যিক তাঁহাদের জীবনকথা এবং তৎপ্রসঙ্গে সমকালের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী সম্বন্ধেও কয়েকখানি গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত করিয়াছেন।

জীবনীকারগণের অধিকাংশই সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতে উদ্ভূত হওয়ায় বাংলার সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ, সম্পদ দৈন্য, আনন্দ নিরানন্দ, আশা নিরাশার কথা এই সকল পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে বিস্তর। আবার সেই সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সমকালীন শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রযত্ন ও প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত জীবন-কথার মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল পুস্তকে বর্তমান যুগের কথা ব্যক্তিগত বিষয়াদি বাদ দিয়াও আমরা যথাযথ জানিবার অবকাশ পাই। এদিক হইতে সামাজিক ইতিহাস রচনায় আত্মচরিত, আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথা বহুলাংশে আকরের মর্যাদা পাইবার যোগ্য।

বর্তমান পুস্তকখানি আমরা সাধারণভাবে যে অর্থে জীবন-চরিত, আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথা বুঝিয়া থাকি ইহা সে পর্যায়ের নহে। গত পঞ্চাশ বৎসরে আমি পল্লী বাংলার এবং কতকাংশে শহর বাংলার যে সকল নামী ও অনামী অথচ সকলেই শ্রদ্ধেয় বঙ্গ সন্তানের সংস্পর্শে আসিয়াছি তাঁহাদের মাত্র কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয়ের কথাই নিজের জীবনকথা প্রসঙ্গে লিখিয়া রাখিলাম। পাঠক-পাঠিকা লক্ষ্য করিবেন আমি শুধু মৃত ব্যক্তিদের কথাই এখানে প্রকটিত করিয়াছি। জীবিত এমন বহু ব্যক্তি এখনও রহিয়াছেন, যাঁহাদের জীবন ও কর্মের ছাপ আমার উপরে পড়িয়াছে যথেষ্ট। কিন্তু নানা কারণে তাঁহাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার বিষয় প্রকাশে বর্তমানে বিরত হইতে হইল। আমার পরিচিত মৃত মনিষী-দের মধ্যে কাহারও কাহারও কথা পুস্তক হইতে বাদ দিতে হইয়াছে। তবে অন্যত্র তাহা পূর্বেই প্রকাশিত করিয়াছি। তাঁহাদের কথাও পুস্তকখানিতে গ্রথিত করা সম্ভব হইলে আমি সুখী হইতাম।

গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কত বিষয়েরই না পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে আবহমান কাল হইতে একটি শাশ্বত সত্বা যুগে যুগে অনুভূত হইয়া থাকে মানুষের মনে। মানব-চরিত্র গঠনে এই শাশ্বত সত্বার অনুভূতি বিশেষভাবে সহায়তা করে। সামাজিকতাবোধ, মমত্ববোধ পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি মানুষকে সমাজবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখে একসূত্রে গ্রথিত পুষ্পমালার মত। এই বোধের যখন যেখানে অভাব ঘটে তখনই সেখানে অসংযম উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অনাচার দেখা দেয়। শাসকশ্রেণীর মধ্যে যেমন এরূপ ঘটিয়া থাকে শাসিত মনুষ্যগোষ্ঠীর মধ্যেও

এরূপ ঘটা সম্ভব। গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে মনুষ্য সমাজের শাশ্বত সত্বা একারণে পদে পদে ব্যাহত হইয়াছে। শাসকশ্রেণীর এখন বিলুপ্তি ঘটিয়াছে কিন্তু আমরা যাহারা শাসিত বা পরাধীন ছিলাম তাহারা স্বাধীনতা লাভের পরেও কি শাশ্বত সত্বার সম্যক্ অনুভব করিতে পারিতেছি ?

ইহার মূলে রহিয়াছে এমন কতকগুলি ব্যাপার যাহার প্রতি আমাদের এখন আর উদাসীন থাকিলে চলিবে না। শৈশব হইতেই নরনারী নির্বিশেষে চরিত্র গঠনের সর্বপ্রকার আয়োজন থাকা আবশ্যক। শিশু ও কিশোরের সম্মুখে এমন আদর্শ ধরিয়া রাখা উচিত যাহাতে তাহারা সমাজের প্রতিটি মনুষ্যকে আত্মীয় বা একান্ত আপনার জন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা, পল্লীর পরিবেশ, চরিত্রবান সমাজনেতা ও সাধারণ মানুষকে কিশোর কিশোরীরা সম্মুখে পাইলে তাহাদেরও জীবন গঠনের আদর্শকে ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আনিতে পারে। আদর্শ শিক্ষাব্রতী, আদর্শ নেতা, আদর্শ সাধারণ মানুষের প্রাচুর্য না হউক অন্ততঃ অপ্রতুলতা না ঘটায় বিগত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশে ভাবে ও কর্মে যুগান্তর আনয়ন সম্ভবপর হইয়াছে।

নিছক রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রচেষ্টাই আমাদের বেশী করিয়া চোখে পড়ে, কিন্তু ইহার অন্তরালে যে বিবিধ জাতি গঠনমূলক প্রযত্ন ও প্রয়াস চলিয়াছিল তাহার বিষয় আমরা ক'জনা মনে রাখি। ব্যক্তিগত ভাবে এই সকল প্রযত্নের দ্বারা জীবন তথা জীবনাদর্শ গঠনে বিশেষভাবে সহায়তা লাভ করিয়াছি। এমন সকল আদর্শনিষ্ঠ নামী ও অ-নামী লোকের সংস্রবে আসিয়াছি যাহার ফলে শতবিধ বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও একটি সহজ পথ কাটিয়া লওয়া সম্ভব হইয়াছে। বিভিন্ন লোকের জীবনকথা প্রসঙ্গে পাঠক-পাঠিকা এবিষয়টি লক্ষ্য করিতে পারিবেন। শিক্ষাব্রতীর শিক্ষাদানে নিষ্ঠা, ছাত্রের অধ্যয়নে তৎপরতা, নেতৃবৃন্দের সহজ জীবন যাপন,সাধারণ মানুষের পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও মমতা জাতি গঠনে এ সকল যেন এক একটি খুঁটি। ইহার প্রতুলতা থাকায় মনে হইতেছে আমাদের পক্ষে আত্মশক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠ হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। আমার মত শত শত, সহস্র সহস্র বঙ্গ সন্তান নিশ্চয়ই এই সময়ে ঐ সকল কারণে প্রাণ-প্রাচুর্য লাভে সমর্থ হইয়াছেন।

এখন সাধারণ হইতে একটু বিশেষে আসি। বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশে বিদ্যা চর্চা তথা সাহিত্য দর্শন ইতিহাস শিল্প বিজ্ঞান অনুশীলনের

নূতন নূতন ধারা অনুসৃত হইয়া ক্রমশই এই সকল বিষয় উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। এখানে আমার সঙ্গে যে বিষয়টির ঘনিষ্ঠ যোগ তাহার সম্বন্ধেই দুই একটি কথা বলিব। ইতিহাস চর্চার পুরাতন পথ পরিত্যাগ করিয়া, আচার্য যদুনাথ সরকার নূতন নূতন আকর আবিষ্কার করত বিখ্যাত ইতিহাস-গ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই ইতিহাস-চর্চার ধারা শিষ্য-প্রশিষ্যগণ কর্তৃক গৃহীত ও অবলম্বিত হওয়ায় বাংলা দেশে ইতিহাস, সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণার ফল আমরা গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে প্রচুর লাভ করিয়াছি। ইহার দ্বারা দেশ ও সমাজ যে বিশেষ উপকৃত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে তাহা বলাই বাহুল্য। বর্তমানে কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যত্যয় ঘটিলেও এই"বৈজ্ঞানিক"ধারা বা পদ্ধতি অনুসরণে আমাদের বিদ্যাচর্চা অধিকতর ত্বরান্বিত হইবে, এবিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। বর্তমান গ্রন্থপাঠে বুঝা যাইবে. গত ত্রিশ বৎসরের গবেষণা কার্যে আমিও এই ধারা অনুসরণ করিতে যথাসাধ্য যত্ন লইয়াছি।

আমার জীবনতন্ত্র গঠনে বিবিধ বিষয়াভিজ্ঞ খ্যাত অখ্যাত নানা লোকের নিকট হইতেই এই দীর্ঘ জীবনে প্রেরণা লাভ করিয়াছি। পাঠক গ্রন্থখানিতে দেখিতে পাইবেন. ইঁহাদের মধ্যে পল্লীর নিরক্ষর বা সাক্ষর অধিবাসী, নিরভিমান অভিভাবক সামান্য শিক্ষিত এবং বিবিধ বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন শিক্ষাব্রতী সমাজসেবী, কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, বিপ্লবী এবং রাজনৈতিক নেতারাও রহিয়াছেন। বিগত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের নিমিত্ত বহু নেতা ও সাধারণ ব্যক্তি অশেষ দুঃখবরণ ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের এতাদৃশ কার্য-কলাপের বিষয় বিবিধ পুস্তকে নানাভাবে বর্ণিত ও আলোচিত হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অন্যান্য বিষয়াভিজ্ঞ মানুষের কথাও আমরা কমবেশী অবগত হই। কিন্তু এইরূপ বহু মনীষী, শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবী এবং সাহিত্যিক সমাজে অবস্থান করেন যাঁহাদের দুঃখবরণ, ত্যাগ স্বীকার এবং তিলে তিলে আত্মদানের কথা কোন পুস্তকে সাধারণতঃ লিপিবদ্ধ থাকে না, মানুষ অল্পকাল পরেই তাঁহাদের নাম পর্যন্ত ভুলিয়া যায়।

কিন্তু এই অগণিত ত্যাগী, প্রীতিপরায়ণ সমাজসেবীরা প্রতিনিয়ত তাঁহাদের কার্যের ভিতর দিয়া সমাজকে যে সুপথে নিয়ন্ত্রিত করেন তাহার একটি চিরন্তন অলিখিত ইতিহাস আছে। সমাজের বুকে তাঁহাদের কৃতকর্মের

ছাপ এমন স্পষ্ট ও সহজভাবে পড়িয়া থাকে যে পরবর্তীরা তাহাকে নিরতিশয় স্বাভাবিক বলিয়াই ধারণা করিয়া লয়। জীবিত কালে এই সকল মানুষ সেণ্ট পলের ভাষায় যাঁহারা "সংসারের লবণ" তাঁহারা সমাজকে স্বাদু বা বাসযোগ্য করিয়া তোলেন। জীবনান্তে ইহার রেশ দীর্ঘকাল ধরিয়া চলে। একটু আগে যেমন বলিয়াছি পরবর্তীদের নিকট ইহা একান্ত সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। আদর্শে নিষ্ঠা, কর্মে তৎপরতা, সেবায় অনুরক্তি এই সকল মানুষের জীবনের প্রধান উপজীব্য হইয়া উঠে। আমি জীবনে যেমন এই সব গুণান্বিত খ্যাতনামা ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়াছি তেমনি বহু তথাকথিত অ-খ্যাত মানুষের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়া তাঁহাদের মধ্যেও এই সমুদয় গুণ প্রচুর মাত্রায় প্রত্যক্ষ করিয়াছি, প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইয়াছি এবং তাঁহাদের মাধ্যমে আমার জীবন-পথের পাথেয়েরও সন্ধান পাইয়াছি। আজ তাঁহাদিগকে অতীব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

বর্তমান গ্রন্থে এবং অন্যত্র যাঁহাদের কথা লিখিয়াছি তাঁহারা ব্যতীত আরও অনেকের সম্পর্কে অনুরূপভাবে নানাকথা লিপিবদ্ধ করা চলে। কিন্তু একজনের পক্ষে তাহা নিশ্চয়ই সম্ভব নহে। আমার সমধর্মীরা এইরূপ বিষয় লইয়া যদি লেখনী পরিচালনা করেন তাহা হইলে সমাজের পক্ষে তাহা বিশেষ কল্যাণকর হইবে। বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে আমার সংস্রবের কথাই বিশেষ ভাবে পুস্তকখানিতে বিবৃত হওয়ায় আমার নিজের বিষয়ও নানাভাবে বলিতে হইয়াছে, এজন্য আমি নিতান্তই সংকোচ বোধ করিতেছি। তথাপি এখানি প্রচলিত আত্ম জীবনীর মত করিয়া লেখা হয় নাই, ব্যক্তিগত জীবনের অন্তরালে যে সব প্রেরণা কার্য করিয়াছে তাহারই কিছু কিছু বহিঃপ্রকাশ বরণীয়দের জীবন-কথা প্রসঙ্গে পাঠক-পাঠিকা ইহাতে পাইবেন।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে বর্ণিত বিবিধ কাহিনী বিভিন্ন সময়ে নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রিকাগুলি যথাক্রমে—'প্রবাসী,' 'শনিবারের চিঠি', 'বসুধারা', 'জয়শ্রী', 'মন্দিরা', 'শিক্ষা', 'বাংলার শিক্ষক', এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত হয়। এ সমুদয় পত্র পত্রিকার সম্পাদক ও কর্তৃস্থানীয়দের আমি এই সূত্রে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এই পুস্তকখানি গ্রন্থনে বিবিধ ব্যক্তির সহায়তা আমাকে শারীরিক অপটুতার জন্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। উহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ না করিলে আমি প্রত্যবায়গ্রস্ত হইব। শ্রীমান কানাইলাল দত্ত ও বিমল দেব

আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। পুস্তকখানি যে প্রায়-নির্ভুল আকারে বাহির হইয়াছে তাহা মুখ্যত শ্রীযুক্ত গৌতম সেন কর্তৃক প্রুফ পরীক্ষণের গুণে। শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী পুস্তক প্রকাশে সবিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। পরিশেষে আরও উল্লেখযোগ্য যে সুপ্রসিদ্ধ কাগজ-ব্যবসায়ী 'রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স'-এর পক্ষে শ্রীযুক্ত নিতাইলাল দত্ত ও গৌরলাল দত্ত প্রয়োজনীয় কাগজ সরবরাহ করায় ইহা এত শীঘ্র গ্রন্থন সম্ভবপর হইয়াছে। পুস্তকখানি প্রকাশে শ্রীযুক্ত অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের তৎপরতা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। এখানে যাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইল এবং যাঁহাদের নাম উল্লেখ করা সম্ভব হইল না তাঁহাদের প্রত্যেককেই ধন্যবাদ জানাই। ইতি—১০ই কার্তিক, ১৩৬৬।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

সূচীপত্র

গুরুমহাশয়

আজকাল 'গুরু' বা 'গুরুমহাশয়' কথাটি শুনি না। 'শিক্ষক', 'শিক্ষিকা', 'শিক্ষাব্রতী' উহার স্থান অধিকার করিয়াছে। সেকালে গুরু বা গুরুমহাশয় বলিতে কেবলমাত্র পাঠশালার শিক্ষককেই বুঝাইত। অর্ধ শতাব্দী পূর্বেকার এইরূপ একজন গুরুমহাশয়ের কথা এখানে বলি।

গ্রামে ছিল আমার বাস। গ্রামে কয়েকটি পাড়া বা পল্লী। আমাদের পল্লীতে শৈশব হইতে এই গুরুমহাশয়ের পাঠশালা দেখিয়াছি। পূর্বে অন্যান্য গুরুর পাঠশালা ছিল, কিন্তু তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় আমার ঘটে নাই। একজন গুরুকে কেন্দ্র করিয়াই এই পাঠশালার উদ্ভব হইত। আধুনিক কালে স্কুল করিতে হইলে কমিটি থাকে—সভাপতি, সম্পাদক, সদস্যদের ছড়াছড়ি। আগেকার পাঠশালার এরূপ আড়ম্বর ছিল না। গুরুমহাশয় ছিলেন পাঠশালার সর্বেসর্বা—মধ্যমণি। এইরূপ গুরুর পাঠশালাতেই শৈশবে আমরা লেখাপড়া আরম্ভ করিয়াছি।

আমাদের গুরুমহাশয় বিকলাঙ্গ ছিলেন। সচরাচর বিকলাঙ্গ বলিতে যাহা বুঝি তিনি সেরূপ ছিলেন না। তাঁহার দেহের ঊর্ধ্ব ভাগ বেশ সবল ছিল। নিম্নাঙ্গ দুর্বল, পায়ের দিকটা সরু; এ কারণ তিনি স্বাভাবিক মানুষের মত হাঁটিতে পারিতেন না। চারি হাত-পায়ে ভর দিয়া উবু হইয়া চলিতেন। শৈশব হইতেই তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম বলিয়া এরূপ চলা আমাদের নিকট বিস্ময়কর ঠেকিত না। কিন্তু আগন্তুক বা অভ্যাগতরা ইহাতে বড়ই বিস্ময় বোধ করিতেন। উবু হইয়া চলিতেন বলিয়া উত্তমাঙ্গে বেশ জোর লাগিত। এই জন্যই বোধ হয়, বার্ধক্যে পা দিয়াই তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন, আর তাহাতেই তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

পল্লীর পাঠশালা। খড়ের চালা, হোগলার বেড়া; আমরা যে যার বসিবার আসন ও তালপাতা, দোয়াত, খাগের কলম লইয়া যাইতাম। গুরুমহাশয় ভয় এবং ভালবাসা দুই কারণেই শিশুমনে বেশ সমীহ ভাবের উদ্রেক করিয়াছিলেন। এতকাল পরে ভয় অপেক্ষা তাঁহার ভালবাসা বা

প্রীতির কথাই মনে পড়িতেছে। বহু ক্ষেত্রে তাঁহার প্রীতি ও স্নেহের পরিচয় পাইতাম। পাঠশালার তিনিই শিক্ষক, তিনিই পরিচালক। কি করিয়া ছেলেমেয়েদের ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখাইতে পারেন ইহাই ছিল তাঁর একান্ত ভাবনা। এখানে বলা আবশ্যক, পাঠশালায় ছেলে এবং মেয়ে দুই-ই পড়িত। আমার পূর্বে দিদি সেখানে পড়িয়াছেন। নিম্নতম শ্রেণীতে আমিও কোন কোন মেয়ের সঙ্গে পড়িতাম। পাশেই মুসলমান পাড়া। সেখান হইতে মুসলমান বালকেরা পাঠশালায় আসিত, তবে তাহাদের সংখ্যা ছিল কম। পাঠশালায় আমার দু'একজন মুসলমান সহপাঠী ছিল।

পাঠশালায় লেখা এবং পড়া দুই-ই চলিত। দু'বেলা পাঠশালা বসিত—সকাল বেলা ৬টা হইতে ১০টা এবং বৈকাল ২টা হইতে ৫টা পর্যন্ত। আমাদের কোন ঘড়ি ছিল না। সূর্য-ঘড়িতেই কাজ হইত। মোটামুটি সময় জানিবার ঐরূপ ব্যবস্থাই ছিল। সকাল বেলায় হস্তলিপি, শতকিয়া, কড়াকিয়া, বুড়িকিয়া লেখা হইত। আবার সকালের এই চারি ঘণ্টা সময়ের মধ্যে আধ ঘণ্টা, তিন কোয়ার্টার ছেলেমেয়েদের ছুটি দেওয়া হইত; যে যার বাড়ী আসিতাম পান্তাভাত খাইবার জন্য। প্রথম অংশেই সাধারণতঃ লেখার কাজ শেষ করিতে হইত। দ্বিতীয় অংশে যে না লিখিতাম এরূপ নহে; তবে এই সময়ের বেশীর ভাগই আমাদের কাটিত যাহা লিখিয়াছি তাহা উচ্চস্বরে পাঠ করিয়া। সর্দার পড়ুয়া দাঁড়াইয়া প্রথমে উচ্চস্বরে অ, আ, ক, খ, বানান, ফলা এক এক করিয়া পড়িত, আমরাও সকলে দাঁড়াইয়া তাহার পাঠের অনুসরণ করিতাম। এইরূপ উচ্চরবে পাঠ শুনিয়া পিতামাতা অভিভাবক বুঝিতেন, সকাল বেলার পাঠ প্রায় শেষ। ইহার পর আমরা সকলে বাড়ী ফিরিতাম।

বৈকালবেলা ছেলেমেয়েদের ছিল বই পড়া এবং গুরুমহাশয়ের পড়া লওয়া। পাঠশালায় পঁচিশ-ত্রিশটি, কখনও বা ত্রিশ-চল্লিশটি ছেলেমেয়ে পড়িত। শ্রেণী-বিভাগের তেমন কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না, কেননা বৎসরের যখন-তখন আসিয়া ছেলেরা ভর্তি হইত। তথাপি মোটামুটি—তালপাতার দুই শ্রেণী অ আ হইতে বানান ফলা পর্যন্ত; কলাপাতার এক শ্রেণী ও কাগজের উচ্চতর শ্রেণী। অথবা এখনকার ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ শ্রেণীও বলিতে পারেন। আমি ক খ পাতায় লিখিয়াছিলাম কিন্তু কিছু পরে ইহা উঠিয়া গিয়া শ্লেট ইহার স্থান দখল করে। চারিটি শ্রেণী, কিন্তু পাঠশালায় একজন মাত্র গুরু। গুরুমহাশয়

প্রতিটি ছাত্র বা ছাত্রীকে পড়া শিখাইয়া দিতেন, আবার তাহাদের নিকট হইতে পড়া আদায়ও করিতেন। ইহাতে তাঁহার কত অধিক পরিশ্রম হইত এখন খানিকটা বুঝিতে পারি। তবে উপরের শ্রেণীর ছেলেরা কখন কখন নীচের শ্রেণীর ছেলেদের পড়া বলিয়া দিত, ও পড়া লইত।

প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি গুরুমহাশয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। পাঠে অবহেলা করিলে তিনি আমাদের শাস্তি দিতেন, কিন্তু পাঠশালার শাস্তির ফিরিস্তি লঙ্ সাহেব যাহা দিয়াছেন আমরা তাহার শতাংশও এখানে দেখি নাই। পাঠ শিক্ষা ও পাঠ গ্রহণ শেষ হইলে শেষ বেলায় আবার উচ্চস্বরে পড়া। সোয়াইয়া, দেড়িয়া, নামতা আমাদের ছোট বড় সকলকে দাঁড়াইয়া উচ্চৈস্বরে পড়িতে হইত। সকালেরই অনুরূপ। সর্দার পড়ুয়া আগে পড়িত, আমরা তাহার অনুসরণ করিতাম। আমাদের সকলকেই সুর করিয়া পড়িতে হইত। ফলে কত শীঘ্রই না ঐ সকল আমাদের মুখস্থ হইয়া যাইত।

পাঠশালাটি সরকারী সাহায্য পাইত। আমাকে যখন বাবা পাঠশালায় ভর্তি করিয়া দেন—সে আজ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের কথা—তাহার পূর্ব হইতেই এই সাহায্য পাওয়া যাইতেছিল। প্রথমে মাসে পাঁচ সিকা করিয়া সাহায্য ছিল—ইহা বাড়িয়া ক্রমে আড়াই টাকা পর্যন্ত হয়। তখন আর আমি পাঠশালার ছাত্র নই। কিন্তু গুরুমহাশয় আমাকে এই সংবাদ দিয়া কত আনন্দই না প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিন মাস অন্তর এই সাহায্য আসিত। তিন মাস অন্তর পাঠশালার কার্যের একটি করিয়া বিবরণী পেশ করিতে হইত। পরে গুরুমহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, এই ধরনের লেখাপড়ার কাজ নাকি ঢের বাড়িয়া গিয়াছিল।

যাহা হউক, পাঠশালা যখন সরকারী সাহায্য পায় তখন পরিদর্শক তো থাকিবেনই। সাব্-ইন্স্পেক্টর (পরিদর্শক) আসিবেন শুনিলে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া যাইত। কত বার শুনিয়াছি, সাব্-ইন্সপেক্টর আসিবেন বা আসিতেছেন, কিন্তু তাঁহার দর্শন বড় একটা মিলিত না। যতদূর স্মরণ হয়, আমার অধ্যয়ন কালে পাঠশালায় ক্বচিৎ তাঁহার পদধূলি পড়িয়াছিল। তবে এক বারকার কথা সুস্পষ্ট মনে আছে। তাহাই এখানে বলি।

আমাদের ও অঞ্চল নদী নালার দেশ। পরিদর্শক খবর দিয়াছেন, তিনি নৌকা হইতে উপরে আর উঠিবেন না, গুরুমহাশয়কে ছাত্রছাত্রীসহ খাতাপত্র লইয়া তিনি যেখানে নৌকা নোঙ্গর করিয়াছেন সেখানে যাইতে হইবে। মনে

হয় তখন ছিল বর্ষাকাল ; তিনি হয়ত পদযুগল কর্দমাক্ত হইতে দিতে রাজি হন নাই। আমরা ছেলে-মেয়েরা পাঠশালা হইতে আধমাইল খানেক হাঁটিয়া উক্ত স্থানে হাজির হইলাম। গুরুমহাশয়ও আসিলেন, কিন্তু তাঁহার কি কষ্ট! খাতাপত্র হয়ত আর কেহ বহিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। প্রবলপ্রতাপ সাব্-ইন্সপেক্টর মহাশয়; তাঁহার চাহনি আমাদের প্রাণে যেন আতঙ্ক উপস্থিত করিল। গুরুমহাশয় পরিশ্রান্ত ; তাহার উপর পরিদর্শকের প্রশ্নবাণে জর্জরিত। তাঁহার হাত পা সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। এই দিনকার দৃশ্য কখনও ভুলিতে পারিব না। পরিদর্শক মহাশয় দয়া করিয়া দু'চার জনকে হাসিখুসি কি এই রকম ছবির বই দিয়া প্রস্থান করিলেন। আগেকার দিনে নিয়ম ছিল, গ্রামে আগন্তুক আসিলে সাধ্যমত ভোজ্য-দানে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। পরিদর্শককেও যথারীতি একটি পরিপাটিরকম 'ভোজ্য' দেওয়া হইয়াছিল।

বর্তমানে 'বুনিয়াদী শিক্ষা' কথাটি আকসার শুনি। কোন শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়াকে বলে বুনিয়াদি শিক্ষা। মহাত্মা গান্ধী এই পদ্ধতি প্রবর্তন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। স্বদেশী সরকার এজন্য অর্থও ব্যয় করিয়া থাকেন। ফলাফল কি হইতেছে বুঝি না। হয়ত কিছু শুভ হইতেছে, কিন্তু একদিকে ইহার বহুল প্রবর্তন যেমন ত্বরান্বিত করা দরকার, তেমনি ইহার উৎকর্ষ সাধনও প্রয়োজন। আমাদের গুরুমহাশয়ের মত লোকই হয়ত এযুগে ঠিকঠিক বুনিয়াদী শিক্ষাদানে উপযুক্ত। কেন, বলি। গুরুমহাশয় পাঠশালা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন কোন কুটীরশিল্পে তিনি বেশ দক্ষ ছিলেন। ঐ অঞ্চলে বাঁশ ও বেত প্রচুর পাওয়া যায়। গুরুমহাশয় বাঁশ ও বেতের রকমারি কাজ জানিতেন। আমাদের এবং অভিভাবকদের কত আব্দার তিনি পূরণ করিয়াছেন। বাঁশের খেচি, দোয়ার (মাছ ধরিবার যন্ত্র), খালুই চটা, চালুনি, বেতের মোড়া, প্রভৃতি কত জিনিস তিনি তৈরী করিতে পারিতেন। পরিবারের চাহিদা তাঁহার কম ছিল, এসব তৈরী করিয়া কত লোককে তিনি অমনি দিয়াছেন। সেলাইয়ের কাজ, রকমারি ডিজাইন, রঙের কাজ, আল্পনা—এসবেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এখন 'হাতের কাজ' কথাটি যেন উঠিয়া গিয়াছে। গুরুমহাশয় এদিকেও আদর্শ শিক্ষক হইতে পারিতেন সন্দেহ নাই।

এক টাকা পাঁচ সিকা তো সরকারী সাহায্য! ছাত্রদের নিকট হইতে

এক আনা, দুই আনা, চারি আনা যাহার যেমন সাধ্য বেতন লইতেন। চারি আনার খুব কমই ছিল। এই যৎসামান্য দক্ষিণা, তাহাও অনেক সময় বাকি পড়িত। তিনি মাঝে মাঝে বিরক্ত হইতেন, কিন্তু ইহাতে কাজে ত্রুটি কখনও লক্ষ্য করি নাই। পূজা পার্বণ বা বিবাহকালে তিনি কিছু কিছু প্রণামী পাইতেন। তিনি পালাক্রমে কাহারও কাহারও বাড়ী আহারাদি করিতেন। কাজেই যাহা পাইতেন, সস্তা-গণ্ডার দিনে কোনরকমে চলিয়া যাইত। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে যখন জিনিসপত্রের দাম চলিয়া গেল তখন সংসার পরিচালনায় তাঁহার বড়ই বেগ পাইতে হইত।

গুরুমহাশয় ছাত্রদের কাহারও কাহারও উন্নতি দেখিয়া বিশেষ-উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। ছাত্রীদের সুপাত্রে বিবাহ হইলে তাঁহার কত আনন্দ। গুরুমহাশয়ের নাম কিন্তু এতক্ষণ বলি নাই। রামচরণ দে তাঁর পোষাকী নাম। 'রামু গুরু-মহাশয়' নামেই তিনি ওখানে বালক-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন। পাঠশালা ছাড়িয়া জীবনের অলিগলিতে ঘুরিয়া মরিতেছি আজ কতকাল। কিন্তু নিষ্ঠাবান আদর্শ শিক্ষাব্রতী রামচরণ দে গুরুমহাশয়ের কথা ভুলিতে পারিব না। ছন্নছাড়া পল্লীর কাহারও মুখে আবার তাঁহার নামটি সম্প্রতি উচ্চারিত হইতে শুনিয়া সেই সব পুরানো কথা মনে পড়িয়া গেল। গুরুমহাশয় পরপারে চলিয়া গিয়াছেন অনেক দিন পূর্বে। এখনও তাঁহার কথা স্মৃতিপটে উদিত হইলে মন শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠে।

———

তিন জন শিক্ষাব্রতী

১

শিক্ষাব্রতী নিবারণচন্দ্র বৈদ্য আর ইহজগতে নাই। তিনি ছিলেন জাতিতে নমঃশূদ্র। ব্রজমোহন স্কুল হইতে এণ্ট্রাস ও ব্রজমোহন কলেজ হইতে আই-এ পাস করেন। পরে বন্ধুদের সঙ্গে কলিকাতায় সিটি কলেজে আসিয়া বি-এ ক্লাসে ভর্তি হন। বি-এ পরীক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। ইহার পরেই তিনি শিক্ষাব্রত অবলম্বন করেন।

বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পিরোজপুর মহকুমার কিঞ্চিদধিক তিন মাইল উত্তরে কদমতলা নামে বৈশ্য-বারুজীবিপ্রধান একটি গ্রাম আছে। উক্ত সমাজের নেতা যশোহর-নিবাসী বিখ্যাত রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার এই গ্রামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই অঞ্চলটি তখন আধুনিক শিক্ষায় অনগ্রসর ছিল। কদমতলার আশেপাশের বিভিন্ন পল্লীর ছেলেরা আসিয়া এই স্থানে ভিড় জমাইত। এই গ্রামের প্রায় আড়াই মাইল পূর্বে চলিশা গ্রামের ছেলে আমরা; আমরাও গিয়া সেখানে ভর্তি হইলাম। ১৯১৪ সনের ১৬ই জানুয়ারি শুক্রবার আমি তৃতীয় শ্রেণীতে (Class III) ভর্তি হই। এই সময়েই স্কুলের ছাত্রসংখ্যা প্রায় তিন শতে দাঁড়াইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে দুই বৎসরের মধ্যে নূতন বাড়ী তৈয়ারী হইল, স্থান সঙ্কুলানের আর কোন অসুবিধা রহিল না।

পল্লী-গ্রামের স্কুল, কিন্তু শিক্ষকের দিক দিয়া উহা কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না। এখানে সবুজপত্র, প্রবাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্র লওয়া হইত। এ ছাড়া দৈনিক সংবাদপত্র তো ছিলই। আমি যখন পঞ্চম শ্রেণীতে উঠিলাম তখন, যতদূর মনে হয়, নিবারণচন্দ্র শিক্ষক হইয়া আসিলেন। এই সময়কার প্রথন তিন চারি জন শিক্ষকই ছিলেন ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। সকল দিকেই কেমন একটা যেন নূতনত্ব লক্ষিত হইতে লাগিল। বিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাহিরে আমরা ছাত্রদল শিক্ষকগণের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিতে লাগিলাম। এক দিকে বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী,

আর অন্য দিকে খেলা-ধূলা, আলাপ-আলোচনা, সভা-সমিতি প্রত্যেকটি বিষয়েই শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে হৃদ্যতা ও সজীবতা অনুভব হইত। আর ইহার কেন্দ্রস্থলে ছিলেন বিদ্যালয়ের তৃতীয় শিক্ষক নিবারণচন্দ্র বৈদ্য।

এখানে নিবারণবাবু সম্বন্ধেই বিশেষ করিয়া বলিব। ব্যক্তিগত ভাবে আমি নিবারণবাবুর নিকট বড়ই ঋণী। তিনি যে প্রতিনিয়ত নিজ জীবনের প্রত্যেকটি কর্মে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সত্য-প্রেম-পবিত্রতার আদর্শ-মহিমা ঘোষণা করিতেছিলেন, তাহা আমার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এই সময় বিদ্যালয়ের নৈতিক পরিবেশও যেন নিয়মিত হইয়া গেল। একটি মাত্র উদাহরণ দিই। আমাদের পরীক্ষাকালে নকল করা বা কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করা খুবই গর্হিত ও ঘৃণিত কাজ বলিয়া মনে করিতাম। পরে কলেজে পড়িতে যখন অন্যত্র গিয়াছি, তখন সেখানকার স্কুল ও কলেজের আবহাওয়া দেখিয়া প্রথম প্রথম কিরকম আশ্চর্য বোধ হইত।

নিবারণচন্দ্রের শিক্ষা-প্রণালীর বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু ইহা বলিবার পূর্বে আমাদের জীবন-গঠনের কি কি আয়োজন হয় তাহা বলিতেছি। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে গেলে প্রত্যেক ছাত্রের হাতে যে একখানি মুদ্রিত লিপি দেওয়া হইত তাহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে এই মর্মেও লেখা থাকিত, স্কুলের পাঠ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক শেষ হইবে না; স্কুলের বাহিরেও তাঁহারা সব সময়ে পরস্পরের মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে অবহিত থাকিবেন। এইরূপে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে একটা *espirit de corps* বা সৌহার্দ্য ও প্রীতির ভাব পরিস্ফুট হইত। আমাদের বিদ্যালয়েও এইরূপ একটি পরিবেশের সৃষ্টি হইতে লাগিল। শিক্ষক ও ছাত্রগণ একসঙ্গে খেলা করিতেন, একসঙ্গে বেড়াইতেন, একত্র বসিয়া কথাবার্তা বলিতেন, আবার বিদ্যালয়ের সভা-সমিতিতেও মিলিত হইতেন। পল্লীর ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টি এইরূপে একটি আদর্শ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল।

নিবারণচন্দ্র খেলাধূলায় বড় একটা যোগ দিতেন না, কিন্তু যোগ না দিলেও এবিষয়ে তাঁহার উৎসাহ এতটুকুও কম দেখি নাই। অন্যান্য সকল দিকেই তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কত কথা হইত তাঁহার সঙ্গে, বড় ভাল লাগিত। কি কি কথা হইত মনে নাই, মনে থাকা সম্ভবও নয়। কিন্তু কিছুক্ষণ তাঁহার সহিত কাটাইলে মনে হইত, কোন এক নূতন জগতে চলিয়া আসিয়াছি। সে সময়ে প্রত্যেক স্কুলে সপ্তাহে এক ঘণ্টা করিয়া নীতি-শিক্ষা দানের বোধ হয়

ব্যবস্থা করিতে হইত। উপরি-ওয়ালার নির্দেশে আর যাহাই হউক, নীতি শিক্ষা কতটা হইতে পারে, সন্দেহস্থল। আমাদের বিদ্যালয়েও এইরূপ নীতি-শিক্ষা ক্লাস ('moral class') প্রবর্তিত হইয়াছিল। কিন্তু এই পর্যন্ত। ইহার দ্বারা যে আমরা কিছু নীতি-জ্ঞান লাভ করিয়াছি, এমন তো মনে হয় না।

আমাদের বিদ্যালয়ে আর একটি বিষয়ের আয়োজন হইল, আর তাহার দ্বারা আমরা ছেলের দল বড়ই উপকৃত হইতে লাগিলাম। তখন বুঝি নাই আমরা কতখানি উপকার লাভ করিতেছি। প্রতি রবিবার প্রাতে স্কুলের ছাত্রদের লইয়া একটি বৈঠক বসিত। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরেও এই বৈঠকটির কথা আমার স্পষ্টই মনে আছে। নিবারণচন্দ্র ছিলেন এই বৈঠকের মূলাধার। সদ্গ্রন্থ পাঠ ও আলোচনা হইত। আবার বক্তৃতাও হইত। কোন কোন রবিবার শহর হইতে স্কুলের সেক্রেটারী দুই-তিন জন বন্ধুসহ আসিয়া আমাদের এই বৈঠকে যোগ দিতেন। কেহ কেহ বক্তৃতাও করিতেন মনে আছে। এই বৈঠক কতদিন চলিয়াছিল, মনে নাই; কিন্তু ইহার স্মৃতি আজও জীবনের পাথেয় হইয়া আছে।

পল্লীগ্রামের স্কুল: দুই মাইল, তিন মাইল, কোন কোন ক্ষেত্রে এমন কি চারি মাইল দূর হইতে আমরা কিশোর ছেলেরা আসিয়া মিলিত হইতাম। রাস্তাঘাটও এমন ছিল না যে, আমরা যখন-তখন আসিয়া কোন কাজে যোগ দিতে পারি। একারণ শহরের মত দরিদ্রজনের সেবা-শুশ্রূষার জন্য কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। পল্লীতে কলেরা রোগেরই প্রাদুর্ভাব হইত বেশী। ছেলেদের ও শিক্ষকবর্গকে ব্যক্তিগতভাবে সেবা-শুশ্রূষা করিতে দেখিয়াছি। আমাদের মধ্যে যাহারা তখন এ সুযোগ লইতে পারি নাই তাহারা পরবর্তীকালে কঠিন কঠিন রোগ-আক্রান্ত রোগীর সেবাতে পশ্চাৎপদ হই নাই। ব্যক্তিগত ভাবে অনেকে ইহার সাক্ষ্য দিতে পারেন। মানুষের প্রতি দরদ বা মমতাবোধের বীজ কৈশোরেই আমাদের মনে উপ্ত হয়। আর ইহার মূলে ছিলেন শিক্ষাব্রতী নিবারণচন্দ্র। অদ্য একথা স্মরণ করিয়া গৌরব বোধ করিতেছি।

বিদ্যালয়ে একটি ছাত্র-সভা ছিল। এখানে কোন কোন শিক্ষক মহাশয়ের পৌরোহিত্যে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা হইত। বক্তৃতা-শক্তির অনুশীলনের পক্ষে এই ছাত্র-সভা একটি প্রধান উপায়। কোন কোন প্রসিদ্ধ নেতার

মৃত্যুতে আজকালকার মত আমাদের পল্লীর বিদ্যালয়টি ছুটি দিয়াই ক্ষান্ত হইত না; স্মৃতিসভা হইত, শিক্ষকগণের বক্তৃতায় তাঁহাদের জীবনকথা শুনিতাম। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যুতে এইরকম স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কোন কোন অখ্যাত অথচ উচ্চমনা লোকেরও স্মৃতিসভা হইত। এইরকম একটি সভার কথা এখনও আমার মনে আছে। পার্বতীচরণ পাল নামে একজন নিরক্ষর বারুজীবী বিদ্যালয়টির জন্য ছয় বিঘা ভূমি বিনা সর্তে দান করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে যথারীতি স্মৃতিসভা হইল। এই সভায় নিবারণচন্দ্র বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহার একটি কথা এখনও মনে আছে। তিনি বলিয়াছিলেন, রাসবিহারী ঘোষ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এগার লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন, বিদ্যালয়ের জন্য নিরক্ষর পল্লীগত-প্রাণ পার্বতীচরণের এই ছয় বিঘা ভূমিদান গুরুত্ব হিসাবে উহার তুলনায় কোন অংশে কম নহে। রাসবিহারীর মত পার্বতীচরণও দেশের গৌরব।

নিবারণচন্দ্র ঈশ্বরভক্ত, বৈষ্ণব; কিন্তু ধর্ম বা শ্রেণীগত সাম্প্রদায়িক মনোভাব তাঁহাতে তিল মাত্র স্থান পাইত না—তিনি ছিলেন ইহার উপরে। তখনই হিন্দু সমাজের জাতি-ভেদকে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য শ্রেণী-বিদ্বেষে পরিণত করিবার চেষ্টা তলে তলে চলিতেছিল। আমাদের কিশোর-মনেও তখনই ইহা খানিকটা অনুভূত হইতে থাকে। নিবারণচন্দ্রকে দেখিয়াছি, তিনি ছিলেন এসবেরই ঊর্ধ্বে। জাত্যংশ তথাকথিত 'নিম্ন' স্তরের হইলেও তিনি শ্রেণী-বিদ্বেষের কখনও প্রশ্রয় দেন নাই। হিন্দু সমাজের তথাকথিত উচ্চ নীচ সকলের প্রতিই তিনি বিশেষ প্রীতি-সম্পন্ন ছিলেন; এ-কারণ শ্রেণী-নির্বিশেষে তিনি সকলের শ্রদ্ধাপ্রীতিও লাভ করিতে সক্ষম হন। তাঁহার স্বজাতীয়েরা তাঁহাকে অনুযোগ দিত, তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিত, কিন্তু সকলকে মৈত্রীর কথা এমনভাবে বুঝাইয়া দিতেন যে, আমরা কিশোর ছেলেরা তাহা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতাম। ধর্মের দিক দিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও তাঁহার গোঁড়ামি কখনও দেখি নাই। তাঁহার উদার ঈশ্বর-প্রীতি আমাদিগকে নিজ নিজ ভাবে ঈশ্বর আরাধনায় উদ্বুদ্ধ করিত। মনে আছে, কৈশোরে দুর্গাপূজার সময় অঞ্জলি দিবার জন্য বৈকালে ৩টা ৪টা পর্যন্ত উপবাসী থাকিতাম। ইহার জন্য যেমন বাড়ীর পরিবেশ, তেমনি নিবারণচন্দ্রের শিক্ষা অনেকটা দায়ী। ঈশ্বর-প্রীতি তাঁহার আচার-আচরণ দেখিয়াই আমাদের মনে দৃঢ় হয়।

একদিনের কথা মনে আছে। 'মর‍্যাল ক্লাসে' নিবারণচন্দ্র আমাদিগকে 'জড়-ভরত' পড়িয়া শুনাইতেছেন। এখন শিশু-সাহিত্যে বাজার ছাইয়া গিয়াছে। ভাল, মন্দ, মাঝারি কত রকমেরই না বই এখন দেখি। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে কিন্তু শিশু-সাহিত্য বলিতে সামান্য বই-ই পাওয়া যাইত। দীনেশচন্দ্র সেনের বেহুলা, ভীষ্ম, জড়-ভরত, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ছেলেদের রামায়ণ, মহাভারত, এই রকম কয়েকখানি মাত্র ছিল পুঁজি। আমরা দীনেশবাবুর বইগুলি খুব পড়িতাম। নিবারণচন্দ্র 'জড়-ভরত' পড়িয়া শুনাইবার আগে এখানি পড়ি নাই। তাঁহার পাঠ শুনিয়া বড়ই মুগ্ধ হইলাম। খানিকটা পড়িতে পড়িতে তাঁহার চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতেছিল। ভরতের অবস্থা পরিবর্তন, আবার ভগবৎ কৃপায় পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া সকলই শুনিতে লাগিলাম। নিবারণচন্দ্রের পাঠগুণে—তখন দীনেশচন্দ্রের লিপি-কৌশল বুঝিবার সামর্থ্য হয় নাই—আমরা জড়-ভরতের সঙ্গে যেন একাত্ম হইয়া গেলাম। এই যে শ্রদ্ধার সঙ্গে পুস্তক পাঠ, এবং তাহার ভাবে নিজে অনুপ্রাণিত হওয়া—ইহার প্রত্যক্ষ শিক্ষা পাইলাম নিবারণচন্দ্রের নিকট। তাঁহার বিদেহী আত্মাকে আজ বার বার নমস্কার করি।

ক্লাসে তাঁহার পাঠ্যপুস্তক পড়াইবার রীতিও ছিল চিত্তাকর্ষক। পাঠ্য-পুস্তকের উপর ছাত্র মাত্রেরই স্বভাবত একটা বীতরাগ থাকে। আমরা সৌভাগ্যক্রমে প্রায় একই সময়ে এমন কয়েকজন শিক্ষক পাইয়াছিলাম যাঁহাদের পাঠনা-রীতিতে এই প্রবচনপ্রায় উক্তি যেন হার মানিয়া গিয়াছিল। এখানে নিবারণচন্দ্রের কথাই বলি। তিনি আমাদের পঞ্চম শ্রেণীতে ইংরেজী পড়াইতেন। তখন পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে টিপিং-এর *Fifth Reader* ও *Sixth Reader* পাঠ্য ছিল। প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু প্রশ্নোত্তর ক্রমে বর্ণিত: ইহাকে শিক্ষণ-রীতির পরিভাষায় 'Direct Method' বলে। নিবারণচন্দ্রের পাঠ দেওয়া ও নেওয়া এই রীতিতেই হইত। যেমন, একটি অধ্যায়ে রাম ও রহিমের কথাবার্তার মধ্য দিয়া বিষয়টি বুঝানো হইয়াছে। আমরা এক জনে রাম ও একজনে রহিম হইলাম। প্রত্যেকের মুখে যথাযথ প্রশ্ন ও উত্তর দেওয়া হইল। অবশ্য বিষয়টির মর্ম আগে আমরা বুঝিয়া লইতাম। এইরূপে অল্প সময়ের মধ্যে বিষয়টি যেন মনে গাঁথিয়া যাইত।

এক দিনের কথা। 'Alexander and the Robber' পড়ানো হইতেছে। আমরা পূর্বেই শব্দার্থ লিখিয়া লইয়াছিলাম। আমি এবং আর একটি ছেলে —কে ঠিক স্মরণ হইতেছে না—'আলেকজাণ্ডার' ও 'রবার' হইলাম। আমি, যতদূর মনে পড়ে, আলেকজাণ্ডার হইয়াছিলাম। দুই জনে প্রশ্নোত্তর করিতে করিতে ঘরের মধ্য হইতে বাহিরে বারান্দায় খানিকটা গিয়াছিলাম। আবার দুইজনে ফিরিয়া ঘরের মধ্যে আসিলাম। যথাযথ আবৃত্তি এবং পাঠ শিখিলে পঠিত বিষয়ের মর্মার্থ সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ক্যাপ্‌টেন রিচার্ডসন হিন্দু কলেজের ছেলেদের সেক্সপীয়র পড়াইতেন। তাঁহার আবৃত্তি এবং পাঠ শুনিয়াই তাঁহারা বিষয়টির মর্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন—রিচার্ডসনের অন্যতম ছাত্র ভোলানাথচন্দ্র ইহা বলিয়া গিয়াছেন। নিবারণচন্দ্রের অধ্যাপনারও একটি অংগ ছিল আবৃত্তি ও পাঠ! প্রশ্নোত্তরকালে আমাদের উচ্চারণের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হইত।

ইংরেজী পুস্তকের একটি অধ্যায়ের নাম ছিল, মনে হয়, Line of Honour। লক্ষ্মণ-চিহ্নিত গণ্ডির বাহিরে যাওয়াতেই সীতা রাবণ কর্তৃক অপহৃত হইয়াছিলেন। এই গণ্ডীর ভিতরে থাকিলে রাবণের সাধ্য ছিল না যে, সীতার দেহ স্পর্শ করে। এই গণ্ডীকেই 'Line of Honour' নাম দেওয়া হইয়াছিল। নিবারণচন্দ্র খড়িমাটি দিয়া ঘরের মধ্যে একটি লাইন টানিয়া দিলেন। ইহাই হইল লক্ষ্মণ-চিহ্নিত গণ্ডী। আমাদের দু'জনে প্রশ্নোত্তরে বিষয়বস্তু বলিতে লাগিলাম। নিবারণচন্দ্রের এতাদৃশ শিক্ষাগুণে আমরা শুধু পাঠের অর্থই বুঝিয়া লই নাই, আত্মসম্মান বা আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য যে আমাদের মধ্যে সকলের অলক্ষিতে এইরূপ গণ্ডী রহিয়াছে, আর এই গণ্ডী অতিক্রম করিলেই যে সকলরকম বিপদ, তাহাও আমরা সেই দিন হইতে হৃদয়ঙ্গম করিলাম। আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা হইলে নিবারণচন্দ্রের খড়িমাটি দিয়া আঁকা সেই লাইনটির কথা অদ্যাবধি মনে হয়।

মধ্যে এক বৎসর নিবারণচন্দ্র এই বিদ্যালয়ে ছিলেন না। আমরা সপ্তম শ্রেণীতে (Class VII) উঠিতেই দেখি, নিবারণবাবু ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইহার পরও বোধ হয় তিন-চার বৎসর এখানে ছিলেন। এবারেও আমরা তাঁহার নিকট ইংরেজী পড়িয়াছিলাম। আমরা সপ্তম শ্রেণীতে উঠিয়াছি, অথচ অনেকেই তখন বাক্যরচনার মূলধারাগুলি আয়ত্ত করিতে পারি নাই। নিবারণচন্দ্র ইংরেজী ক্রিয়াপদগুলি Conjugate করাইতে লাগিলেন।

সংস্কতের যেমন ধাতুরূপ শিখিতে হয়, ইংরেজীরও সেইরূপ শেখা প্রয়োজন। বোর্ডে লিখিয়া তিনি হয়তো একবার দেখাইয়া দিতেন, আমাদের দিয়া তিনি দশবার লিখাইতেন। তাঁহার বুঝাইবার ধরন এমনই সুন্দর ছিল যে, এই ধাতুরূপের মধ্যেও আমরা যেন রস পাইতে লাগিলাম। শিক্ষকের শিক্ষাদানের এইখানেই তো সার্থকতা। সেই যে আমাদের মনে কর্তা ও ক্রিয়াপদের যোগ সাধন হইল, তাহা আর কখনও ভুলিতে পারি নাই। আর ইহাই পরীক্ষা-বৈতরণী পার হইবার উপায় স্বরূপ হইয়াছিল। এখনও যদি এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে অল্প সময়ে হয়তো অধিকতর সুফল পাওয়া যাইতে পারে। স্কুলের ভিতরে ও বাহিরে নিবারণচন্দ্রের শিক্ষা আমাদের সজীব করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার নিকটে অধীত ও শ্রুত বিষয়াদি স্মরণ করিয়া আজ নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

২

আমাদের বিদ্যালয়ের আর দুই জন শিক্ষাব্রতীর কথা পর পর বলিতেছি। যতীন্দ্রনাথ দত্ত এখন কোথায় কি অবস্থায় আছেন জানি না; শুনিয়াছি, তিনি আর ইহজগতে নাই। কিন্তু সেই যে এক বৎসর অঙ্ক ও বাংলা তাঁহার নিকট পড়িয়াছিলাম তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। অঙ্ক তিনি জলের মত আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন। গণিতের অপেক্ষা ইতিহাসের প্রতি আমার স্বাভাবিক ঝোঁক, পরবর্তীকালে ইতিহাসের সেবাকে জীবন ও জীবিকার অঙ্গ করিয়া লইয়াছি। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের শিক্ষাগুণে আমার গণিতকেই বিশেষ বিষয় বলিয়া গ্রহণ করি। তবে তাঁহার বাংলা পড়ানো আমাদিগকে এতই মুগ্ধ করিয়াছিল যে বলিয়া বুঝাইতে পারিব না।

সপ্তম শ্রেণীতে (Class VII) উঠিয়া আমরা যতীন্দ্রনাথের নিকট বাংলা পড়ি। এবারকার পাঠ্য পুস্তকখানির নাম ছিল 'সাহিত্য রত্ন'। ইহার নাম সার্থক হইয়াছিল, বাস্তবিক এখানি বাংলা-সাহিত্যের রত্ন। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, নিখিলনাথ, শিবনাথ, হরপ্রসাদের রচনায় পুস্তকখানি রত্নই হইয়াছে। পূর্ব বৎসর 'বঙ্গের রত্নমালা' পাঠ করিয়াছিলাম। তাহাতে বিভিন্ন বঙ্গ-মনীষীর চিত্র এবং তাঁহাদের জীবনের ছোট ছোট ঘটনা ছিল। এবারকার পুস্তকখানিতে তাঁহারা যেন নিজ নিজ রচনার মধ্যে রক্ত-মাংসের শরীর ধারণ করিয়া আমাদের নিকটধরা দিয়াছেন। যেমন পুস্তকখানি,

তেমনই তাঁহার পড়ানো। যতীন্দ্রনাথ এক-একটি নিবন্ধ পড়াইবার সময় যেন তাহাতে একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতেন, আমরাও মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতাম তাঁহার সেই সুমিষ্ট স্বর, সুমধুর উচ্চারণ, ততোধিক সুন্দর ব্যাখ্যা—সব মিলিয়া প্রকোষ্ঠখানি যেন একটি স্বর্গপুরীতে পরিণত হইত। প্রায় প্রতিদিন এক ঘণ্টা তাঁহার নিকট আমরা পাঠ লইতাম। কখন ঘণ্টা শেষ হইয়া যাইত, খেয়ালই থাকিত না। কোন এক অতীন্দ্রিয় জগতে চলিয়া যাইতাম।

জীবনে বহু শিক্ষক ও অধ্যাপকের নিকট পড়িয়াছি। এমন মনোযোগ সহকারে কাহারও অধ্যাপনা শুনিয়াছি বলিয়া তো মনে হয় না। যতীন্দ্রনাথ বাংলা পড়ানোর মধ্যে যে দরদ ঢালিয়া দিতেন তাহাতে আমরাও অভিষিক্ত হইতাম। মাতৃভাষা বাংলা তখনও বঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে উপেক্ষিতা। আমরা কিন্তু যতীন্দ্রনাথের পড়ানোর মধ্য দিয়া ইহার মহিমাসৌষ্ঠব সেই কিশোর বয়সেই ধরিয়া ফেলিয়াছিলাম। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বাঙালীর প্রীতি থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু এই স্বাভাবিক বস্তুটি বিদেশীর মোহিনী শক্তিতে অস্বাভাবিক হইয়া উঠিতেছিল! ধন্য আশুতোষ, তিনি এই মোহিনী শক্তির মূলোচ্ছেদের আয়োজন করিয়াছিলেন, আর ধন্য যতীন্দ্রনাথ, তিনি কিশোর-মনকে ইহার জন্য প্রস্তুত করিতে লাগিয়া গিয়াছিলেন।

যতীন্দ্রনাথের নিকট বাংলা অধ্যয়নের ফলে আমরা বাংলার প্রকৃতিকে নূতন রূপে দেখিতে শিখিলাম। বিভূতিভূষণের কলম ধরিবার বহু পূর্বে বাংলার তরু-লতা, ফল-ফুল, নদ-নদী, বন-জঙ্গল, পশু-পক্ষী, নর-নারী এক নূতন রূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল। দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্র-সৈকতের অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া 'দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালী বনরাজিনীলা আভাতি বেলা' ইত্যাদি কবির কথাগুলি নবকুমারের মনে উদয় হইয়াছিল। একদিন পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে নিজ পল্লীতে ফিরিতেছি। শীতের অপরাহ্ন, বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত, ধান উঠিয়া গিয়াছে। খোলা মাঠের মধ্যে দিয়া নিজ গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতেছি। দূর হইতে পল্লীর অর্ধচক্রাকৃতি তরুরাজি যেন নবকুমারের অয়শ্চক্র হইয়া আমার চোখে ধরা দিল। আরও অগ্রসর হইলাম। যখন ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনীর নিকটবর্তী হইলাম তখন 'এক পারে উদয়গিরি, অন্য পারে ললিতগিরি, মধ্যে পুণ্যতোয়া প্রবাহিণী'র কথা মনে পড়িয়া গেল। সেই যে আমার পল্লীজননীকে নূতন রূপে দেখিলাম, সে দৃশ্য এখন চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে। কালবৈশাখীর ঘন কৃষ্ণ মেঘ, উদ্দাম হাওয়া,

অশনি গর্জন, বিদ্যুৎ ঝলক, নিদাঘের রুদ্র তাপ, বর্ষার অবিরাম বারিপাত, শরতের শুভ্র নীলাকাশ, হরিদ্ বর্ণ ধানের ক্ষেত, শীতের শিশির বিন্দু, নিত্য নূতন চোখে নব নব রূপে দেখিতে লাগিলাম। দেখিয়া কখনও কখনও আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাইতাম। কোন্ এক নূতন জগতে যেন চলিয়া আসিয়াছি!

একটি দিনের কথা। টিফিনের সময় স্কুল-বাড়ী হইতে দক্ষিণ দিকে এক বন্ধুর সঙ্গে গিয়াছি। টিফিন শেষ হয় হয়, এমন সময় তাহারই সঙ্গে বিদ্যালয়ের দিকে আসিতেছি। হেমন্ত কি শীত ঠিক মনে নাই, বোধ হয় শীতকাল। স্কুল বাড়ীর ছাদ পাকা নয়, টিনের ছাউনি। দেখিলাম ঢেউ খেলানো টিনের উপর শিশির বিন্দুর মত টল্ টল্ করিতেছে। মনে হইল আমাদের অলক্ষিতে কোন্ এক অদৃশ্য হস্ত এই ক্ষুদ্র পল্লীর স্কুল গৃহের ছাউনির উপর অজস্র মুক্তা বিছাইয়া গিয়াছে। সেদিনকার সেই অপরূপ রূপ দর্শনে আমি বিমোহিত হইলাম। প্রাণে নূতন স্পন্দন অনুভব করিলাম। গত চল্লিশ বৎসরে দেশের উপর দিয়া কত ঝড়ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে, বাংলার দূরতম পল্লীও তাহার হাত এড়াইতে পারে নাই। ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের জীবনের উপর দিয়া কত কি পরিবর্তনই না ঘটিয়া গেল। কিন্তু সেই অপূর্ব দৃশ্যটি এখনও অপরূপ রূপে আমার নয়নের সম্মুখেই যেন রহিয়াছে। বাংলার জল মাটিকে আমরা এইরূপেই ভালবাসিতে শিখিয়াছিলাম। আর ইহার মূলে রহিয়াছে যতীন্দ্রনাথের বাংলা পড়ানো।

ইতিপূর্বে রামায়ণ, মহাভারত পয়ারে পাঠ করিয়াছিলাম। রামায়ণ গান, মনসার ভাসান, রয়াণী, (আমাদের ও অঞ্চলে 'রয়াণী' নামে আখ্যাত), ঢপ্ ও পদাবলী গান, যাত্রা ও কবি গানও অনেক শুনিয়াছি। ইহার ফলে বাংলার সংস্কৃতির প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রীতি জন্মিয়া গিয়াছিল। পিতৃদেবের আদেশে চিঠিপত্রাদি ও দিনলিপি লিখিয়া স্কুলের 'টাস্ক' ছাড়া আপন মনে লিখিবার অভ্যাসও হইতেছিল। কিন্তু প্রকৃতি দেবীকে এমন করিয়া তো কখনও দেখি নাই। এই দৃষ্টি পাইলাম যতীন্দ্রনাথের পড়ানোর মধ্য দিয়া। বড় নদীর পারে মাতুলালয়ে গিয়াছি। একদিন নদীর পারে বসিয়া সেখান হইতে নবরূপে সূর্যাস্ত দেখিলাম, তাহা কি জীবনে ভুলিতে পারিব? 'জবা-কুসুমসঙ্কাশং' বলিতে বলিতে গৃহের বারান্দায় দাঁড়াইয়া 'মহাদ্যুতি কাশ্যপেয়কে' রক্তিমাভ নবারুণ রূপে দেখিয়াছি, সে রকম আর কোথায় দেখিতে পাইব?

যতীন্দ্রনাথ বাংলা পড়াইতে পড়াইতে আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় মানস-চক্ষু খুলিয়া দিয়াছিলেন।

৩

যতীন্দ্রনাথ স্কুল হইতে চলিয়া গেলেন। তখন আমরা বোধ হয় অষ্টম শ্রেণীতে উঠিয়াছি। যতদূর মনে পড়ে, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার স্থানাভিষিক্ত হইয়া আসিলেন। যতীন্দ্রনাথের শান্ত দৃষ্টি, প্রফুল্লচন্দ্র হইলেন তাঁহার বিপরীত। দীর্ঘকায়, বেশ শক্তিমান পুরুষ এই প্রফুল্লচন্দ্র। উষ্ণীষপরা স্বামী বিবেকানন্দের ছবি দেখিয়াছি; প্রফুল্লচন্দ্র ঠিক সেইরূপ উষ্ণীষ পরিয়া স্কুলে আসিতেন। বস্তুত তিনি স্বামীজীর মত শুধু পাগ্‌ড়িই পরিতেন না, তিনি তাঁহার পুস্তকাদি পড়িয়া যৌবনারম্ভেই খানিকটা উজ্জীবিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কথাবার্তায় ইহা প্রায়ই প্রকাশ পাইত।

প্রফুল্লচন্দ্র আমাদের স্কুলে বেশী দিন ছিলেন না। হয়ত এক বৎসর কি তাহার কিছু বেশী কাল ছিলেন। এই সময়ের মধ্যেই তাঁহার তেজস্বিতার বেশ পরিচয় পাইয়াছিলাম। বিদ্যালয় ত্যাগের কারণও ছিল, যতদূর স্মরণ হয়, তাঁহার এই তেজস্বিতা। বিদ্যালয়ে ক্লাসের ভিতরে তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষার মধ্যেও বিশেষত্ব ছিল। তবে আমাদের নিকট আকর্ষণীয় ছিল অন্য কিছু। ছেলেদের সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের মিলিয়া মিশিয়া চলা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে নাই। স্কুল ছুটির পর তিনি প্রায় প্রত্যহই ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলিতেন। অন্যান্য খেলা-ধূলায়ও তাঁহার বেশ উৎসাহ ছিল। ছেলের দল অল্প কালের মধ্যেই তাঁহাকে আপন করিয়া লইল। তিনিও তাঁহাদের হৃদয়ে একটি প্রীতির আসন লাভ করিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। আমাদের ও অঞ্চলে ভাল রাস্তাঘাট ছিল না। বোধ করি এখনও নাই। বর্ষাকালে ও অঞ্চল জলে প্রায় ডুবিয়া যাইত। জল-কাদা ভাঙ্গিয়া আঁকা-বাঁকা সরুপথে দূরের বিদ্যালয়ে যাতায়াত বড়ই কষ্টকর ছিল। ঐ স্কুলে একক্রমে আট বৎসর পড়ি। প্রথম দুই বৎসর ও শেষ দুই বৎসর এই দুর্গম পথে স্কুলে যাতায়াত করিতাম। মাঝের চারি বৎসর পিতৃদেব সমস্ত বর্ষাকালটি স্কুলের সন্নিকটে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। একবার প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে ছিলাম। তিন মাস তাঁহার সহিত বসবাস করিয়া তাঁহার নিকট হইতে

অনেক কিছু শিখিয়া লই। বিদ্যালয়ের ছুটির পর এবং বন্ধের দিন তাঁহার বাসস্থান ছেলেদের সমাগমে মুখরিত হইয়া উঠিত। প্রফুল্লচন্দ্র বিবেকানন্দ-সাহিত্যের বড়ই ভক্ত ছিলেন। তিনি আমাদিগকে স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য', 'বীরবাণী', 'ভারতে বিবেকানন্দ' প্রভৃতি পড়িয়া শুনাইতেন এবং মর্মার্থ বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহার বিবেকানন্দপ্রীতি ছেলেদের মধ্যেও ধীরে ধীরে অনুক্রামিত হইয়াছিল।

ক্লাশে পাঠ্য-বই পড়াইতে পড়াইতেই প্রফুল্লচন্দ্র নানা কৌতুককর অথচ শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের অবতারণা করিতেন। একদিন 'ভয়' ও 'ভূত' সম্বন্ধে আলোচনা হইল। প্রফুল্লচন্দ্র বলিতে আরম্ভ করিলেন, অনেকেই ভূতের ভয় দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু ভূত বলিয়া কোন জীব ইহজগতে কেহ দেখিয়াছেন কি? যে জিনিস কেহ দেখেন নাই, বা যাহার আস্তত্ব সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান, তাহা লইয়া এত ভয় কেন? তোমরা বিশ্বাস করিও, কোথাও ভূত নাই, কাজেই ভূতের ভয়ও নাই। মাভৈঃ রবে সর্বত্র বিচরণ করিবে।" প্রফুল্ল-চন্দ্রের কথা শুনিয়া ভূতের ভয় কোথায় চলিয়া গেল! নিশীথে বা রজনীর শেষ যামে নানা 'ভীতিপ্রদ' স্থানেও বিচরণ করিয়াছি, কিন্তু কখনও 'ভূত' দেখি নাই, 'ভূতের ভয়ও' পাই নাই। প্রফুল্লচন্দ্রের কথা আমাদের মনে এতই সাহসের সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। প্রফুল্লচন্দ্র এখন কোথায় আছেন জানি না, কিন্তু তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া আজও শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয়।

———

অশ্বিনীকুমার দত্ত

বাখরগঞ্জ জেলার একটি নিভৃত পল্লীতে আমার জন্ম। কৈশোরের যে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতাম তাহার শিক্ষকগণের মধ্যে তিন-চারি জনই ছিলেন বরিশালের ব্রজমোহন বিদ্যালয়—স্কুল ও কলেজের ছাত্র। তাঁহাদের আলাপ-ব্যবহার, আচার-আচরণ, এমন কি শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যেও বেশ একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। অনুভব করিতাম, বিদ্যালয়ের নৈতিক পরিবেশও অনেকটা উন্নত হইয়া উঠিতেছে। এই শিক্ষকগণের মধ্যে একজনের ছিলেন নিবারণচন্দ্র বৈদ্য। তাঁহার মধ্যে যেন ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সত্য-প্রেম-পবিত্রতার আদর্শ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার মুখ হইতে যে সব উপদেশ শুনিতাম তাহা মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিত; ইহার কারণ তিনি নিজ জীবনে এই সকল পালন করিয়া আসিতেছিলেন। ইংরেজী প্রবচন "Example is better than precept" এর মর্ম্মার্থ তাঁহার জীবন দেখিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি।

তখন অল্প বয়স, সব কথা যে বুঝিতাম তাহা নহে। তবে তাঁহার নিকট অনেক কথা শুনিতাম। ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত রজনীকান্ত গুহ নিয়ত পুস্তক অধ্যয়নে রত থাকিতেন। গ্রন্থাগারের এমন কোন পুস্তক প্রায় ছিলই না, যাহা তিনি অধ্যয়ন করেন নাই। বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠার মার্জিনের নোটগুলি ইহার সাক্ষী। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সুবিখ্যাত 'ভক্তিযোগ' গ্রন্থের প্রণেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং স্কুল-বিভাগের কর্ত্তা আচার্য্য জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে স্বচক্ষে দেখিবার বড়ই আগ্রহ জন্মিল। বাখরগঞ্জ জেলার অধিবাসী হইলেও এমন সুযোগ-সুবিধা ছিল না যে বরিশাল শহরে হামেশা যাই। যাহা হউক, আমি মাত্র তিন বার বরিশালে গিয়াছি। মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার আইন বলে প্রথম বার যে নির্ব্বাচন হয় তাহাতে কংগ্রেস যোগ দেয় নাই। তখন গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়-হয়। এই সময় দক্ষিণ বাখরগঞ্জ হইতে রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী সদস্যপদ প্রার্থী হইলে আমরা,

পল্লীর ছেলেরা, তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াই এবং অন্য একজনের সপক্ষে ভোট ক্যানভাস করি। আমি যে তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছি, এ কথা তাঁহার কানে যাইতে বিলম্ব হয় নাই। তিনি পিতৃদেবের নিকট আমার কার্য্য সম্বন্ধে অনুযোগ করিলেন ; বাবাও বাড়ীতে আসিয়া আমাকে কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনা করিলেন; তবে তাহা যে তাঁহার হৃদয় হইতে উৎসারিত নহে তাহাও যেন কতকটা বুঝিতে পারিলাম।

বড়দিনের ছুটি আসন্ন। স্থির করিলাম বাড়ীতে ছুটির ক'দিন পিতৃ-সন্নিধানে না থাকিয়া বরিশালে যাইব। তবে ষ্টীমারে নহে, পদব্রজে। ক্লাশে প্রথম হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়াছি, ইহাতে বাবা প্রসন্নই ছিলেন। স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতেও তিনি আমাকে সুযোগ দিতেন। তাঁহার নিকট হইতে যৎসামান্য পাথেয় মাত্র পাইলাম। বরিশাল আমাদের গ্রাম হইতে অন্যূন ত্রিশ মাইল দূরে। রাস্তা থাকিলেও বহু বড় বড় নদী-নালা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। পিতৃদেব এই সকল জানিয়াও কিন্তু আমার সঙ্কল্পে বাধা দিলেন না। দ্বিপ্রহরে বাড়ী হইতে রওনা হইয়া রাত্রে মাঝপথে এক আত্মীয়-বাড়ীতে অতিথি হইলাম। ভোরবেলা সেখান হইতে পদব্রজে বেলা অনুমান দশটার সময় বরিশালে পৌঁছিলাম। কোথায় উঠিব, কাহার নিকট থাকিব কিছুই ঠিক নাই। অকস্মাৎ বাড়ীর নিকটের এক পূজারী ব্রাহ্মণের সঙ্গে কালীবাড়ীতে দেখা হইল। তিনি হোটেলে আমার মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমি এ যাত্রা দুই দিন মাত্র বরিশালে ছিলাম। ইহার মধ্যেই সুন্দর সুন্দর অভিজ্ঞতা হইল। আমাদের স্কুলের প্রথম বারের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র জিতেন্দ্রনারায়ণ বসুর সঙ্গে পথিমধ্যে দেখা হয়। তাঁহার নিকট এক রাত্রি এই সর্ত্তে ছিলাম যে, ভোর হইবার পূর্ব্বেই সেখান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে।

এখন আসল কথায় আসা যাক। বরিশালে আসিয়াছি। এত দিন যাঁহাদের কথা শুনিয়া আসিতেছিলাম, সেই অশ্বিনীকুমার-জগদীশচন্দ্রকে দেখিয়া না গেলে যে আমার বরিশাল আগমনই বৃথা। অশ্বিনীকুমারের ভবনে গেলাম, শুনিলাম তিনি তখন বরিশালে নাই। বড়ই নিরাশ হইলাম। ইহার পর আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। মনে হইতেছে, এক দিন বৈকালে গিয়াছিলাম। জগদীশচন্দ্রের সৌম্য মূর্ত্তি। আমি তাঁহার ছাত্রের ছাত্র বলিয়া পরিচয় দিলাম। কত কালের পরিচয়—এইরূপ ভাবে

তিনি আমার সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি আমাকে কি কি বলিয়াছিলেন, ঠিক মনে নাই, মাত্র একটি কথা মনে আছে। তিনি বলিয়াছিলেন, 'ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি'। তিনি ইহার মানেও করিয়া দিয়াছিলেন। এই কথাটি তাঁহার মুখে সেই প্রথম শুনি। তদবধি ইহা আমার মনে গাঁথা রহিয়াছে। মানুষের যথার্থ উন্নতির মূলে যে এই বোধ, বয়স যতই বাড়িতেছে ততই উপলব্ধি করিতেছি।

অসহযোগ আন্দোলনের ঘনঘটা সুরু হইয়াছে। এবারে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন হইবে। বিপিনচন্দ্র পাল সভাপতি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আসিবেন, আরও রটিয়া গেল মহাত্মা গান্ধীও আসিতে পারেন। ঈষ্টারের ছুটিতে, ১৯২১ সনের ২৪শে মার্চ্চ এই সম্মেলন আরম্ভ হইবে। আমাদের পল্লীতে এবং স্কুলেও এ সংবাদ যথাসময়ে পৌছিল। আমরা তিন বন্ধুতে এবারেও পদব্রজে বরিশাল রওনা হইলাম। এ সময় থাকা-খাওয়ার অসুবিধা হয় নাই। জনৈক বন্ধুর পরিচিত কি আত্মীয় এক উকীলের বাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। মহাত্মা গান্ধী আসিবেন না জানিয়া বড়ই দুঃখ হইল। তবে এবার অশ্বিনীকুমারকে দেখিলাম। বার্দ্ধক্যেও প্রিয়দর্শন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ মাত্র এক পৃষ্ঠা পড়িয়াই, অন্যের উপর পাঠের ভার দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার গলা ভাঙিয়া গিয়াছে। সম্মেলন-মণ্ডপে এবং অন্যত্র সর্ব্বসাকূল্যে তাঁহাকে তিন-চারি বার দেখিয়া লইলাম।

ইহার পর দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। স্বদেশী আন্দোলন দেখি নাই, অসহযোগ আন্দোলন আমাদের মনে যে দোলা দিয়াছিল তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না। প্রবেশিকা পরীক্ষার তারিখ পিছাইয়া ১৯২২ সনের ৬ই এপ্রিল আরম্ভ হইবে ধার্য্য হইল। প্রথম শ্রেণীতে উঠিতেই অসহযোগ আন্দোলন ভারতব্যাপী জোর আরম্ভ হয়। আমাদের পল্লী অঞ্চলেও ইহার তরঙ্গ এমন ভাবে অনুভূত হইতে থাকে যে, আমরা কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলাম না; আমাদের যেন কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল। বলিতে কি, এক বৎসরের মধ্যে অল্প সময়ই পাঠে মনঃসংযোগ করিতে পারিয়াছি। দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত যাহা পড়িয়াছি একরূপ তাহার উপরই প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিলাম। তখন সমগ্র বরিশাল জেলায় একটি মাত্র পরীক্ষাকেন্দ্র। আমরা যথাসময়ে বরিশালে উপনীত হইলাম।

এইবার বরিশালে একাদিক্রমে নয় দিন থাকি। ইহার পর আর সেখানে যাওয়ার স্থযোগ ঘটে নাই। শুনিলাম অশ্বিনীকুমার বরিশালে আছেন। ইহার পূর্ব্বে একবার তাঁহার ভীষণ অস্থখ হয়, কিন্তু তাহা তিনি কাটাইয়া উঠিয়াছেন। তবে এখনও রুগ্ন। নয় দিন বরিশাল বাসের সময় স্নানাহার বাদে আমার দুইটি মাত্র কাজ ছিল—পরীক্ষা দেওয়া আর অশ্বিনীবাবুর বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপাদি করা। প্রথমটি সম্বন্ধে এখানে কিছুই বলিবার নাই। দ্বিতীয়টি আজিও আমার সমগ্র মন জুড়িয়া আছে।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের সৌম্য মূর্ত্তি; আর অশ্বিনীকুমারের শান্ত শুভ্র কান্তি। আমার সেই একই পরিচয়, তাঁহার ছাত্রর ছাত্র। বহু দিন পরে আগত পৌত্রকে দেখিয়া ঠাকুরদাদার যেমন আনন্দ, এই পরিচয়ে অশ্বিনীকুমারও যেন সেইরূপ আনন্দ পাইলেন। আমি তখন অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক, বা কিশোরও বলিতে পারেন, কিন্তু বৃদ্ধ অশ্বিনীকুমার যেন আমাকেও হার মানাইয়াছেন। তাঁর আচরণ ঠিক শিশুর মত; কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম, একজন মহামনা লোকের সম্মুখে আসিয়াছি। কতকালের পরিচিতের মত আমার সঙ্গে কথা জুড়িয়া দিলেন। কোন্ দিন কি কথা হইয়াছে ঠিক স্মরণ নাই। প্রথম দিন পরিচয়ের অতিরিক্ত কথা কিছু হইয়াছে কিনা তাহাও বলিতে পারিতেছি না। আমি যখন পরীক্ষান্তে বৈকাল বেলা দেখা করিতে যাই তখন আর এক ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

পরদিনও পরীক্ষা, সন্ধ্যা না হইতেই চলিয়া আসিলাম। প্রত্যহ পরীক্ষার পর বৈকালে যাইতে লাগিলাম। তাঁহার তক্তপোষের কোণের দিকে আলাদা উঁচু করিয়া একখানি অতিকায় পুস্তক রাখা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—গ্রন্থসাহেব; হিন্দুর যেমন বেদ, মুসলমানের যেমন কোরাণ, খ্রীষ্টানের যেমন বাইবেল, শিখদের তদ্রূপ এই গ্রন্থখানি। দেখিলাম সযত্নে ইহা রক্ষিত হইয়াছে। অশ্বিনীকুমার বলিলেন, যখন লক্ষ্ণৌ জেলে ছিলাম, গুরুমুখী শিখিয়া এই গ্রন্থখানি অদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। তখন মনে পড়িল, আমার শিক্ষক নিবারণবাবুর কথা। তিনি বলিয়াছিলেন, অশ্বিনী-কুমার যত দিন জেলে ছিলেন, এক মুহূর্ত্তও আলস্যে কাটান নাই, রাশি রাশি বই পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি যে এখানে বসিয়া বহু কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন তাহা পরে জানিতে পারিয়াছে।

অশ্বিনীকুমার পিতা ব্রজমোহন দত্তের সঙ্গে শৈশবে ও কৈশোরে বাংলার

বিভিন্ন জেলায় বাস করিয়াছেন। তিনি যখন যেখানে ছিলেন, সেখানকার কথ্য ভাষা (dialect) বেশ আয়ত্ত করিয়া ফেলিতেন। ভাষা শুনিয়া বুঝাই যাইত না তিনি কোথাকার লোক। অশ্বিনীকুমার আমার সম্মুখেই কলিকাতার ও বাখরগঞ্জীয়া ভাষায় এমন চমৎকার কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন যে, আমার একেবারে তাক্ লাগিয়া গেল।

তাঁহার প্রমুখাৎ আর একটি উপভোগ্য বিষয় শুনিয়াছিলাম – আশুতোষের আহার। স্যাড্‌লার কমিশনের সদস্যরূপে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বরিশাল ব্রজমোহন কলেজেও গিয়াছিলেন। ব্রজমোহন কলেজ তাঁহার নিকটে নানা কারণেই ঋণী। অশ্বিনীবাবু বলিলেন, আশুতোষ যখন বরিশালে যান, তখন আমি বরিশালে অনুপস্থিত। কিন্তু তৎসত্বেও তাঁহার আদর-যত্নের ত্রুটি হয় নাই। আশুতোষ কিরূপ ভোজনপটু, শোন। চৌষট্টিটি বাটিতে খাদ্যদ্রব্যাদি থালার চারিদিকে সাজাইয়া রাখা হয়। আশুতোষ একে একে সবই নিঃশেষ করিলেন। এ ধরনের লোককে খাওয়াইয়াও আনন্দ হয়।

অশ্বিনীকুমারের নিকট কলেজের ছাত্রদের বহু কাহিনী শুনিলাম। বলা বাহুল্য, এ সকল আগেকার কালের কথা। কারণ তখনকার সরকার-পোষিত ব্রজমোহন কলেজের উপর অশ্বিনীকুমার বড়ই বিরক্ত ছিলেন, কথা বলিতে বলিতে তাঁহার ভাষা তীব্র হইয়া উঠিত। তখনও কালীপ্রসন্ন ঘোষ সহকারী অধ্যক্ষ। তিনি বলিয়াছিলেন, কলেজে ঐ একটিমাত্র লোক আছেন যিনি পুরাতনের জের যৎকিঞ্চিৎ টানিয়া চলিয়াছেন। যাহা হউক, সেকালের ছেলেদের কথা বলিতে বলিতে অশ্বিনীকুমার একেবারে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন। একদিন একটি ছাত্র আসিয়া খবর দিল, তাঁহার বাবা ও কাকারা বিষয় লইয়া এমনই কলহোন্মত্ত হইয়াছে যে, তখনই তিনি গিয়া তাঁহাদিগকে না থামাইলে খুনাখুনি হইয়া যাইবে। অশ্বিনীকুমার কহিলেন, তখনই সতীশকে (সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) পাঠাইলাম। দেরী করিলে চলিবে না। তিনি সাইকেলে ছাত্রটিকে লইয়া প্রায় পনর মাইল দূরের সেই গ্রামটিতে চলিয়া গেলেন। বিবাদ মিটাইয়া যথাসময়ে আসিয়া আমাকে খবর দেন।

আর এক দিনের কথা। একটি ছাত্র—বোধ হয় তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর —আসিয়া অশ্বিনীকুমারের কাছে বসিয়া বড়ই কাঁদিতে লাগিল। যেন সে কত অপরাধী। বাস্তবিকই সে ভয়ানক অপরাধ করিয়াছিল। অপরাধের

কথা বলিতে বলিতে ছাত্রটি কাঁদিয়া ঘর ভাসাইয়া দিতেছে। অশ্বিনীকুমার কিছুক্ষণ থ' হইয়া রহিলেন। পরে সান্ত্বনা দিতে দিতে কোলে জড়াইয়া ধরিলেন। ছাত্রটিকে বলিলেন, তোমার যখন সত্যই অনুতাপ হইয়াছে তখন আর তোমার পাপ নাই, তুমি পাপ হইতে মুক্ত, চোখের জলে এমন গুরুতর অপরাধও ক্ষালন হইয়া গিয়াছে। অশ্বিনীকুমারের কথায় যুবক আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া গেল। এই যুবক পরে নাকি বেশ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

একটু আগে বলিয়াছি অশ্বিনী বাবু সেকালের ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের কথা বলিতে বলিতে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন। তিনি আমাকে বলিলেন, একবার লাহোরে গিয়াছেন। প্রাক্তন ছাত্র সতীশ ওখানকার কলেজের অধ্যাপক। সতীশ বাবুর পুরানাম হয়ত তিনি বলিয়াছিলেন কিন্তু এতদিন পরে তাহা লেখকের স্মরণ হইতেছে না। অশ্বিনীবাবু বলিয়া চলিলেন, 'আমার পৌছা সংবাদ প্রাপ্তির পর হইতেই ছাত্র, অধ্যাপক, অভিভাবক দলে দলে সতীশের বাড়ী আসিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাহাদের আগমনের উদ্দেশ্য আমাকে দেখা, আমার সঙ্গে আলাপাদি করা। আমি কতকটা কৌতুক ও বিস্ময় অনুভব করিলাম। তাহারা কিনা অমন অধ্যাপক সতীশের গুরু কেমন তাহা দেখিতে আসিয়াছেন। লাহোরে সতীশ অধ্যাপনার দ্বারা এবং নিজ আচরণে পরিচিত মাত্রেরই চিত্ত জয় করিয়া লইয়াছেন। ব্রজমোহন কলেজের আদর্শ সতীশের মত ছেলেরাই তো দেশ বিদেশে প্রচার করিতেছিলেন।"

আর একটি ঘটনার কথা। হয়ত শিক্ষাব্রতী নিবারণচন্দ্রের মুখে পূর্ব্বেই শুনিয়া থাকিব। মনে হইতেছে অশ্বিনী বাবুও গল্প ছলে আমাকে ইহা বলিয়াছিলেন। একবার ইউনির্ভাসিটির তরফে ডক্টর পি, কে, রায় ব্রজমোহন কলেজ পরিদর্শন করিতে যান। তিনি যেদিন কলেজে গেলেন সেদিন ছাত্রদের পরীক্ষা হইতেছিল। তিনি ছাত্রদের ঘরে গিয়া দেখিলেন খবরদারী করিবার জন্য কোন অধ্যাপক গার্ড নাই। আফিস-ঘরে ফিরিয়া কতকটা রাগতই অশ্বিনী বাবুকে বলিলেন (পূর্ব্ব হইতেই অশ্বিনী বাবুর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল) "একি দেখছি, ছেলেদের পরীক্ষা হচ্ছে অথচ ঘরে একজনও গার্ড নেই, আপনার কলেজের একি অ-ব্যবস্থা ?" অশ্বিনীবাবু কিন্তু চটিলেন না। তিনি তাঁহাকে বন্ধু ভাবেই বলিলেন, "আপনি একবার সঙ্গোপনে আড়াল থেকে দেখে আসুন ছেলেরা নকল করছে কিনা! দেখলেই বুঝবেন

আপনি যাকে অ-ব্যবস্থা বলছেন, তাই আমার কলেজের সু-ব্যবস্থা।" ডক্টর রায় আড়াল হইতে চুপে চুপে প্রতিটি ঘর ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখেন, টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত নাই। কেহ কাহারও দিকে চাহিতেছে না, হাসি নাই, কাশি নাই, কথা নাই। তিনি ত দেখিয়া অবাক। ফিরিয়া আসিয়া অশ্বিনী কুমারকে বলিলেন "অশ্বিনী বাবু আপনি ধন্য, আপনার কলেজ ধন্য। আপনার কলেজে যে নীতির আদর্শ এমন ভাবে কাজে রূপ নিয়েছে তাতে আমি যারপর নাই বিস্মিত হয়েছি। এমনটি তো কোথাও দেখা যায় না।" এই কথা আমাকে বলিতে বলিতে অশ্বিনীকুমারের চিত্ত যেন আত্ম-প্রসাদে ভরিয়া উঠিল।

বালসুলভ চাপল্যবশতঃ অশ্বিনীকুমারকে অনেক প্রশ্ন করিতাম। এখন মনে এই বলিয়া আক্ষেপ হয় যে, তাঁহাকে তখন আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না কেন। তখন অসহযোগ আন্দোলনে অনেকটা ভাটা পড়িয়াছে। বাংলার ও বাহিরের বহু নেতার নাম শুনিয়াছি, পল্লীগ্রামের স্কুলের ছাত্র ; এমন কোন পুস্তকাদি তখন পাই নাই যাহা দ্বারা সব কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে পারি। পূর্ববারে বরিশাল সম্মিলনে আসিয়া চিত্তরঞ্জন দাশ এবং বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়কে দেখিয়া গিয়াছি। চিত্তরঞ্জন এখন সর্বত্যাগী 'দেশবন্ধু'। তাঁহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় অশ্বিনীকুমার বলিলেন, দাশ সাহেবের ত্যাগ অনন্যতুল্য। কি সাহেব ছিলেন, এখন একেবারে সর্বত্যাগী, দেশবন্ধু! অশ্বিনীকুমার চিত্তরঞ্জনকে দাশ সাহেব বলিতেন পূর্বেই শুনিয়াছি। চিত্তরঞ্জন অসহযোগের পূর্বে এই নামেই পরিচিত ছিলেন। বিপিনচন্দ্রকে অশ্বিনীকুমার প্রসিদ্ধ বক্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন মনে পড়ে।

দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথের তখন বড়ই দুর্নাম। সরকারের সঙ্গে তাঁহার সহযোগিতার নিন্দা করিয়া বাংলার চরমপন্থী সংবাদপত্রসমূহে প্রায় প্রত্যহই কিছু-না-কিছু লেখা হইত। ইহার মধ্যেও কিন্তু তাহার প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব লক্ষ্য করিতাম। 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় সুরেন্দ্রনাথকে 'Surrender Not' বলিয়া উল্লেখ করিতে দেখিয়াছি। সুরেন্দ্রনাথ অশ্বিনীকুমার অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ, অথচ তাঁহার তখনও কি রকম শক্তি। জিজ্ঞাসা করিলাম, সুরেন্দ্রনাথ অপেক্ষা অল্পবয়স্ক হইয়াও তাঁহার শরীর এরূপ ভাঙিয়া পড়িল কেন? অশ্বিনীকুমার একটু উত্তেজিত হইয়াই বলিলেন, 'সুরেন্দ্রবাবু দু'বেলা ডাম্বেল ভাঁজেন, রোজ একটা করিয়া মুরগী খান। আমি কি ডামবেল ভাঁজি না মুরগী

খাই যে, আমার শরীর এখনও তাঁহার মত থাকিবে?' 'ফেডারেশন হল'-প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তাঁহার প্রতি অশ্বিনীকুমারের ভাল ধারণা ছিল না। তিনি বলিলেন, "টাকাগুলি কি হইল তাহারও কেহ হদিস্ জানে না।" পরে জানিতে পারিয়াছি, এই টাকা ভারত-সভার হেপাজতে ছিল, কিন্তু ঐসময় পর্যন্ত তাহার দ্বারা জমি কেনা ব্যতিরেকে বিশেষ কোন কাজ হয় নাই। তবে এই টাকার সুদ হইতে নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে কিছু কিছু সাহায্য করা হইতেছিল। বর্তমানে পূর্বেক্রীত জমির উপর ঐ টাকায় 'ফেডারেশন হল' বা মিলন মন্দির নির্মিত হইয়াছে।

লজপত রায়, মদনমোহন মালবীয় প্রমুখ নিখিল-ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কথাও একে একে জিজ্ঞাসা করি। লজপত রায় পঞ্জাবের সিংহ; তাঁহার প্রতি অশ্বিনীকুমার শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বস্তুতঃ লজপত রায়ের ত্যাগ কাহার না দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে? তাঁহার মত জ্ঞানী, গুণী, ত্যাগী নেতা যে-কোন দেশেই বেশী মিলিবে না। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় কাশীধামে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, আবার তিনি একজন প্রসিদ্ধ দেশ-নেতাও। তাঁহার প্রতি আমার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। তবে তিনি যে তখন বাঙালীদের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না একথা শিক্ষকগণের কাহারও মুখে পূর্বে শুনিয়াছিলাম। অশ্বিনীকুমারকে মালবীয়জীর কথা জিজ্ঞাসা করায় তাঁহার প্রমুখাৎও বিশেষ কোন সদুত্তর পাই নাই।

অশ্বিনীকুমারের গৃহ-প্রাঙ্গণের বিখ্যাত তমালগাছটি সান-বাঁধানো। বৈকালবেলা আমি এখন তাঁহার প্রাত্যহিক সঙ্গী। তিনি আমার স্কন্ধে ভর দিয়া ইহার চারিদিকে দু-তিন দিন বৈকালে পায়চারি করিয়াছেন। প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে বিষ্ণুমন্দির, তাহার মধ্যে অতি শুভ্র একটি বিষ্ণুমূর্তি। অশ্বিনীকুমার বলিলেন, এই মূর্তিটি তিনি জয়পুর হইতে আনিয়া এখানে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আরও বলিলেন, প্রাঙ্গণের ভিতরে কয়েকটি ঘর ছিল, প্রথমে স্কুল ও কলেজ বহুদিন যাবৎ এখানে বসিত। পরে অন্য বাড়ীতে দুইই চলিয়া যায়। ফাঁকা জায়গা অনেকটা পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম। তখন ছোট ছোট কোন গাছ দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে, তবে ফুলগাছ ছিল না নিশ্চয়। কারণ আমি বেড়াইতে বেড়াইতে এক দিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, প্রাঙ্গণের ভিতরে এত জায়গা পড়িয়া আছে, কিন্তু কোন ফুলগাছ নাই কেন? তিনি বলিতে লাগিলেন, 'কেন নাই জানিস্? স্কুল কলেজ অন্যত্র যাওয়ার পর

জায়গা যখন পরিষ্কার হইল, তখন অনেক ফুলগাছ লাগানো হয়। ফুলও ফুটিত। কিন্তু ফুল রাখা যাইত না।' বলিতে বলিতে তিনি খানিকটা উচ্চৈস্বরে বলিলেন ফুল যাহারা ছিঁড়ে তাহারা এরূপ অপকর্ম্ম নাই যে না করিতে পারে। অশ্বিনীকুমারের সৌন্দর্য্যবোধ এতই তীব্র ও গভীর ছিল।

আমার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। পরদিনই বরিশাল ত্যাগ করিতে হইবে। শেষ দিন বৈকালে তাঁহার নিকট যথারীতি গেলাম, বিদায়কালে পদধূলি লইবার জন্য। আমি যাইবার পরই মনে হয়, তিনি নীচতলার প্রকোষ্ঠ হইতে আঙ্গিনায় আসিয়া আরাম কেদারায় বসিলেন। আমি সম্মুখে বসিয়াছিলাম। সবেমাত্র সূর্য্যাস্ত হইয়াছে, কিন্তু গোধূলি তখনও রাত্রির ঘনান্ধকারে মিলাইয়া যায় নাই। সম্মুখে অর্দ্ধশায়িত প্রশান্ত মূর্ত্তি। এই ক'দিন যখনই তাঁহার কাছে গিয়াছি, তাঁহার মস্তকের তালুদেশে তৈল মালিশ করিতে দেখিতাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম, কবিরাজী তেল, ঔষধরূপে ব্যবহার করিতেছেন। এদিনও মাথায় দেওয়া হইতেছিল। পরদিন বরিশাল হইতে বাড়ী রওনা হইব। বলিলাম বিদায় লইতে আসিয়াছি। অসহযোগের মরশুমে প্রচলিত কালেজী শিক্ষার উপর আমি বীতরাগ হইয়াছিলাম, একজন বন্ধুর পরামর্শে এখানে সেখানে চিঠি লিখিয়া কোন কারিগরি বিদ্যাশিক্ষার জন্য Prospectus বা অনুষ্ঠানপত্র আনাইতাম। অশ্বিনীকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার পর কি করিব। যেমন প্রশ্ন, তেমনি উত্তর, "ঘোড়ার ঘাস কাটবি"। আর অফুরন্ত হাসি। একটু পরে ভাবিয়া বলিলেন, কোন টেক্‌নিক্যাল লাইনে যাওয়াই ভাল। আমার মনের মত কথা পাইলাম। ইহার পর টেক্‌নিক্যাল লাইনে যাওয়ার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু বিধি বাম। টেক্‌নিক্যাল লাইনে যাওয়া হইল না। কালেজী শিক্ষা পাইয়া এখনও 'ঘোড়ার ঘাস'ই কাটিতেছি। অশ্বিনীকুমারের নির্দ্দেশে ব্রজমোহন কলেজে প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থীদের বিদায়-অভিনন্দনে যোগ দিলাম। এখানকার বিস্মিজ ভাষায় বক্তৃতাটি বড়ই ভাল লাগিল। পরদিন বাড়ী রওনা হইলাম। অশ্বিনী-কুমারকে সেই আমার শেষ দেখা।

কামাখ্যাচরণ নাগ

১৯২২ সনের জুলাইমাসে বাগেরহাট কলেজে আই-এ প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হই। ১৯২৪ সনে পরীক্ষা দিয়া চলিয়া আসি। প্রথমেই এই অনাড়ম্বর মানুষটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কামাখ্যাচরণ বাগেরহাট কলেজের অধ্যক্ষ, 'প্রিন্সিপ্যাল কামাখ্যা নাগ' নামে তিনি সর্বত্র পরিচিত। ইহার পূর্বে তিনি দৌলতপুর হিন্দু একাডেমির প্রিন্সিপ্যাল বা অধ্যক্ষ ছিলেন বহুবৎসর। বাগেরহাট কলেজের প্রতিষ্ঠা অবধি তিনিই এই কলেজের অধ্যক্ষ। এখানে বলিয়া রাখি, অন্য বহু কলেজে অধ্যক্ষ পদের জন্য আহূত হইয়াও তিনি কখন বাগেরহাট কলেজকে পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই কলেজেই অধ্যক্ষ-পদে স্থিত ছিলেন। তাঁহার সময়ে বাগেরহাট কলেজের যথেষ্ট উন্নতি হয়। ক্রমে ইহা একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হইয়াছিল। আমি ১৯২৮ সনে শেষ বার বাগেরহাটে যাই, তখন দেখিলাম কামাখ্যাবাবু সপরিবারে কলেজের হাতার মধ্যস্থিত গৃহেই বাস করিতেছিলেন। প্রিন্সিপ্যালের বাসগৃহ নির্মিত হইয়াছে। কলেজের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির মূলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের হাত ছিল অনেকখানি। কলেজ কর্তৃপক্ষ কৃতজ্ঞতা পরবশ হইয়া পরে ইহার নামকরণ করিয়াছেন "আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ।"

তখন সবে কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছি। কামাখ্যা বাবুর পাণ্ডিত্য বা বিদ্যাবত্তার কি বুঝিব? আর্ট্‌স্ বিভাগে ভর্তি হইয়াছি, ঐ বৎসরই প্রথম সায়ান্স-বিভাগ খোলা হইল। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে যখন পড়ি তখন প্রত্যহ আড়াই মাইল দূর হইতে কাঁচা রাস্তা দিয়া যাতায়াত করিতাম। বাগেরহাটের কাছে আসিয়া নদী পার হইতে হইত। কলেজের নিকটবর্তী হইলেই কোন কোন দিন হাসির রোল শুনিতাম, তখনই বুঝিতাম প্রিন্সিপ্যাল ক্লাস লইতেছেন। কামাখ্যা বাবু ছিলেন রাস-ভারি লোক। বাহিরে খুবই কঠিন ও কঠোর মনে হইত; কিন্তু এই কঠিন বর্মের মধ্যে যে অন্তঃসলিলা ফল্গু বহিতেছিল, নানা সূত্রে আমরা তাহার

পরিচয় পাইয়াছিলাম। তাঁহার বক্তৃতা মাঝে মাঝে এতই রসপ্লুত হইত যে আমাদের হাসিতে হাসিতে পেটে খিল ধরিয়া যাইত। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাঁহার ক্লাসে কেহ টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করিত না। তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কাজেই ভয় থাকা স্বাভাবিক। কলেজের কিন্তু পদ-স্থলভ ভয়ের দ্বারাই তিনি ছাত্রদের দাবাইয়া রাখিতেন না। অধ্যাপনার ভিতর দিয়া ছাত্রদের মনে তিনি এমন একটি ভাবের উদ্রেক করিতেন যে আমরা একেবারে তন্ময় হইয়া তাঁহার কথা শুনিতাম। কামাখ্যাবাবু আমাদিগকে বাইবেলের সিলেকশানস (বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট) নিয়মিত পড়াইতেন। আমাদের পাঠ্য অংশের মূল তথ্যগুলি নানা যুক্তি প্রমাণ উদাহরণসহযোগে অতি সরল করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না, তথাপি মনে হইত তিনি কত বিষয় পড়িয়াছেন, কত কথাই না তিনি জানেন।

উক্ত সিলেকশানসের ভূমিকায় লেখা ছিল, বাইবেল পাঁচশত কি ছয় শত ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, ইহার দ্বারাই ইহার নিগূঢ় মানবধর্মের কথা প্রমাণিত হয়। কামাখ্যাবাবু অধ্যাপনকালে ইহার সমালোচনা করিতে ছাড়েন নাই। তিনি অবশ্য প্রথমেই আমাদের বলিয়াছিলেন যে, বাইবেলে মানব-ধর্মের শাশ্বত আবেদন রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত নাই। তবে অতগুলি ভাষার সকলেই যে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া উহার অনুবাদ করিয়াছেন, একথা সত্য নয়। রাজশক্তির সহায়তায় এবং প্রচুর অর্থব্যয়ের সাম্যর্থহেতুই ইহা সম্ভব হইয়াছে। তাঁহার সমালোচনার ব্যঞ্জনা তখন বুঝি নাই। এখন মনে হইতেছে, তিনি যেন বলিতে চাহিয়াছিলেন, শুধু বাইবেল কেন, উক্ত দুইটি বস্তুর সাহায্য পাইলে যে কোন জিনিসই ঐরূপে অনুবাদিত হইতে পারিত। গীতার কথাই হয়তো তখন তাঁহার মনে ছিল। গীতা যে তিনি বিশেষভাবে অনুধ্যান করিতেন, গীতার শ্রীকৃষ্ণের তিনি যে পরম ভক্ত পরে তাহার প্রমাণ পাইয়াছি।

কামাখ্যাবাবু আমাদিগকে বাইবেল পড়াইতেন বটে, কিন্তু এমন কোন্ বিষয় ছিল না যাহা তিনি পড়াইতে পারিতেন না। লজিকের অধ্যাপক নাই, তিনি লজিক পড়াইতেছেন; সংস্কৃতের অধ্যাপক অনুপস্থিত, তিনি সংস্কৃত ক্লাস লইতেছেন। আমার অঙ্ক ছিল না, কিন্তু দেখিতাম অধ্যাপকের অভাবে তিনি অঙ্কের ক্লাসও লইতেছেন। রসায়ন, পদার্থ-বিদ্যা—ইহাও

যেন তাঁহার অধিগত। সর্ববিদ্যা-বিশারদ এই চৌকোস মানুষটিকে দেখিয়া তাক লাগিয়া যাইত। প্রত্যেকটি বিষয়েই তিনি উপস্থিতমত এমনভাবে পড়াইতেন যে, শ্রোতার মনে হইত যে ঐ ঐ বিষয়টিতে যেন তাঁহার কত দখল। প্রত্যেকটি বিষয়েই তিনি আবার রসাল করিয়া পড়াইতে পারিতেন। এমন বিদ্বান ব্যক্তির ছোঁয়া লাগায় কলেজভবন যেন সরস্বতীর পীঠস্থান হইয়া উঠিল।

ক্রমে জানিলাম, কামাখ্যাবাবু তৃতীয় শ্রেণীর এম. এ। প্রথমে খানিকটা বিস্ময়ের উদ্রেক হইল। পরে মনে হইল, তৃতীয় শ্রেণীতে কি আসে যায়? যিনি বিদ্বান, তাঁহার আবার শ্রেণী কি? পরবর্তী কালে বহু মনীষীর জীবন-কথা আলোচনা করিতে গিয়া ইহাই সার বুঝিয়াছি যে, কলেজী শিক্ষা (উচ্চতম বিদ্যায়ও) আমাদিগকে শুধু বিদ্যামন্দিরের দুয়ারে নিয়া পৌঁছাইয়া দেয়। বিদ্যামন্দিরের পূজারী হইতে হইলে নিয়ত অনুধ্যান অনুশীলন করিতে হইবে, শ্রদ্ধানত চিত্তে, নিষ্ঠার সঙ্গে। তবে এ তো গেল পরবর্তী কালের অভিজ্ঞতার নির্দেশ। কিন্তু তখন অত শত বুঝিতাম না। মনের কোণে যে উচ্চতম শিক্ষার প্রতি আগ্রহ না বাড়িল তাহা নয়; মনে হইত তৃতীয় শ্রেণীর এম. এ'র বিদ্যা এত উঁচু, না জানি সেকালের দ্বিতীয় শ্রেণী প্রথম শ্রেণীর এম-এ ডিগ্রী-ধারীরা আরও কত বিদ্বান। আমরা যখন পড়ি, তখন ঐ কলেজে প্রথম শ্রেণীর এম-এও কয়েকজনই ছিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ বেশ ভালই পড়াইতেন। কিন্তু মনে হইত, সেকালের এম-এরা কি চৌকষ। তখনকার দিনে পাঠ্যবিষয়ের বিভেদ করা হইত না, আর্টস্ ও সায়ান্স আলাদা করা হয় নাই। কাজেই প্রতিটি ছাত্রকেই উভয় বিভাগের বিভিন্ন বিদ্যা কম বেশি আয়ত্ত করিতে হইত। বিদ্যার প্রগতি ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কুঠরিবদ্ধ করার হয়ত দরকার হইয়া পড়িয়াছে। কামাখ্যাবাবু কত বড় বিদ্বান, আমরা কলেজের প্রকোষ্ঠে বসিয়া তাহা অনুভব করিতাম।

একবার তাঁহার একটি বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম। বাগেরহাটের ধর্মরক্ষিণী সভা জন্মাষ্টমীর সময় একটি সাধারণ সভার আয়োজন করেন। সন্ধ্যার পরে সভা, বক্তা কামাখ্যাচরণ নাগ। সভাগৃহ লোকে ভরিয়া গিয়াছে। আমরা কলেজের ছাত্ররা সেখানে ভিড় জমাইয়াছি। কামাখ্যা বাবু ঝাড়া আড়াইঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন। ইহার পূর্বে অসহযোগের মরশুমে বরিশালের শরৎ ঘোষের, (পরে স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত, সদ্য-পরলোকগত)

এক নাগাড়ে চারঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম। ইহার মধ্যে রাজনীতির আবেগ ছিল। ভাষার ঐশ্বর্য আর বিষয়ের গুরুত্ব আমাদিগকে ক্লান্তির হাত হইতে রেহাই দিয়াছিল। কামাখ্যাবাবুর বক্তৃতায় রাজনীতির মাদকতা ছিল না, ইহা নিছক শাস্ত্রচর্চা ছিল। জন্মাষ্টমীর দিনের ব্যাখ্যা, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, তাঁহার জীবন, জীবনধর্ম ইত্যাদি নানা বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার পূর্বক অনর্গল বলিয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ একসময় শিক্ষিত হিন্দুসাধারণের আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি নিছক হিংসা বা নিছক অহিংসার বাণী শোনান নাই। অধর্মের বিলোপসাধনে হিংসার আশ্রয় গ্রহণ পাপ নয়। বিপ্লবী বাঙ্গালীচিত্তে শ্রীকৃষ্ণ এক স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছিলেন। হয়ত আমাদের যুবক ছাত্রদের একারণেও এই বক্তৃতা ভাল লাগিয়াছিল। কিন্তু ভাল লাগা-না-লাগার প্রশ্ন এখানে তুলিব না। দেখিলাম অধ্যক্ষ কামাখ্যাবাবু শুধু কলেজী বিদ্যায়ই সুপটু বা পারঙ্গম নহেন। সংস্কৃত শাস্ত্র-সাহিত্যেও তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। কামাখ্যাবাবুর বক্তৃতা শুনিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম এবং পরিতৃপ্ত চিত্তে গৃহে ফিরিলাম। ভাষার লালিত্য এবং ব্যাখ্যানের অভিনবত্ব আমাদিগকে কতখানি মুগ্ধ করিয়াছিল, স্বল্প কথায় বলিতে পারিব না। কামাখ্যাবাবু ভক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার এই দিকটার পরিচয় কলেজগৃহে পাই নাই। তবে তিনি যে এক আদর্শ পুরুষ তাহার পরিচয় আমরা নানাসূত্রেই পাইয়াছিলাম।

দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে ; এখন সব কথা স্মরণ হইতেছে না। কি কারণে জানি না, তাঁহার স্নেহ-প্রীতি আমি একটু বিশেষভাবেই পাইয়াছিলাম। ১৮২২-২৩ সনে অসহযোগের প্রাথমিক উন্মাদনা অনেকটা চলিয়া গিয়াছে। সর্বত্যাগী দেশকর্মীরা নিজ নিজ রুচি ও আদর্শ অনুযায়ী রচনাত্মক কর্মে লাগিয়া গিয়াছেন। বিখ্যাত বিপ্লবী কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সাধারণের কিরণদা) দৌলতপুর (খুলনা) কলেজের সন্নিকটে 'সত্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করিয়া যুবক মন-প্রস্তুতি কর্মে লিপ্ত হইয়াছেন। রাজনীতির চর্চার সঙ্গে সঙ্গে সত্যাশ্রম শিক্ষা সাহিত্যবিষয়ক আলোচনার কেন্দ্র হইয়া উঠিল অবিলম্বে। কিরণদা খুলনা জেলা জাতীয়-শিক্ষা-সম্মেলন আহ্বান করিলেন। অধ্যক্ষ কামাখ্যাবাবু সভাপতি, নির্দিষ্ট দিনে কামাখ্যাবাবু দৌলতপুর যান। তিনি আমাদের কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। সঙ্গে কে কে ছিলেন, স্মরণ হইতেছে না। শরৎচন্দ্র সাহা ছিলেন মনে হইতেছে। শরৎচন্দ্র ও আমি

এক স্কুলে পড়িতাম, তিনি আমার একক্লাস উপরে পড়িতেন। আমরা একসঙ্গে পায়ে হাঁটিয়া ত্রিশ মাইল দূরে বরিশালে যাই বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্সে ১৯২১ সালে। শরৎ কলিকাতায় আসিয়া বিদ্যাসাগর কলেজে বি. এ পড়িতে পড়িতে মারা যান।

যাক্ আসল কথা এখন বলি। আমরা দৌলতপুর স্টেশনে নামিবামাত্রই সাদরে অভ্যর্থিত হইলাম। আমাদের অভ্যর্থনা মানে কামাখ্যাবাবুরই অভ্যর্থনা। তিনি যে ও অঞ্চলে বড়ই পরিচিত। দৌলতপুর কলেজে প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন বহু বৎসর; এ কারণ তাঁহার অতি ঘনিষ্ঠ পরিচিতি। আমরা সত্যাশ্রম প্রাঙ্গণে সভাস্থলে নীত হইলাম। আশ্রম দ্বারে এক মূর্তি দেখিলাম—একান্ত অপরিচিত কিন্তু কত আপনার। খর্বাকৃতি, পরনে খদ্দরের ধুতি, গায়ে হাতকাটা কোর্তা, গলায় ভাঁজ-করা মোটা চাদর। কামাখ্যা-বাবুকে আলিঙ্গন করিলেন, উভয়ের মধ্যে কত কথা হইল, হয়ত শুনিয়াছি, কিন্তু মনে নাই। অপরাহ্নে সভা হইল, কামাখ্যাবাবু বক্তৃতা দিলেন। আরও কেহ কেহ বলিলেন, প্রস্তাবও পাশ হইল, মোটামোটি এইরূপ মনে আছে; বিশদভাবে কিছুই মনে নাই। কামাখ্যা বাবু বিশিষ্ট অতিথি। রাত্রিতে আমরা সকলেই কলেজ-হাতার মধ্যে ছিলাম। কলেজের গভর্ণমেণ্ট হোস্টেলে আমাদের আহারাদির ব্যবস্থা হইল। দৌলতপুর কলেজের বহু হোস্টেলে, অধিকাংশই খড়ের ছাওয়া ঘর। ইহাদের মধ্যে গভর্ণমেণ্ট হোস্টেল যেন নৈকষ্য-কুলীনের মত মাথা উঁচাইয়া ছিল। সুন্দর দোতালা বাড়ী। আমাদের খাওয়া-দাওয়া পরিপাটি মতই হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে কামাখ্যাবাবুর সঙ্গে আমরা কলেজভবনের দ্বিতলে গেলাম। সেখানে সতীশ বাবুকে দেখিলাম। সতীশ বাবু বিখ্যাত সতীশ-চন্দ্র মিত্র, যশোহর-খুলনার ইতিহাস প্রণেতা। তিনি বহু বৎসর এই দুইটি জিলার বিভিন্ন দ্রষ্টব্য ঐতিহাসিক অঞ্চল ঘুরিয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। পুঁথিপত্র ঘাঁটিয়া এই অভিজ্ঞতাকে পূর্বাপর প্রমাণাদি দ্বারা যাচাই করিয়া লইয়াছেন, পরে তিনি ঐরূপ একখানি প্রামাণিক ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বাংলার বিভিন্ন জেলার, বিশেষতঃ যে-সব জেলার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে, সে-সব জেলার এক একখানি তথ্যবহুল প্রামাণিক ইতিহাস রচিত হইলে আজিকার বাঙালী এতটা বিভ্রান্ত হইয়া পড়িত না মনে হয়। কোন কোন জেলার ইতিহাস রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ততটা প্রামাণিক ও

পাঠযোগ্য হয় নাই বলিয়া সাধারণে উপকৃত হইতেছে না। সতীশবাবু দ্বিতলস্থিত ছোট মিউজিয়ামটি আমাদিগকে দেখাইলেন। মূর্তি, ইটের টুকরা, শিল্পকাজের নমুনা কোথায় কি ভাবে পাইয়াছেন আর তাহাদের ঐতিহাসিক গুরুত্বই বা কি, আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। ইহার পরে আমরা বাগের-হাটে ফিরিয়া আসিলাম।

আর একটি দিনের কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। আমাকে জনৈক সতীর্থ-বন্ধু ধরিল, কামাখ্যাবাবুর নিকট তাহাকে লইয়া যাইতে হইবে। সে সার্টিফিকেটে পার্সেণ্টেজ জাল করিয়াছে এবং কেরাণী তাহা ধরিয়া ফেলিয়াছে। অন্য কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর পাঠ সমাপনান্তে সার্টিফিকেট লইয়া সে আমাদের কলেজে ভর্তি হয়। তাহার মাতুল নামজাদা, দেশের লোক এক ডাকে চেনে। অপরাধ সরাসরি স্বীকার করিতে হইবে, এই সর্তে এক সন্ধ্যায় আমি তাহাকে লইয়া কামাখ্যাবাবুর বাসায় যাই। সেখানে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিবামাত্র আমি বলিলাম, এই সতীর্থটি পার্সেণ্টেজ জাল করিয়াছে, খুবই অনুতপ্ত, আপনার নিকট অপরাধ জানাইতে ও ক্ষমা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। শুনিয়া প্রথমে কামাখ্যাবাবু খুবই চটিয়া গেলেন। Rustication, একেবারে rustication বলিয়া খুবই ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বন্ধুটি যে অনুতপ্ত, অপরাধ সে বুঝিয়া স্বীকার করিয়া লইতেছে, আর তিনিই এ বিপদে তাহাকে রাস্টিকেশনের হাত হইতে বাঁচাইতে পারেন। দেখিলাম, কামাখ্যাবাবু বজ্রের মত কঠোর হইয়াও পুষ্পের মতই কোমল। দেখি কি করিতে পারি, বলিয়া আমাদিগকে বিদায় দিলেন। পথিমধ্যে বন্ধুটিকে বলিলাম, তুমি এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলে, এমন কাজ আর কখনও করিওনা। বন্ধুটির মাত্র দশ টাকা জরিমানা হইয়াছিল এবং নোটিশবোর্ডে তাহার নাম টাঙানো হয় নাই। বহুদিনের কথা। স্মৃতির আঁধার কুঠুরি হইতে সব কথা টানিয়া বাহির করা আজ কঠিন। তথাপি যতটুকু সম্ভব লিখিয়া অধ্যক্ষ কামাখ্যাবাবুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।

হেরম্বচন্দ্র মৈত্র

কলিকাতা হইতে বহুদূরে একটি পল্লীর উচ্চ ইংরেজী স্কুলে একনাগাড়ে আটবৎসর পড়িয়াছি। পল্লীটি ছিল আধুনিক মানদণ্ডে অনগ্রসর। 'অনগ্রসর' বলিয়া স্কুল-প্রতিষ্ঠাতার নির্দেশে কর্তৃপক্ষীয়েরা ভাল ভাল শিক্ষক নিযুক্ত করিতে চেষ্টা পাইতেন। স্কুলের হেডমাষ্টার বা প্রধান শিক্ষক সমেত প্রথম দিকের গ্রাজুয়েট ও আণ্ডার-গ্রাজুয়েট শিক্ষকগণ প্রায় সকলেই ছিলেন বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ এবং কলিকাতা সিটি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। তাঁহাদের মুখে যেমন ব্রজমোহন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অশ্বিনীকুমার দত্ত, ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং ব্রজমোহন কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ রজনীকান্ত গুহের কথা শুনিতাম, তেমনি কলিকাতায় সিটি কলেজের অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের কথাও কখন কখন শুনিয়াছি। আমাদের বিদ্যালয়ে বেশ একটি নৈতিক পরিবেশও গড়িয়া উঠিয়াছিল। পরবর্তী কালে শিক্ষাবিষয়ক আলোচনাকালে বুঝিয়াছি, এ দেশে আধুনিক শিক্ষা প্রসারে ও জাতীয় চরিত্র গঠনে এক একটি কলেজ কি কার্যই না করিয়া ছিল! ইহাদের এতাদৃশ মহৎ কার্যের কথা আজিকার দিনে আমাদের যেন স্মরণেই আসে না।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান কলেজ (অধুনা 'বিদ্যাসাগর কলেজ') এদেশীয়দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রথম সার্থক কালেজী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার আট নয় বৎসরের মধ্যে সিটি কলেজের আবির্ভাব। ১৮৮০ হইতে বর্তমান ১৯৫৯, এই উনআশী বৎসরের মধ্যে এখানে কত জ্ঞানী গুণী সদ্‌বিদ্বান শিক্ষাব্রতীর সম্মেলন হইয়াছিল, আবার এই দীর্ঘ-কালের মধ্যে এখান হইতে কত জ্ঞানী গুণী সদ্‌বিদ্বান ব্যক্তি কলেজ-জীবনে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাহার পরিসংখ্যান করিবার কোন উদ্যোগ হয় নাই। সিটি কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত; অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, অধ্যাপক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সম্বন্ধে একটি ছড়াও রচিত হইয়াছিল।

এই সকল শিক্ষাব্রতী দ্বারা কলেজের একটি সরস ঐতিহ্য গড়িয়া উঠে। কলিকাতার কয়েকটি সরকারী ও বেসরকারী বিদেশী প্রতিষ্ঠিত কলেজে শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। দিশী কলেজের কোনটিরই শতবর্ষ পূর্ণ না হওয়ায় এরূপ স্মারকগ্রন্থ প্রণয়নের তাগিদ হয়ত' এখনও আসে নাই। তবে পুরাতনকে আমরা যেমন অতি দ্রুত বর্জন করিতে চলিয়াছি, আশঙ্কা হয়, দেশী প্রতিষ্ঠানগুলির পুরাতন নথিপত্র হয়ত বিশ-পঁচিশ বৎসর পরে আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। শতাব্দী পূর্তির অপেক্ষা না রাখিয়া এখনই প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে তৎপর হইলে বিশেষ ভাল হয়।

সিটি কলেজ সম্বন্ধে তো একথা আরও প্রযোজ্য। বাংলা দেশের পল্লী অঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারকল্পে এই কলেজটির অবদান অতীব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। এই কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক পদে যাঁহারা ব্রতী ছিলেন তাঁহাদের ত্যাগপূত জীবন জাতিকে ধন্য করিয়াছে। কলেজের একজন প্রধান অধ্যাপকের মুখে শুনিয়াছি, স্বদেশী আন্দোলনের মরশুমে ছাত্র সংখ্যা অতি-মাত্রায় হ্রাস পাইলে কোন কোন মাসে বেতন বাবদে দশ পনর টাকা লইয়াই তাহাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইত! আজকাল হয়ত একথা কল্পনাও করা যায় না। হেরম্বচন্দ্র নিজে প্রায় ত্রিশ বৎসর সিটি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। কলেজের আদর্শ—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম"। নানা বিপদ আপদের মধ্যেও অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র এই আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কলেজের যাবতীয় কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল একই কার্যে—আর একই ধরনের কার্যে—নিযুক্ত থাকায় তাঁহার নামেও যে বহু প্রবাদ, জনশ্রুতি, কল্পিত ও প্রকৃত কাহিনীর সৃষ্টি হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? আমি দুই বৎসর মাত্র তাঁহাকে অতি নিকট হইতে দেখিয়াছি, তাঁহার কথাবার্তা, পঠন-পাঠনা শুনিয়াছি ও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। নিজ অভিজ্ঞতা হইতেই এখানে যৎকিঞ্চিৎ বলিতে পারিব।

কি জানি কেন, বাগেরহাট কলেজে অধ্যয়ন-কালেই ধারণা জন্মে যে, কালেজী শিক্ষা আয়ত্ত করিতে হইলে বিদ্যাকেন্দ্র কলিকাতায় যাওয়াই ভাল। আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় আসিতে যত্নবান হই। পিতৃবন্ধু বর্ষীয়ান্ অধ্যাপক পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের সহায়তায় সিটি কলেজে আসিয়া ভর্তি হইলাম। ১৯২৪-২৬, এই দুই বৎসর সিটি কলেজে পড়ি। ভর্তি

হইবার তুই মাসের মধ্যেই কলেজের স্থপারিনটেণ্ডেণ্ট অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া যান। তাঁহার কথা কৈশোরে দেশনেতা অশ্বিনীকুমার দত্তের মুখে কিছু কিছু শুনিয়াছিলাম। বিদায়-অভিনন্দন সভায় আমি ছোট একটি লেখা পাঠ করি। যতদূর স্মরণ হয়, অশ্বিনীকুমারের সংস্পর্শে থাকাকালীন তাঁহার কৃতকর্মের কথা স্বদেশ-বাসীদের লিখিতভাবে পরিবেশন করিতে অনুরোধ জানাই। এই সভায় অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র সভাপতিত্ব করেন। ইতিপূর্বেই আমরা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছি। তাঁহাকে নিকট হইতে দেখিতেও তখন আরম্ভ করিয়াছি।

হেরম্ববাবু দীর্ঘাকৃতি, গৌরকান্তি, রাসভারী লোক, সর্বদা পড়াশুনা লইয়াই থাকেন। সাধারণ ক্লাসেও পড়া, নিজের ঘরেও পড়া। এ বিষয় পরে বলিতেছি। কলেজের প্রশাসনিক কার্য তখন উপাধ্যক্ষ কালীপ্রসন্ন চট্টরাজের উপর ন্যস্ত। কলেজের স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টও কতক কতক এ কাজ করিয়া থাকেন। সতীশবাবুর কলেজ-ত্যাগের পর স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইলেন পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। কালীপ্রসন্ন বাবু খর্বাকৃতি, স্বাস্থ্যবান্ এবং খুবই কর্মতৎপর। তিনি হাঁটিতেন না, যেন ছুটিয়া চলিতেন; চলার সময় কলেজের করিডর যেন কাঁপিয়া উঠিত। তিনি তখন কলেজের অংকশাস্ত্রের প্রধানাধ্যাপক, তাঁহার একখানি বীজগণিত ছিল, অনেকের মতে এখানি ছিল বিশেষ উন্নত ধরনের এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ। এখনও বইখানি চালু আছে কি না জানি না। আর একজন অধ্যাপকও আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। স্কুলে পাঠকালে তাঁহার অধ্যাপনার কথা অনেক শুনিয়াছিলাম। শিক্ষক মহাশয় বলিতেন, ব্রজমোহন কলেজের প্রায় সমুদয় বই এবং নানা শ্রেণীর বই তিনি পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। ব্রজমোহন কলেজে তিনি এক-ক্রমে দশ বৎসর অধ্যক্ষতা করেন। পরে ১৯১১-১২ সনে কলেজের নব-রূপায়নের সময় তাঁহাকে কলেজ ছাড়িয়া আসিতে হয়। তদবধি তিনি সিটি কলেজের অন্যতম ইংরেজী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই গুণী জ্ঞানী অধ্যাপকের নাম রজনীকান্ত গুহ। তাঁহার নিকট তুই বৎসর কাল পড়িয়াছি। মনে হইত, তিনি যেন জগত সংসার এড়াইয়া চলিতে চান; ছাত্রেরা ছিল তাঁহার নাগালের অনেকটা বাহিরে। ইহার কারণ তখন বুঝিতাম না। এমন বিদ্বান ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিতে পারিতেছি না বলিয়া তুঃখ হইত। পরবর্তী কালে তাঁহার আত্মজীবনী পাঠ করিয়া বুঝিলাম, জগত সংসারের উপরে বীতস্পৃহ,

ইংরেজীতে যাহাকে বলে 'Cynic', হইবার যথেষ্ট কারণ ঘটিয়াছিল তাঁহার জীবনে। আর একজন অধ্যাপকের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ হয়। আমরা বিজ্ঞানের ছাত্র নই, তথাপি পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ সেনকে এখানে দেখিলাম। তিনি ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ, ছাত্র-দরদী ; কলেজ-ভবনের পদার্থবিদ্যা-বিভাগকেই তিনি বাসস্থান করিয়া লইয়াছিলেন।

কলুটোলার বিখ্যাত সেন পরিবারে তাঁহার জন্ম, ইহার বেশী মূল পরিচয় আর কিছু জানিনা। এরূপ ছাত্র-দরদী বুদ্ধিমান্ শিক্ষাব্রতী সম্বন্ধে তাঁহার কোন ছাত্র যদি কিছু লেখেন তো বড়ই ভাল হয়। পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যা-ভূষণ ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক, সদাশয় এবং সদাশিব। অধ্যাপনা ও বিদ্যাচর্চা তাঁহার জীবনের বৃত্তি।

হেরম্ববাবু সম্বন্ধে বলিতে গিয়া' আরম্ভেই অন্যান্যদের প্রসঙ্গ খানিকটা আসিয়া পড়িয়াছে। এই সময়ে আমরা কোন কোন অধ্যাপকের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়াছিলাম। প্রসঙ্গত ইঁহাদের সম্বন্ধেও কিছু বলিতে হইল। সিটি কলেজে তখন কিরূপ সুধী ও সজ্জন-সমাবেশ ঘটিয়াছিল তাহার সামান্য আভাস আমরা পাইলাম। অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র সকলের শীর্ষে। সহকর্মী অধ্যাপকদের প্রতি তাঁহার সমপ্রাণতা অতিশয় প্রশংসিত। সিটি কলেজের ছাত্র-সংখ্যা তখন সরকারী-বেসরকারী সকল কলেজের চেয়েই বেশী। আমা-দের সময়ে বাইশ শতে উঠিয়াছিল। তখন বিদ্যাসাগর, বঙ্গবাসী বা রিপন কলেজে ছাত্র-সংখ্যা ইহার কয়েক শতই কম। আজিকার দিনে উহা হয়তো নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। শুনিয়াছি, দিনে রাত্রে তিন দফায় এক একটি কলেজে ছাত্র পড়ে সাত-আট হাজার! শিক্ষায়তন, না কারখানা—ঠাওর করিয়া উঠিতে পারি না। কিন্তু সত্যই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এই।

হেরম্বচন্দ্র সাধারণতঃ বি-এ ক্লাসে বাইবেল পড়াইতেন। ইণ্টারমিডিয়েটে মনে হয় ওল্ড টেষ্টামেণ্ট হইতে সংকলিত অংশ পড়ানো হইত। বি এতে পড়িতাম নিউ টেষ্টামেণ্টের অংশ বিশেষ। শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর হাওয়েলসের সম্পাদনায় বিশ্ববিদ্যালয় পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখানিতেও একটি বিস্তৃত ভূমিকা ছিল। বাইবেল সমগ্র খ্রীষ্টানগণের ধর্মগ্রন্থ। ইহার প্রচার যথেষ্ট। কলিকাতায় বাইবেল সোসাইটি প্রত্যেক বি-এ উপাধিধারী যুবককে এক-একখানি সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই বাইবেল উপহার দিতেন। আমাদের সময় ঐরূপ দানের ব্যবস্থা উঠিয়া গিয়াছিল। তবু

আমি একখানি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। হেরম্বচন্দ্র বলিতেন, আর কিছুর জন্য না হউক, ভাল ইংরেজী শিখিবার জন্যও প্রত্যেক ছাত্রের এখানি বার বার পড়া আবশ্যক। বাস্তবিক এমন সহজ সরল ইংরেজী, বুঝিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইত না। তবে মাঝে মাঝে archaic বা অপ্রচলিত শব্দ বা বাক্যাংশ (idiom) অবশ্য আছে, তাহার টীকা বা ব্যাখ্যা নবীন পাঠকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন।

হেরম্ববাবুর অধ্যাপনা-রীতি ছিল অন্যান্য হইতে স্বতন্ত্র! তিনি অধ্যাপনা-কালে এক একটি শব্দ বা বাক্যাংশ বুঝাইবার জন্য এক এক করিয়া বহু ডিক্‌শনারি বা রেফারেন্স বই আনাইতেন, এক পিরিয়ডের মধ্যে টেবিলের উপরিভাগ ভর্তি হইয়া যাইত। তিনি এক-একটি বাক্য বা শব্দ খানিকটা বুঝাইয়া দেন, অভিধান বা অন্য বই দেখেন, আবার বুঝাইতে থাকেন। আমাদের যেদিনই ক্লাস হইত, এইরূপভাবে পড়াইতেন। পড়াইবার সময় বার বার অন্য বই দেখায় তাঁহার পড়ানো সাধারণ ছাত্রের নিকট তেমন হৃদয়গ্রাহী হইত না, কিন্তু তাঁহার এবম্বিধ শিক্ষাদান রীতি এবং ছাত্রদের বুঝাইবার স্পৃহা দেখিয়া আমরা সকলেই অবাক্ হইয়া যাইতাম। হেরম্বচন্দ্রের নিজস্ব বেয়ারা ছিল সম্পদ। সম্পদ বৃদ্ধ, হেরম্ববাবুর চেয়ে বয়স কম ছিল বলিয়া মনে হইত না। এই এক পিরিয়ডের মধ্যে লাইব্রেরী হইতে অনবরত বই আনিতে ও ফিরাইয়া দিতে তাহার বেশ পরিশ্রম হইত। অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করিতে হইলে আমাদের শরণ লইতে হইত সম্পদের। তাহার হাতে চিরকুট দিবার পর অনুমতি আসিলে তবে আমরা হেরম্ববাবুর সঙ্গে দেখা করিতে পারিতাম। সম্পদ আমাদের বড় প্রিয় ছিল। মুখে 'রা' শব্দটি নাই অধ্যক্ষ মহাশয়ের মতই গম্ভীর, তবে তাহাকে কখন কখন হাসিতেও দেখিয়াছি।

'হাসি' প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিয়া লই। অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র ছিলেন অতিমাত্রায় গম্ভীর প্রকৃতির। আমরা তাঁহার ক্লাসে 'টু' শব্দ করিতে ভরসা পাইতাম না। তবে তিনি পড়াইতে পড়াইতে কখন কখন অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন এবং প্রাণ খুলিয়া হাসিতেন। সে আজকালকার মত মাপা বা চাপা হাসি নয়, উচ্চ হাসি, মনে হইত তিনি আনন্দে আটখানা হইয়া পড়িয়াছেন। গৌরকান্তি মুখমণ্ডল রক্তিম হইয়া উঠিত। আর আমরা ছেলেরা হয়ত মাসের মধ্যে বা দুই মাসের মধ্যে এরূপ একটি দিন মাত্র

পাইয়াছি। কতকাল হাবাগোবার মত চুপ করিয়া থাকিতাম। সুযোগ পাইয়া আমরাও হাসিতাম। সব সময় যে সকলে বুঝিয়া হাসিত তাহা নয়। হেরম্ববাবুর হাসি দেখিয়াও আমরা অনেক হাসিতাম। সে কি উদ্দাম হাসি! সমস্ত কলেজ-ভবন যেন কাঁপিয়া উঠিত। অমন রাসভারী হেরম্ববাবু যে এমন হাসিতে পারেন, বাহিরের লোক কখনও তাহা বুঝিতে পারিতেন না। দেখিতাম, দ্বারপ্রান্তে বসিয়া সম্পদও মুচকি হাসি হাসিতেছে।

একটি দিনের কথা এখানে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করি। হেরম্বচন্দ্রের নীতিশিক্ষা বা নীতিপরায়ণতা সম্বন্ধে না তখন কত কাহিনী লোকের মুখে মুখে ঘুরিতেছিল। কতকগুলি নিছক সত্য, আবার কতকগুলি নিতান্তই অবাস্তব। 'জানি, কিন্তু বল্‌ব না'—কথাটি কলেজে পা দিয়াই কর্ণগোচর হইয়াছিল, কিন্তু অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্রের মুখে যে এ কথাগুলি এমন ভাবে শুনিব তাহা পূর্বে কল্পনাও করি নাই। দীর্ঘকাল পরে এখন মনে হইতেছে, তিনি কতজনেরই নিকট না এই বিষয়টি বলিয়াছিলেন তাই এ কথাটি এত চালু হইয়াছিল। হেরম্ববাবু একদিন আমাদের বাইবেল পড়াইতেছেন। একটি স্থলে সত্যপ্রিয়তা বা সত্যবাদিতার কথা বর্ণিত হইয়াছে। তিনি নিজস্ব কাহিনীটি দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিলেন। উল্লেখ করিতে গিয়া তিনি কতই উৎফুল্ল, তাঁহার কতই না আনন্দ। তিনি প্রাণ খুলিয়া হাসিলেন, আমাদের মধ্যেও হাসির উচ্চ রোল। কাহিনীটি কি? হেরম্ববাবু বলিয়া চলিলেন, "আমি একদিন কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে, এমন সময় একজন লোক হন্তদন্ত হয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মশাই, ষ্টার থিয়েটার কোন্ দিকে?' আমি তখনই বললাম, 'জানি না।' তিনি খানিকটা দূরে গিয়েছেন। আমি তো জানি। এ যে মিছে কথা বলা হল। আমি তখন তাঁর পিছনে ছুটেছি। তাঁর নাগাল পেয়ে হাঁক্‌লাম, 'মশাই, শুনুন, শুনুন।' তিনি এগিয়ে এলে বললাম, 'মশাই ষ্টার থিয়েটার কোথায় জানি, কিন্তু বলব না।' তিনি ইংরেজীতে এই সকল কথা বলিতেছিলেন, ক্লাসে ইংরেজী পড়াইবার সময় তাঁহাকে বাংলা বলিতে, বা বাংলা শব্দ উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই কাহিনী বলিতে বলিতে, একটু আগে যেমন বলিয়াছি, তাঁহার প্রাণের রুদ্ধ আবেগ একেবারে খুলিয়া গেল। মুখ আত্মপ্রসাদে, আনন্দের হাসিতে লাল হইয়া উঠিল। আমরা কি হাসাই না সেদিন হাসিয়াছিলাম। ঐরূপ প্রাণখোলা হাসি কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

হেরম্ববাবুর শিক্ষাদান-রীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ক্লাসে ঐ একই রূপ দেখিয়াছি। তখনই যে আমরা এই পদ্ধতি দেখিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছি মনে হয় না। তবে তাঁহার এই অনুসন্ধিৎসা, জ্ঞানার্জন, জ্ঞানদান-স্পৃহা, শব্দ-বিদ্যা শিক্ষণ-তৎপরতা পরবর্তীকালে অনেক যুবকেরই দিগ্‌দর্শন স্বরূপ হইয়াছিল। শব্দ বা বাক্যাংশের (idiom) সুষ্ঠু প্রয়োগ জানিতে ও করিতে হইলে ইহার মূলে যাইতে হইবে। এক একটি বৃক্ষের যেমন ক্রম-বিকাশ, এক একটি শব্দেরও সেইরূপ ক্রমবিকাশ। ইহা জানা থাকিলে তাহার উপরে পূর্ণ দখল জন্মিবে, এবং প্রয়োগও বাধাহীন হইবে। নিজের জীবনে ইহার যথার্থ পরীক্ষা করিয়াছি। অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্রের পাঠনা-রীতি আর একজনের মধ্যে দেখিয়াছি। তবে তাঁহার ক্ষেত্র ছিল সংকীর্ণ। তথাপি ধরনটা একই। তখন চতুর্থ শ্রেণীতে (Class IV) পড়ি, অক্ষয়বাবু (দুঃখের বিষয় পুরা নামটি মনে নাই) আমাদের ইংরেজী পড়াইতেন। তাঁহার একখানি নিজস্ব চেম্বার্স ডিক্সনারি ছিল। এখানি ছিল তাঁহার সব সময়ের সঙ্গী। তিনি এই অভিধানখানি লইয়া আমাদের ক্লাসে আসিতেন। চতুর্থ শ্রেণীর কতটুকুই বা ইংরেজী, কিন্তু তিনি যখনই ঠেকিতেন, ডিকসনারি দেখিতেন। অবসর সময়েই তিনি ডিকসনারির শব্দগুলি পড়িতেন। একটি কথা রটিয়াছিল, তিনি নাকি অর্দ্ধেক ডিক্‌সনারি এইরূপে মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। আজ হেরম্বচন্দ্র প্রসঙ্গে তাঁহাকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

হেরম্বচন্দ্রের ইংরেজী-বাংলা বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। সিটি কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস ৬ই জানুয়ারি। এই দিনটিতে সকালের দিকে কলেজের কমন-রুমে একটি বিশেষ সভা হইত, এখনও বোধহয় এই দিনটি বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়। যে দুই বৎসর কলেজে পড়ি, সেই দুই বৎসরেই অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। কলেজের মটো বা আদর্শ—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"। হেরম্ববাবু প্রতিটি বক্তৃতায়ই এই আদর্শের চমৎকার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন; অবশ্য ইংরেজিতে। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজেও তাঁহার ইংরেজী ও বাংলা বক্তৃতা শুনিয়াছি। তিনি বক্তা ছিলেন না, তবে সরল ভাষায় তিনি নিজ বক্তব্য বেশ বুঝাইয়া দিতেন।

কলেজে একটি ইকনমিক সোসাইটি ছিল। ইহার প্রতিষ্ঠাতা—অর্থনীতির অধ্যাপক প্রমথনাথ সরকার। তিনি আমাদের বাংলা ক্লাসও লইতেন। সে সময়ে বাংলা পাঠ্যপুস্তক কিছুই ছিল না। সপ্তাহে একদিন মাত্র বাংলা

ক্লাস হইত। প্রমথবাবু রচনা শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিতেন। তিনি চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে আমাদের কিছুদিন ইতিহাসও পড়াইয়াছিলেন। বক্তৃতা শক্তি বা বুঝাইবার ক্ষমতা অধ্যাপকের একটি গুণ। এই বিষয়টির অভাবহেতু সুপণ্ডিত হইয়াও বড় বড় কলেজের অধ্যাপক পদে বেশী দিন স্থিত থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তবে অধ্যাপকের একটি প্রধানতম গুণ সে গুণের তিনি সম্পূর্ণ অধিকারী ছিলেন। তিনি ছাত্রদের মনে জ্ঞানার্জনস্পৃহা উদ্রেক করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, তিনি ছিলেন সত্যসত্যই ছাত্র দরদী, ছাত্রবন্ধু; তিনি গুণের আদর করিতেন। যাঁহার মধ্যে অত্যল্প প্রযত্নেরও আভাসমাত্র পাইতেন তিনি তাঁহার স্নেহ-প্রীতির অধিকারী হইতেন। প্রথম জীবনে তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত অযাচিত অথচ আন্তরিক উৎসাহ আমার দুরূহ গবেষণা-পথের পাথেয় স্বরূপ হইয়াছিল। অর্থনীতি আমার পঠিতব্য বিষয় ছিল না। কিন্তু প্রমথনাথ আমাকে ইকনমিক সোসাইটির সভ্য করিয়া লইলেন। দুই বৎসরে সভার বেশ কয়েকটি অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনে অন্য কলেজের ছেলেরাও আসিতেন। একজনের কথা পরিষ্কার মনে পড়ে। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র ছিলেন, নাম—অরুণকুমার সেন; অরুণকুমার বর্তমানে সিটি কলেজের বাণিজ্য-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ।

ইকনমিক সোসাইটির দুইটি অধিবেশনের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। একটি—সেটি বার্ষিক অধিবেশন কিনা মনে নাই—বেশ আড়ম্বরে হইয়াছিল। এদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় পৌরোহিত্য করেন। আমাদের কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন (অধুনা ডক্টর) এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই অধিবেশনে আমাকে কিছু বলিতে হয়। আমি ইতিহাসের ছাত্র, অর্থনীতির কি বুঝি? তবে সামাজিক ব্যবস্থাদির সঙ্গে অর্থনীতির যে ঘনিষ্ঠ যোগ, সোসাইটির কর্ণধার তাহা বেশ বুঝিতেন। আমার বক্তৃতার বিষয় ছিল—প্রাথমিক শিক্ষা। মাদ্রাজ হইতে জি. এ. নটেশন সংকলিত *Gokhale's Speeches* একখণ্ড আমার ছিল। এখানির প্রায় সব অংশ (নীরস বাজেট-বক্তৃতাগুলি ছাড়া) খুব ভাল করিয়া পড়িয়াছি। তাঁহার প্রাইমারি এডুকেশন বিল সম্পর্কীয় বক্তৃতাগুলিও আমি বহুবার

পড়ি। তৎপ্রদত্ত যুক্তি-প্রমাণাদি আমার বিশেষ কাজে লাগিয়াছিল। অধিবেশনশেষে বিনয়বাবু বলিয়াছিলেন, 'facts-এর উপর আপনার তো খুব mastery আছে!' আর একটি অধিবেশনে অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র সভাপতি ছিলেন। সভাপতি রাশভারি লোক, সভায় বেশ একটা শান্ত গম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হইল। এইদিন কিছু বলিয়াছিলাম কিনা মনে নাই। হেরম্ববাবু একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার বক্তৃতার মূল বিষয় ছিল—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।" উপনিষদের এই বাণীর মর্ম সেদিন ভাল করিয়া বুঝি নাই; তাঁহার এবম্বিধ ব্যাখ্যা অর্থনীতির সভায় সেদিন কেমন যেন বেসুরো ঠেকিয়াছিল। দীর্ঘকাল পরে বুঝিতেছি, শুধু অর্থনীতির সভায় কেন সব সভায়েই এই বাণীর মর্ম উদাত্তকণ্ঠে উৎসারিত হওয়া উচিত। ইকনমিক সোসাইটির অধিবেশনগুলিতে অধ্যাপক প্রমথনাথের সবিশেষ প্রযত্নের পরিচয় পাইতাম।

এই দুই বৎসর অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্রকে অধ্যাপক কক্ষে ও কমন-রুমে সাধারণ ক্লাসে ও নিজ প্রকোষ্ঠে নিকটে ও দূর হইতে কতভাবে দেখিয়াছি। কলেজ-সংক্রান্ত সাধারণ বিষয়গুলির ভার উপাধ্যক্ষ চট্টরাজ মহাশয়ের উপর ছিল, কাজেই তিনি বিদ্যানুশীলন ও অধ্যয়নের প্রচুর সময় পাইতেন। একদিন কি ব্যাপারে তাঁহার ঘরে গিয়াছি, দেখি তিনি 'হিবার্ট জর্ণাল' পড়িতেছেন। সাধারণ ছাত্রদের নিকট তিনি অগম্য ছিলেন, কিন্তু যখনই কেহ কোন বিপদে পড়িয়া তাঁহার শরণ লইত তখনই তিনি তাঁহার বিপদ মোচন করিতে যত্ন লইতেন। তাঁহার বহিরাবরণ ছিল বর্মযুক্ত, কিন্তু অগাধ ছিল স্নেহ, প্রাণ ছিল অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত। বাগেরহাট কলেজে অধ্যক্ষ কামাখ্যা-চরণকে দেখিয়াছি, সিটি কলেজে হেরম্বচন্দ্রকে দেখিলাম। উভয়ের সংস্পর্শে আসিয়া জীবন ধন্য হইয়াছে। দুইজনই ছিলেন নীতিপরায়ণ, ঈশ্বরবিশ্বাসী। কিন্তু হেরম্বচন্দ্রের নীতিনিষ্ঠতা সমকালীন ভাবধারার সঙ্গে মোটেই খাপ খাইত না। তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের অভ্যন্তরে কি ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে অতিশয় 'পিউরিটান' বলিয়া পরিচিত ছিলেন, স্ব সমাজের যুবকগণের সঙ্গে কখনও কখনও তাঁহার এবং তাঁহার অনুবর্তী বর্ষীয়ান ব্যক্তিদের ভয়ানক সংঘাত উপস্থিত হইত। সময়ে সময়ে হয়ত তাঁহাকে হার মানিতে হইত, তথাপি তিনি স্বাধীন সত্তা বিসর্জন দেন নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অধ্যক্ষ হেরম্ববাবু ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

শুধু অধ্যাপক রূপে নয়, একজন কর্মকর্তা রূপেও। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য ছিলেন বহু বৎসর। পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বা স্নাতকোত্তর শিক্ষা-বিভাগ গঠন কালে তিনি ছিলেন সার্ আশুতোষের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ। প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য বিবিধ বিদ্যার আলোচনা-গবেষণার সূচনা হয় এই বিভাগ প্রতিষ্ঠা হইতে। হেরম্বচন্দ্রের একাজের সমর্থনের মূলে ছিল তাঁহার স্বদেশীয় ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতির প্রতি আন্তরিক অনুরাগ। তিনি ইউরোপীয় সাহিত্যে সুপণ্ডিত; ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁহার প্রিয় কবি। মার্কিন মনীষী এমার্সনের তিনি একান্ত ভক্ত। কিন্তু স্বদেশীয় বিদ্যাভাণ্ডারের পুনরুদ্ধারকল্পে আশুতোষের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় যেরূপ যত্নপর হয় তাহাতে হেরম্বচন্দ্রের অকুণ্ঠ সমর্থন তাঁহার ঐ স্বদেশের প্রতি প্রীতি সূচিত করে। স্বদেশী যুগে শিক্ষা-সংস্কারের আয়োজন হয় প্রচুর। ঐ উপলক্ষে গঠিত সভা-সমিতিতে অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র জড়িত ছিলেন। উচ্চতর কালেজী শিক্ষার সংস্কার-সাধন সম্বন্ধে তিনি বিশেষ চিন্তা করিতেন। পূর্ব যুগের মডার্ণ রিভিয়ুতে শিক্ষা-সংস্কারমূলক তাঁহার প্রবন্ধাদি দেখিয়াছি। 'মডার্ণ রিভিয়ু'কে তিনি প্রীতির চক্ষে দেখিতেন একটি বিশেষ কারণে। সম্পাদক রামানন্দবাবু একদিন আমাদের বলিয়াছিলেন, "আমি হেরম্ববাবুর ছাত্র, আবার রজনী গুহ আমার ছাত্র; আমাদের উভয়ের বয়সের ব্যবধান বেশী নয়।" রামানন্দবাবু খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে হেরম্বচন্দ্রের নাম উচ্চারণ করিতেন।

স্যাডলার কমিশনের সম্মুখে হেরম্বচন্দ্র উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে নিজ মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আমি সিটি কলেজে পড়িবার সময়েই লাইব্রেরীতে স্যাডলার কমিশনের রিপোর্টের কোনও কোনও অংশ পাঠ করি। ইহাতে হেরম্ববাবুর অভিমত লিপিবদ্ধ দেখিয়াছি। সিটি কলেজকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। বিষম বিপদের মধ্যেও তিনি নিয়ত ইহার হাল ধরিয়াছিলেন। সরস্বতী পূজা সম্পর্কীয় আন্দোলনের সময়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছি—কত অপমান, গ্লানি, বিরোধিতার মধ্যেও তিনি অচল, অটল, দৃঢ়মূল মহীরুহের মত ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে দাঁড়াইয়া। সিটি কলেজে কি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে হেরম্বচন্দ্রের স্মরণ-মননের কি কোনও ব্যবস্থা হইয়াছে? অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র ইহজগতে নাই, কিন্তু তাঁহার পুণ্যস্মৃতি আমাদের জীবনযাত্রার পাথেয় হউক, এই প্রার্থনা।

———

জগদীশচন্দ্র বসু, অবলা বসু

এখন আমরা আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকে স্মরণ করি। আমরা তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাঁহার কথা শুনিয়াছি, কিন্তু যাঁহারা তাঁহার কথা শুনেন নাই, বা তাঁহাকে দেখেন নাই, তাঁহাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা? গত পঁচিশ বৎসর যাবৎ তাঁহার অনবদ্য রচনা 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীরা পড়িতেছেন; এই প্রসঙ্গে তাঁহার জীবনী অংশও হয়ত কিছু কিছু তাঁহাদের পড়িতে হয়। কিন্তু এই কি যথেষ্ট? অত বড় মনীষা কি শেষে পাঠ্য পুস্তকের অংশবিশেষ আলোচনার মধ্যেই নিঃশেষিত হইবে? আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের দুইখানি জীবনী-গ্রন্থ আছে। বাংলা জীবনী অতি সংক্ষিপ্ত, অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখিত। ইংরেজী গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক পেট্রিক গেডিস্। এই দুইখানি এখন দুষ্প্রাপ্য, আবার এ-দুইখানি এমনি ভাবে লিখিত যে, পুরা মানুষ-টিকে চেনা-জানা কঠিন। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র, শিল্পী জগদীশচন্দ্র, সাহিত্যিক জগদীশচন্দ্র, জেদী জগদীশচন্দ্র, শক্তিধর জগদীশচন্দ্র, স্বাদেশিক জগদীশচন্দ্র, আবার সংগঠক জগদীশচন্দ্রও তিনি বটেন। এসব কথা আমরা কোথায় জানিতে পারিব? দুঃখের বিষয়, জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর দীর্ঘ কুড়ি বৎসর প্রায় চলিয়া গেল, কিন্তু তাঁহার বড় আদরের বসু-বিজ্ঞান-মন্দির বা বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদ কেহই এ যাবৎ তাঁহার একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনী রচনা করিতে অগ্রসর হইলেন না। জগদীশচন্দ্র নিজ মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সগৌরবে তিনি মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের ঋণ শোধিতেছি কি? অবশ্য, সদ্য অনুষ্ঠিত জগদীশচন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে ইংরেজি বাংলা সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা তো নিতান্তই সাময়িক।

আমি এখানে জগদীশচন্দ্রের জীবনী লিখিতে বসি নাই। তাঁহার জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা মাত্র এখানে বলিব। জগদীশচন্দ্রের পিতা ভগবানচন্দ্র বসু ঢাকা কলেজের একজন কৃতী ছাত্র এবং পরবর্ত্তীকালের বিখ্যাত ডেপুটি রামশঙ্কর সেনের সতীর্থ। 'স্বদেশী'-নেত্রী স্বর্গীয়া মোহিনী দেবীর পিতা

ছিলেন এই রামশঙ্কর সেন। ভগবানচন্দ্র বসু বেথুন সাহেবের নিকট হইতে বিশেষ প্রেরণা পাইয়াছিলেন। নারীজাতির উন্নতির জন্য তিনি সবিশেষ অবহিত হইলেন। জগদীশচন্দ্র তাঁহার একমাত্র পুত্র। জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্ণপ্রভা বসু গৃহে বসিয়া অতি চমৎকার বাংলা শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। স্বদেশের নেতা, কংগ্রেস-সভাপতি প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসুর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। ভগবানচন্দ্রের অন্যান্য কন্যারাও বিশেষ ভাবে ইংরেজী বাংলা শিখিয়াছিলেন। শিক্ষাবিদ্ ও সাহিত্যিকরূপে তাঁহারা কেহ কেহ প্রসিদ্ধিলাভ করেন। ভগবানচন্দ্র একমাত্র পুত্র জগদীশচন্দ্রের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভগিনীপতি আনন্দমোহন বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় র‍্যাংলার। আনন্দমোহনের আদর্শ জগদীশচন্দ্রকে কৈশোরে কম অনুপ্রাণিত করে নাই।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম বিজ্ঞানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জগদীশচন্দ্র স্বদেশে ফিরিয়া আসেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন (৭ই জানুয়ারী, ১৮৮৫)। সে যুগে সরকারী অন্যান্য বিভাগের মত শিক্ষা-বিভাগেও বর্ণবৈষম্য বলবৎ ছিল। ইউরোপীয় ও ভারতবাসী গুণে এবং পদে সমস্থানীয় হইলেও তাঁহাদের বেতনে তারতম্য করা হইত; কালা আদমি বলিয়া ভারতবাসীদের কম বেতন দেওয়া হইত। জগদীশচন্দ্র ইহা সহ্য করিবেন কেন? তিনি একক্রমে তিন বৎসর বেতন লইলেন না। তিনি বিবাহিত; প্রসিদ্ধ ব্যবহার-জীব ব্রাহ্মনেতা দুর্গামোহন দাসের দ্বিতীয়া কন্যা অবলা দাসের সঙ্গে তিনি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ। ওদিকে পিতা ভগবানচন্দ্র স্বদেশীয় শিল্পে টাকা ঢালিয়া ঢের লোকসান দিতেছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে দেউলিয়া হইতে হয়। কিন্তু জগদীশচন্দ্র প্রতিজ্ঞায় অটল; কোন কিছুই তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাইতে পারিল না। সমপদস্থ ইংরেজের সমান তাঁহাকে বেতন দিতে হইবে, নহিলে বেতন গ্রহণ করিবেন না। শেষে সরকারকে নতি স্বীকার করিতে হইল। তাঁহারা সমপদস্থ শিক্ষাব্রতীদের, জাতিধর্মনির্বিশেষে, সমান বেতন দিবার সিদ্ধান্ত করিলেন।

একই সময় তিন বৎসরের বেতন পাইয়া জগদীশচন্দ্র পিতৃঋণ অনেকটা শোধ করেন। ভগবানচন্দ্র তখন চন্দননগরে বাস করিতেছিলেন। জগদীশচন্দ্রও চন্দননগরে বাসা ভাড়া করিয়া পিতার নিকটে বাস করিতে

আরম্ভ করেন। জগদীশচন্দ্র শুধু বিজ্ঞানী নন্, একজন নিপুণ গৃহস্থও বটে। লেডি অবলা বসু আমাকে বলিয়াছেন, "আমার সবে তখন বিবাহ হইয়াছে, ঘর-সংসারের কি বুঝি। আচার্য্যবসু মাসকাবারের জিনিসপত্র কিনিয়া—ধনে', সরিষা, জিরা, লঙ্কা হলুদ, প্রভৃতি এক একটি কৌটায় লেবেল আঁটিয়া রাখিতেন, যাহাতে আমার ভুল না হয়। তখন অর্থকৃচ্ছ্র তাও চলিতেছিল, স্বামীর নিপুণ গৃহস্থালীতে অতি অল্প খরচে আমাদের সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে হইত। আমরা প্রায় প্রতিদিন ছ্যাকরা গাড়ী করিয়া শ্বশুর মহাশয়কে দেখিতে যাইতাম।"

জগদীশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণপ্রভা বসু একাধারে আদর্শ গৃহিণী এবং সুদক্ষ সমাজকল্যাণকর্ম্মী ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে (১৮৭৮), স্বর্ণপ্রভা একটি নারী-সমাজ স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন এই সমাজের সম্পাদিকা। নারীদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন, সাধারণ শিক্ষায় উৎকর্ষসাধন, রোগী ও আর্ত্তজনের সেবা প্রভৃতি এই সমাজের করণীয় ছিল। মধ্যে মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়েও বক্তৃতা হইত। সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী ফাদার লাফোঁ এবং অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু যন্ত্রপাতির সাহায্যে তৎকালীন নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়া দেখাইয়া সমাজের সভ্যাদের যুগপৎ আনন্দ ও জ্ঞান বর্দ্ধন করিতেন। উমেশচন্দ্র দত্ত, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এ সমাজের কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেন। জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণপ্রভার একটি বিশেষ অনুরোধে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানের গবেষণা এক ভিন্ন পথে পরিচালিত হয়। একটু পরে তাহা বলিতেছি।

জগদীশচন্দ্র পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। কলেজের অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে গবেষণার কার্য্যেও তিনি রত হন। তখন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপনা প্রেসিডেন্সী কলেজের পুরনো বাড়ীতে হইত। এই ভবনের পিছনে ভবানী চরণ দত্ত লেনের কাছ-বরাবর পদার্থবিদ্যার অধ্যাপনা-স্থল ও জগদীশচন্দ্রের গবেষণা-কেন্দ্র ছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি এই স্থল দেখিয়া আসিয়াছি। তখনও ইহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। জানি না ইদানীংকালের পুরাতনের প্রতি অত্যুগ্র অ-প্রীতি উহার উপরও পড়িয়াছে কি না। জগদীশ চন্দ্রের 'বেতার'বিষয়ক গবেষণা-কার্য্য এই অংশেই পরিচালিত হইত। কোনও বইয়ে পড়িয়াছি, কি কাহার মুখে শুনিয়াছি স্মরণ হইতেছে না,

এক ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন, জগদীশচন্দ্র মাঝে মাঝে প্রখ্যাত ব্যক্তিদের আনাইয়া এই গবেষণার ফলাফল যন্ত্র সহযোগে দেখাইতেন। তিনি অকস্মাৎ এইরূপ একদিন উপস্থিত থাকিয়া বেতারে সংবাদ আদান-প্রদান প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। জগদীশচন্দ্র তখন এক প্রকোষ্ঠ হইতে অন্য প্রকোষ্ঠে বেতারে সংবাদ পৌঁছাইয়া দিতেছিলেন। জগদীশচন্দ্র বেতারের মূল সূত্রটি বাহির করিলেও, ইহা লইয়া বেশীদূর অগ্রসর হন নাই।

ইহার কারণও ছিল। তিনি জ্যেষ্ঠা স্বর্ণপ্রভাকে সাতিশয় ভক্তি করিতেন। দমদমে আনন্দমোহন বসুর একটি বাগানবাড়ী ছিল। তিনি সপরিবারে মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়া থাকিতেন, জগদীশচন্দ্রও তাঁহাদের অতিথি হইতেন। একদিন বৈকালে দিদি স্বর্ণপ্রভার সঙ্গে জগদীশচন্দ্র বাগানে বেড়াইতেছিলেন। এই সময়ে লজ্জাবতীলতা দেখাইয়া স্বর্ণপ্রভা জগদীশচন্দ্রকে বলিলেন, "ভাই ,তুমি তো এত গবেষণা কর, লজ্জাবতীলতা স্পর্শমাত্রেই সঙ্কুচিত হয় কেন, সূর্য্যোদয়ে ক্রমশঃ পাতা মেলিয়া সূর্য্যাস্তকালে আবার জুড়িয়া যায় কেন—ইহার মূল অনুসন্ধান করিতে পার কি ?" এই দিন হইতে জগদীশচন্দ্রের মন পদার্থবিদ্যা হইতে উদ্ভিদ্‌বিদ্যার দিকে আকৃষ্ট হইল। শুধু উদ্ভিদ্‌বিদ্যা নয়, ইহাকে কেন্দ্র করিয়া জীবতত্ত্ব, শরীরতত্ত্ব নানা দিকেই উত্তরোত্তর বিস্ময়কর গবেষণা পরিচালনে অগ্রসর হইলেন। তিনি ভারতীয় ছুতারমিস্ত্রী দিয়া অতিসূক্ষ্ম যন্ত্রাদি তৈরী করাইয়া লইলেন, গাছ-পালার প্রাণ আছে, জড়েরও জীবন রহিয়াছে—ভারতীয় শাস্ত্রে একথা সর্ব্বথা স্বীকৃত। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য জগত ইহা কখনও মানিয়া লয় নাই। জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা দেখাইলেন ভারতীয় শাস্ত্রের এই কথাগুলি কত সত্য। প্রথম প্রথম পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহার খুবই বিরোধিতা করিয়াছেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ইহা স্বীকার করিয়া লইতে তাঁহারা বাধ্য হন। প্রথম বিরোধিতা কাটাইয়া জগদীশচন্দ্র বিবিধ বুধমণ্ডলী দ্বারা ক্রমশঃ অভিনন্দিত হইতে লাগিলেন।

১৯০০ সাল। প্যারিসে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতেছে। এখানে জগতের বিভিন্ন দিক হইতে গুণী-মানীরা সমাগত। স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা সেখানে উপস্থিত। সহধর্ম্মিণীসহ জগদীশচন্দ্রও প্যারিসে গিয়া পৌঁছিয়াছেন। প্রদর্শনীর বৈজ্ঞানিক অংশে জগদীশচন্দ্র তাঁহার অভিনব যন্ত্র-সাহায্যে বিস্ময়কর গবেষণাসমূহ দেখাইয়া সুধীগণকে বিমোহিত করিয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ জগদীশচন্দ্রকে 'Indian Scientist' বা 'ভারতীয় বিজ্ঞানী' বলিয়া অভিনন্দিত করিলেন। ভগিনী নিবেদিতা এবং তাঁহার আত্মীয়-পরিবারের সঙ্গে বসু-দম্পতি কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই পরিচিত হইয়া বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হন। এবারে প্যারিসে অবস্থানকালে স্বামীজীর সঙ্গেও তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। এই সময়কার এক ঘটনা লেডী অবলা বসু আমাকে বলিয়াছিলেন। স্বামীজী একদিন তাঁহাকে গান করিতে বলেন, তিনিও গান করিলেন। পরে যখন জানিলেন, স্বামীজী নিজেই সুগায়ক তখন তিনি মরমে মরিয়া যান। ভুবনবিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের সম্মুখে বসু-জায়া গান করিয়াছিলেন একথা ভাবিয়া তিনি কতই-না নিজেকে লজ্জিত বোধ করিতেন।

লেডী বসু ছিলেন আদর্শ সহধর্ম্মিণী। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে তিনি বহু বার ইউরোপ ও আমেরিকা পরিক্রমা করেন। একবার বিলাতে অবস্থান কালে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের সেবাযত্নে তিনি নিরাময় হন। সেই সময় হইতে উভয় পরিবারের মধ্যে বন্ধুতা। ভগিনী নিবেদিতা কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করিলে বসু-দম্পতির সঙ্গে এই বন্ধুতা ঘনিষ্ঠতর হয়। স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর (৪ঠা জুলাই, ১৯০২) পর নানা কারণে নিবেদিতা রামকৃষ্ণ মিশনের সংস্রব ত্যাগ করেন। তিনি অতঃপর নিজেকে "Sister Nivedita of Ramkrishna-Vivekanand" বলিয়া পরিচয় দিতেন। ভারতবর্ষের সর্ব্ববিধ উন্নতি ছিল তাঁহার কাম্য। সাহিত্য, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম্মতত্ত্ব-প্রত্যেকটি বিষয়েই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ। ইংলণ্ডের ফ্যারাডে সোসাইটি, ফ্রান্স-জার্ম্মাণীর বিজ্ঞান-সভাগুলির মত ভারতবর্ষেও বিজ্ঞানের গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপিত হয় এই ছিল নিবেদিতার ঐকান্তিক বাসনা। এ উদ্দেশ্যে তিনি লেখনীও ধারণ করিয়াছিলেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রও বহু পূর্ব হইতেই এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন। বসু-দম্পতির সহিত ভগিনী নিবেদিতার ঘনিষ্ঠতা সুবিদিত। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বহুকাল পোষিত বাসনা এবং ভগিনী নিবেদিতার ভাবনাকে রূপদান করার নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইলেন। অবসর গ্রহণের পরই (৩০শে নবেম্বর, ১৯১৫) তিনি এ বিষয়ে কার্য্য সুরু করেন। বসু-বিজ্ঞান-মন্দির ("Bose Institute) ১৯১৭ সনে স্থাপিত হইল। বসু-বিজ্ঞান-মন্দির

ভারতীয় স্থাপত্যের আদর্শে নির্ম্মিত। ভিতরের হল-ঘর শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসু কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্রাবলী দ্বারা শোভিত। বসু-বিজ্ঞান-মন্দির বিজ্ঞানের একটি আদর্শ গবেষণা-কেন্দ্র। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে—পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রাণিতত্ত্ব, শারীরবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, প্রভৃতি বিষয় লইয়াও গবেষণা চলিতেছে এখানে। ব্যবহারিক বিজ্ঞানের গবেষণাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের সাক্ষাৎ সংস্রবে আসিয়াছিলাম অতি অল্পসময়ের জন্য। কিন্তু ইহার মধ্যেই তাঁহার ভিতরে একটা অপূর্ব্ব তেজ ও আত্মপ্রত্যয় লক্ষ্য করিয়াছি। কৈশোরে পদার্পণ করিতেই আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের নামের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। 'গাছের প্রাণ আছে'—এই সত্য তিনি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সহযোগে প্রমাণ করিয়াছেন, আমাদের নিকট তখন তাঁহার এই প্রসিদ্ধি। তিনি কত বড়, কত বিচিত্র—জানিতে ও বুঝিতে আগ্রহ জন্মে। প্রতি বৎসর ৩০শে নভেম্বর বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবসে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা হইত। এই বক্তৃতায় তিনি সম্বৎসরের গবেষণার ফল ব্যক্ত করিতেন। 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় তাঁহার গবেষণার ফলাফল সম্বলিত সচিত্র রচনা সাগ্রহে পাঠ করিয়াছি। কলিকাতায় বি-এ অধ্যয়নকালে 'কার্ড' বা প্রবেশপত্র জোগাড় করিলাম তাঁহার এই বাৎসরিক বক্তৃতা শ্রবণের জন্য। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে স্বচক্ষে দেখিলাম এবং আলোকচিত্র সাহায্যে তাঁহার বক্তৃতা শুনিলাম; স্বচক্ষে দেখিয়া আর বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইলাম, এইরূপ বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য কয়েকবারই আমার হইয়াছে। একটি বারের কথা এখানে বিশেষভাবে বলি।

আমরা ১৯২৬ সনে কলিকাতায় একটি Student Association বা ছাত্র-সভা গঠন করি। পরবর্ত্তী কালে যে-সব ছাত্র-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এটিকে তাহাদের অগ্রদূত বলা চলে। তবে এই সকল ছাত্র-সভা হইতে আমাদের ঐ সভার মূলগত বৈশিষ্ট্য ছিল। আমরা রাজনৈতিক আলোচনা বা কার্য্য উহা হইতে বাদ রাখিয়াছিলাম। ছাত্র-সংগঠন, রুগ্ন ছাত্রদের পরিচর্য্যা, দুঃস্থ ছাত্রগণকে পুস্তক ও অর্থ দিয়া সাহায্য, ছাত্রদের প্রতি কোন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক অযথা উৎপীড়ন হইলে তাহার প্রতিবিধান এই সমস্ত ছিল আমাদের ছাত্র-সভার উদ্দেশ্য। মাসিক চাঁদার দ্বারা এবং মাঝে মাঝে জলসা করিয়া অর্থ সংগ্রহ হইত। এই ছাত্র-সভার সহিত সংশ্লিষ্ট কেহ কেহ অধুনা খ্যাতিমান হইয়াছেন। ছাত্র-সভার সভাপতি বা সভানেত্রী ছিলেন বিখ্যাত ত্যাগ

ও সেবানিষ্ঠ দেশকর্ম্মী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়। সভ্যগণ বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে আচার্য্য বসুর বক্তৃতা শুনিবার জন্য সভা-কর্ত্তৃপক্ষকে ধরিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বসু-পরিবারের দুই পুরুষের বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উভয় পরিবারই ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। উপরন্তু বঙ্গ-বিদ্যালয়ে জ্যোতির্ম্ময়ীর পিতা সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় লেডী বসুকে কৈশোরে পড়াইয়াছিলেন। লেডী বসুর মুখে শুনিয়াছি, দ্বারকানাথ তাঁহাকে একবার নবগোপাল মিত্রের হিন্দু মেলায় লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহারই প্রেরণায়, বালিকা মাত্র হইলেও, তিনি সেখানে বিপুল জনতার সম্মুখে একটি কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, সভাপতির পত্র লইয়া ছাত্র-সভার অন্যতম কর্ম্মকর্ত্তারূপে আমি আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের নিকট উক্ত উদ্দেশ্যে যাই। প্রথম দিনই তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম কিনা ঠিক স্মরণ হইতেছে না। বোধ হয়, দ্বিতীয় দিনে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম। তিনি সানন্দে আমাকে গ্রহণ করিলেন। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের পশ্চিম দিকের হাতার মধ্যে দাঁড়াইয়া তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করিতে আরম্ভ করেন। ছাত্র-সভার সভ্যগণ তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে খুবই উৎসুক জানিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং অধ্যাপক নাগের সঙ্গে কথা বলিয়া দিন-তারিখের ব্যবস্থা করা যাইবে বলিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরো যে ক'টি কথা বলিলেন তাহার ধ্বনি যেন এখনও আমার কানে বাজিতেছে। তিনি বলেন, "তোমরা যুবক, ছাত্র; তোমরা ভাবো রাতা-রাতি তোমাদের স্বরাজ হইবে। তাহা হইবার নয়। সাধনা চাই। প্রত্যেক কাজেই লাগ-পর হইয়া থাকিতে হইবে। এই দেখ আমি আজ ত্রিশ বৎসর যাবৎ গবেষণাকার্য্যে রত আছি; আমি কত কাজ করিয়াছি এখন ভাবিলে নিজেই বিস্ময় মানি।" আচার্য্য জগদীশচন্দ্র যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহার মর্ম্মমাত্র এখানে বলিতে পারিলাম। "সাধনা চাই" কথাটি কতখানি সার্থক, দীর্ঘকাল পরে আজ তাহা বিশেষভাবে বুঝিতেছি। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে বক্তৃতা হইল। সভার সদস্যেরা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িলেন; জটিল বিষয় অত সরল ভাষায় বর্ণনা (অবশ্য ইংরেজি) ক্বচিৎ শুনিয়াছি। চিত্র সহযোগে নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি আমাদের জড় জীবনের অস্তিত্ব বুঝাইয়া দিলেন। লেডী অবলা বসুকেও এই দিন অতি নিকট হইতে দেখিলাম। তিনি মন্দিরে এত ছাত্র-সমাবেশ দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর সাহিত্য-প্রীতির কথা কে না জানেন? বিজ্ঞানের জটিল বিষয়-সমূহ তিনি রসসিক্ত করিয়া ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। "ভাগীরথার উৎস সন্ধানে" রচনাটির কথা গোড়াতেই বলিয়াছি। তাঁহার "অব্যক্ত" গ্রন্থখানি বাংলা সাহিত্যের ক্লাসিক। বিজ্ঞানের কথা এমন করিয়া বলার দক্ষতা আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মত তাঁহার রচনায়ও সুন্দররূপে প্রকট হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। প্রবাসীতে প্রকাশিত পত্রাবলীতে তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি। স্বদেশী-আন্দোলনকালে রবীন্দ্রনাথ যে সকল জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিতেন, জগদীশ-চন্দ্রের আপার সারকুলার রোডের ভবনে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে শুনাইতেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই ভবন হইতেই আনন্দমোহন বসুকে রোগীর চেয়ারে করিয়া ইহার বিপরীত দিকের মাঠে ফেডারেশন-হল প্রতিষ্ঠা সভায় লইয়া যাওয়া হয়। জাতির প্রতি আনন্দমোহন তাঁহার শেষ স্বাবলম্বনের বাণী এই সভায় ঘোষণা করিয়াছিলেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বহুদিন। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ তিনি কয়েক হাজার টাকা দানও করিয়া গিয়াছেন।

লেডী অবলা বসু স্বামী জগদীশচন্দ্রের সেবায় একান্তভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেন। দেশ-বিদেশে সর্ব্বত্র তিনি তাঁহার সঙ্গিনী ছিলেন। প্রাচীন কালের পতিব্রতা নারীর আদর্শ তাঁহাতে লক্ষ্য করিয়াছি। লেডী বসুকে ইতিপূর্ব্বে দূর ও নিকট হইতে দেখিয়াছি কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আলাপের সুযোগ হয় তাঁহার শেষ বয়সে। তাঁহার নারী-শিক্ষা-সমিতির কথা আজ বাংলা দেশে কে না জানেন? শত শত হিন্দু বালবিধবা এবং অনাথা নারীর সুশিক্ষা ও জীবিকা সংস্থানের উপায় করিয়া দিয়াছে এই নারী-শিক্ষা-সমিতি। সন-তারিখ ঠিক মনে নাই, তবে এই প্রতিষ্ঠানটির বয়স চল্লিশ বৎসরের কাছাকাছি হইবে। সেবাপরায়ণা মহিলা কৃষ্ণভামিনী দাসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডলও আর তেমন শক্তি রাখে নাই। দুঃস্থা নারীদের একটি আশ্রয়স্থলের একটি বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়ে। লেডী অবলা বসু এই প্রয়োজন মিটাইলেন। নারী-শিক্ষা-সমিতির দুইটি শাখা—(১) বাণীভবন ও (২) শিল্পভবন। প্রথমটিতে শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইলেও সাধারণ শিক্ষার উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হইত। গত যুদ্ধের সময় নারী-শিক্ষা সমিতি ঝাড়গ্রামে উঠিয়া যায়। এখনও বাণী-ভবন সেখানে

অবস্থিত আছে। বসুজায়ার অপূর্ব্ব কর্ম্মৈষণার নিদর্শন স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে নারী-শিক্ষা-সমিতির কলিকাতাস্থ নিজস্ব ভবন। এই গৃহে সমিতির ছাত্র-নিবাস এবং শিক্ষা ভবন অবস্থিত। ব্রাহ্ম বালিকা-শিক্ষালয়ের উন্নতির মূলেও লেডী বসুর মঙ্গল হস্ত লক্ষ্য করি। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি ইহার সম্পাদিকা ছিলেন। শুনিয়াছি অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি ইহার শেষ পুরস্কার-বিতরণী সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহার পরে তাঁহার অসুস্থতা যে বৃদ্ধি পাইল তাহাই শেষে মৃত্যুরূপে দেখা দেয়।

একটু আগে তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। ইতিপূর্বে বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় প্রসঙ্গে লেডি বসু বাল্যে বিশেষ একটি পরীক্ষায় কত নম্বর পাইয়াছিলেন, 'বামাবোধিনী পত্রিকা' হইতে তাহা উদ্ধার করিয়াছিলাম। তিনি 'প্রবাসী' পড়িতেন। প্রথম পরিচয়ে তাঁহাকে ঐ কথা বলিলে তিনি বিশেষ উৎফুল্ল হন, এবং তাঁহার শিক্ষকদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। এই সময়েই তিনি পূর্ব্বোক্ত হিন্দুমেলা এবং শিক্ষক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা বলিয়াছিলেন। তাঁর শ্বশুর ভগবানচন্দ্র বসুর জীবনকথা ইতিপূর্বে প্রবাসীতে লিখিয়াছিলাম। তাঁহার কথা উঠিতেই লেডী বসু চন্দননগরের কথা আমায় বলেন। আমি তখন ভগিনী নিবেদিতার সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছি, আরও কিছু তথ্য-সংগ্রহের আশায় লেডী বসুর নিকট যাই। বিলাতে ভগিনী নিবেদিতার সেবার কথা তিনি তখন আমাকে বলেন। ঐ সময় লেডী বসু খুবই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার জীবন-সংশয় উপস্থিত হয়। নিবেদিতা পরিবারের ঐকান্তিক সেবা-যত্নে তিনি জীবন ফিরিয়া পান।

আর একদিন লেডী বসুর নিকট গিয়াছি। সেদিনও নিবেদিতা-প্রসঙ্গ। লেডী বসু বলিতে লাগিলেন, সিষ্টার ভারতবর্ষের জন্য নিজেকে একেবারে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সেবা ও ত্যাগ কি ভুলিবার? নিবেদিতা স্কুলটি তাঁহার কর্ম্ম-কেন্দ্র, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি ছিল সর্ব্বতোমুখী, কিসে ভারতবাসী স্বস্থ হইতে পারে এই চিন্তা ছিল তাঁহার অবিরত। মনে হয় আর একদিন আমায় বলিয়াছিলেন "আমি নিবেদিতা পরিবারের নিকট কত ঋণী; বিলাতে যখন ছিলাম তখন তাঁহাদের সেবাশুশ্রূষায় আমি জীবন ফিরিয়া পাইয়াছিলাম। এবারে নিবেদিতা দার্জ্জিলিঙে আমাদের ভবনে ছিলেন। তাঁহার অসুখ তিনি জানিতেই দিতেন না। পরে যখন অসুখ ধরা পড়িয়া গেল তখন তাঁহাকে

কলিকাতায় ফিরাইয়া আনা আর সম্ভব হইল না। ডাঃ নীলরতন সরকার তখন দার্জ্জিলিঙে। তিনি চিকিৎসা করিলেন, আমি যথাসাধ্য তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিলাম। কিন্তু কিছুই করিতে পারিলাম না, সূর্য্যাস্তকালে তিনিও অস্তমিত হইলেন।"

লেডী বসু বলিলেন, নিবেদিতার সঙ্গে সারদামণি দেবীকে দেখিতে কতবার গিয়াছি। ক্রিষ্টিনাও থাকিতেন। সারদামণির পদপ্রান্তে গিয়া বসিতাম। তাঁহার কথা মনোযোগ দিয়া শুনিতাম। সারদামণি সত্যিই মাতা; তিনি আমাদের কত স্নেহ করিতেন, কত কথা বলিতেন; কথা কত মিষ্ট ছিল। শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া যাইতাম। তাঁহার মত মধুর-আলাপী অথচ মহীয়সী নারী—কৈ, এতদিনেও তো দুইটি দেখিতে পাইলাম না। তিনি সত্যিই ছিলেন আমাদের মা।"

লেডী বসু বড়ই ভক্তিমতী ছিলেন। শুধু সারদামণি নহে, ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কথা বলিতেও তিনি গদগদকণ্ঠ হইয়া উঠিতেন। লেডী বসু প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মনেতা ও ব্যবহারজীবী দুর্গামোহন দাসের কন্যা। দুর্গামোহন তখন বরিশালে ওকালতি করিতেন। লেডী বসুর জন্ম হয় বরিশালে। যতদূর মনে হয়, ১৮৬৬ সনের শেষ দিকে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের অনুবর্তীরা সদলবলে বরিশালে গিয়াছিলেন। ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও এই দলে ছিলেন। লেডী অবলা বসুর অন্নপ্রাশন উৎসব সেই সময় সম্পন্ন হয়। তিনি বলিলেন, "আমার জীবন ধন্য; আমি অতি শৈশবে সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কোলে বসিতে পারিয়াছিলাম, তিনি আমার মুখে প্রথম অন্ন দেন।" গুরুজনদের নিকট তিনি একথা শুনিয়াছিলেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের কথা বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ ভারাক্রান্ত ও চক্ষু সজল হইয়া উঠিত। তিনি একদিন আমায় বলেন, "অব্যক্ত" বইখানি আমার নিকট গীতা। আমি প্রত্যহ এই বইখানি পড়ি। ইহার মধ্যে যে কত উচ্চ ভাব নিহিত রহিয়াছে তাহা আর কি বলিব? তিনি কত বড় ছিলেন!" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি চুপ করিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে লেডী বসু ছিয়াশী বৎসর বয়সে গতায়ু হন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু যেমন আদর্শ পুরুষ, লেডী অবলা বসু তেমনি আদর্শ মহিলা। একের কথা বলিতে অন্যের কথা স্বভাবতই আসিয়া পড়ে, উভয়ে উভয়ের জীবনের পরিপূরক। নবযুগের নরনারী তাঁহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নূতন ভারত গঠন করুক এই প্রার্থনা।

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের কথা শুনি, যখন আমি সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি, সে অবশ্য বহু পূর্ব্বের কথা। অমৃত বাজার পত্রিকার একটি সাপ্তাহিক সংস্করণে অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের গুণপনার কথা প্রথম পাঠ করি। তখন প্রথম মহাসমর শেষ হইবার মুখে। অধুনা বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সার্ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের "Ghoses Law' লইয়া আলোচনা প্রসঙ্গে আচার্য্যদেবের কথা স্বতঃই উত্থাপিত হইয়াছিল। ডঃ নীলরতন ধর, ডঃ মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির মতই ডঃ ঘোষ আচার্য রায়ের একজন বিখ্যাত ছাত্র। ঐ আলোচনার ভিতরকার একটা বাক্য এখনও মনে আছে—"Chemistry is not of exotic origin"—রসায়নশাস্ত্র বিদেশাগত নয়, ইহা আমাদের ভারতবর্ষের নিজস্ব। "Exotic" কথাটির সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়।

ইহার পর আচার্য্য রায়ের কথা বহুবার বহু ক্ষেত্রে শুনিয়াছি। 'অন্নসমস্যা', 'বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার'—আর যতদূর মনে পড়ে জাতিভেদ বা সমাজ-সংস্কার সম্পর্কে অন্য একটি পুস্তিকাও পাঠ করিয়াছিলাম। শেষোক্ত পুস্তিকা ১৯১৭ সনে কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশন কালে অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত সমাজ সংস্কার সম্মেলনের সভাপতির বক্তৃতা। এই সকল পুস্তিকা পড়িয়া তখনই আমরা তাঁহার চিন্তারাজ্যের 'গোড়া' হইয়া পড়িয়াছি। শিক্ষাব্রতী প্রফুল্লচন্দ্র বাঙালী জাতির কল্যাণচিন্তায় কতখানি তৎপর, জাতীয় মূল সমস্যাগুলির সমাধানে তিনি কতখানি সচেষ্ট, ঐ সমুদয় আলোচনার মধ্যে তাহার সুন্দর আভাস পাইলাম।

তখন অসহযোগ আন্দোলনের মরশুম। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ না করিয়াও ষোল আনা স্বদেশী। আচার-আচরণে, পোষাক-পরিচ্ছদে চিন্তায় ও কর্ম্মে প্রথম হইতেই তিনি খাঁটি বাঙালী—সত্যিকার ভারতবাসী। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ বার্ত্তা যখন শহর ছাড়িয়া

পল্লীতে গিয়া পৌছিল, শ্রেণী ছাপাইয়া 'গণ'কে পর্যন্ত আকৃষ্ট করিল তখন প্রফুল্লচন্দ্রও স্থির থাকিতে পারিলেন না। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় বহুদিনের। প্রফুল্লচন্দ্র পুণ্যশ্লোক গোখ্‌লের অন্তরঙ্গ বন্ধু। আবার মহাত্মাজী গোখ্‌লেকে 'গুরু' বলিয়া মান্য করিতেন, গুরু শিষ্য উভয়েই ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্রের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের দুইটি ধারা বা দিক্‌—একটি ধ্বংসাত্মক, অপরটি রচনাত্মক। প্রফুল্লচন্দ্র রচনাত্মক ধারাকে পরিপূর্ণ রূপে সার্থক করিয়া তুলিতে অগ্রসর হন। বাংলা দেশে চরখার বাণী প্রচারের ভার লইলেন শিক্ষাব্রতী আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র। এতদিন প্রকোষ্ঠের প্রাচীরের মধ্যে তাঁহার ব্রত সীমাবদ্ধ ছিল. অতঃপর প্রাচীরের বাহিরে সমগ্র দেশের ভিতরে তাঁহার ব্রত পরিব্যাপ্ত হইল।

প্রফুল্লচন্দ্র উত্তরবঙ্গ প্লাবনে দুর্গতদের সাহায্যকল্পে অগ্রসর হইলেন। সাময়িক সাহায্যে দুর্গতির কতটা সমাধান হইবে? কুটীর-শিল্পের পুনরুদ্ধার করিতে পারিলে একটি স্থায়ী সমাধানের উপায় হয়। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত চরখাকেই কুটীরশিল্প হিসাবে গ্রহণ করিতে তিনি জনসাধারণকে নির্দেশ দিলেন। "চরখার ঘর্ ঘর্ পরশীর ঘর ঘর" দেখিতে চাহিলেন তিনি। অসহযোগের প্রথম আবেগ কাটিয়া গেলে রচনাত্মক বা গঠনমূলক কার্য্যের দিকে নেতৃবৃন্দের ঝোঁক পড়ে। প্রফুল্লচন্দ্র উত্তরবঙ্গে যার প্রচলনে কতকটা সুফল পাইয়াছেন তাহার প্রচারেই মন দিলেন। তিনি রাজনীতিক নহেন; কিন্তু ঐ রচনাত্মক কর্ম্মের দ্বারা কুটীরশিল্পের পুনরুজ্জীবন সম্ভব বুঝিয়া রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে এবং সভা-সমিতেতেও তিনি যোগ দিতে লাগিলেন।

খুলনা জেলার অন্তর্গত বাগেরহাটে কলেজ প্রতিষ্ঠায় প্রফুল্লচন্দ্র বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। স্থানীয় অধিবাসীদের চেষ্টা যত্নে এবং প্রফুল্লচন্দ্রের সহায়তায় একটি অনগ্রসর মহকুমা শহরে উক্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল। এই কলেজটি বর্ত্তমানে 'আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ' নামে আখ্যাত হইয়াছে। যাঁহার নাম এতবার শুনিয়াছি, কৈশোরে পদার্পণ করিয়াই যাঁহার চিন্তাধারার সঙ্গে কথঞ্চিৎ পরিচিত হইতে প্রয়াসী হইয়াছি এতদিনে সেই প্রফুল্লচন্দ্রের কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হইলাম, এবং ভর্ত্তি হইয়া যেন তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা লাভের যোগসূত্রের সন্ধান পাইলাম। তখন বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী সুপণ্ডিত ধার্ম্মিকপ্রবর কামাখ্যাচরণ নাগ বাগেরহাট কলেজের অধ্যক্ষ। তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া, আর তাঁহার অধ্যাপনাকালে সর্ব্বসময়েই

জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার উপর যেমন আমাদের শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল, সেইরূপ যিনি এমন শিক্ষাব্রতীর প্রকৃত সমজ্‌দার এবং কলেজ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী সেই প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি এ মস্তক শ্রদ্ধায় অবনত হইল। আড়াই মাইল দূর হইতে—মধ্যে একটি নদী পাড়ি দিয়া—কলেজে আসিয়া প্রত্যহ উপনীত হইতাম। কিন্তু কলেজ ভবনে পা দিলেই সকল ক্লান্তি শ্রান্তি দূর হইয়া যাইত। এমনই ছিল কলেজের শান্ত স্নিগ্ধ সংযত পরিবেশ।

১৯২৩ সন। এপ্রিল কি মে মাস ঠিক স্মরণ নাই। তবে তখন আমাদের কলেজের গ্রীষ্মের ছুটি হইয়া গিয়াছে। জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায়, এমন কি বড় বড় গঞ্জে বা রাষ্ট্রীয় গণ্ডগ্রামে সম্মেলন হইতে সুরু হইয়াছে। বাখরগঞ্জ জেলা সম্মেলন সেবারে হইল পিরোজপুর মহকুমা-শহরে। সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। সম্মেলনে লোক ভাঙিয়া পড়িল। একে অসহযোগের আহ্বান, তার উপরে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের উপস্থিতি; যেন মণিকাঞ্চন যোগ হইল। প্রফুল্লচন্দ্রের কথা তাঁর বইয়ের মধ্যে পাইয়াছি, পত্র-পত্রিকা মারফত তাঁর গুণগ্রাম খানিকটা জানিয়াছি, বাগেরহাট কলেজে অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া যেন তাঁহার নিকট-পরিচয় লাভ করিয়াছি, কিন্তু তাঁহাকে তখনও চাক্ষুষ দেখি নাই। প্রফুল্লচন্দ্র আমাদেরই 'দেশে' পদার্পণ করিয়াছেন, আর কি তাঁহাকে না দেখিয়া থাকা যায়!

পিরোজপুরে রওনা হইলাম। ভোর সকাল, সূর্য্য খানিকটা উঠিয়াছে। প্রফুল্লচন্দ্র বোটে রহিয়াছেন। নৌকাবাস প্রফুল্লচন্দ্রের বড় পছন্দ। শুনিয়াছি, গ্রীষ্মের ছুটির দুই মাস তিনি নিজগ্রাম রাড়ুলি-কাটিপাড়ায় গিয়া নৌকায় বাস করিতেন। প্রশস্ত নদী; ভাটায় নৌকা দক্ষিণে নামিত, জোয়ারে উত্তরে উঠিত। যুবকগণ পরিবৃত হইয়া তিনি নানা বিষয়ে আলোচনায় রত থাকিতেন। নদী-নালার দেশ বাখরগঞ্জে তিনি আসিয়াছেন; এ-সময়ে নৌকা-বাসের সুযোগ কি তিনি ছাড়িতে পারেন? সিঁড়ি বাহিয়া বোটে উঠিলাম। গিয়া কি দেখিলাম? শাদা খদ্দরের থান পরণে, গায়ে খদ্দরের ফতুয়া, কাঁচাপাকা শ্মশ্রুগুম্ফযুক্ত যেন একটি বৃদ্ধ 'বালক'। কিল ঘুসি চড় দ্বারা শক্তি পরীক্ষা—এ তো প্রফুল্লচন্দ্রের প্রথম আলাপের দক্ষিণা, তাঁহার নিকটে গেলে এজন্য প্রস্তুত হইয়াই যাইতে হইত। গ্রামের এক বন্ধুর মুখে আচার্য্যদেবের কথা শুনিতাম। কলিকাতায় গেলেই তাঁহার সঙ্গে তিনি দেখা করিতেন, তিনি তাঁহার সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। প্রথম সাক্ষাতেই

প্রফুল্লচন্দ্র আমাকে একেবারে আপন করিয়া লইলেন। সেইসময় এক মুসলমান খানসাহেব মোক্তার আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কেমন যেন মনে 'কিন্তু' অনুভব করিয়াছিলাম। কিন্তু সিঁড়ি হইতে উঠিবার সময় তাঁহাকে যখন বলিতে শুনি 'একজন সত্যকার মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাইলাম', তখন আমাদের বুক শ্লাঘায় আনন্দে যেন ফুলিয়া উঠিল। ঐ মোক্তার-পুঙ্গব ছিলেন সরকারের একান্ত আস্থাভাজন; তিনি পরে 'খান বাহাদুর'ও হইয়াছিলেন।

ইহার পরে প্রফুল্লচন্দ্রের সাক্ষাৎ সংস্রবে আসি বাগেরহাটে। আমরা যেবার ভর্ত্তি হই (১৯২২) সেবারে কলেজে আই-এস্‌সি শ্রেণী খোলা হয়। শ্রাবণ কি ভাদ্র মাসে - আমরা তখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বাগেরহাটে পৌঁছিয়াছেন। শুনিলাম তিনি ওখানে এক সপ্তাহ থাকিবেন এবং প্রতিদিন কলেজে পরীক্ষণ সংযোগে রসায়নশাস্ত্র বিষয়ে বক্তৃতা দিবেন। ছোট শহর, আশপাশে জমিদার তালুকদার ব্যবসায়ী অধ্যুষিত কয়েকটি গ্রাম। সর্ব্বত্র বিপুল সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছি; তাঁহার কলেজের ছাত্র এই মাত্র আমার পরিচয়। শহরের অল্প দূরে, কলেজের সন্নিকটে একজন সম্পন্ন গাঁতিদারের বাড়ীতে প্রফুল্লচন্দ্রের বাসস্থান ঠিক হইয়াছিল। বাড়ীর অভিভাবক তখন মৃত; বাগেরহাট কলেজ প্রতিষ্ঠায় তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। আমার এক বন্ধু সেই বাড়ীতে থাকিয়া কলেজে পড়িতেন। ওখানে আমার যাতায়াত ছিল। 'আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়' এত বড় লম্বা নাম আমরা তখন বলিতাম না। 'পি. সি. রায়'—লোকটি যেমন আমাদের প্রিয়, স্বল্পাক্ষরের জন্য উচ্চারণও বড় সোজা। আমরা পরস্পরের মধ্যে 'পি. সি. রায়' বলিয়াই তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতাম। কলেজের বিজ্ঞান-ভবনের দ্বিতলে তিনি বক্তৃতা দিবেন। শুধু ছাত্র ও অধ্যাপক নহেন, শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও আসিয়াছেন; তাঁহারা সকলেই তাঁহার বক্তৃতা শুনিবেন, স্বচক্ষে তৎপরিচালিত পরীক্ষণ দেখিবেন। কত ভীড়, দ্বিতলে তিল ধারণের স্থান নাই। কত লোককে সেদিন ফিরিয়া যাইতে হয়।

প্রফুল্লচন্দ্র যেদিন আসিয়াছিলেন, যতদূর স্মরণ হয় তাহার পরদিনই নির্দ্দিষ্ট বাসভবনে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তখন সকাল। প্রফুল্লচন্দ্র শয়নকক্ষে। তাঁহার পদধূলি গ্রহণ এবং পরিচয় প্রদান মাত্র আমি

যেন কত কালের পরিচিত এই ভাবে আমাকে আদর-আপ্যায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণাস্বরূপ কিল চড় ঘুষি সহ্য করিতে হইল! কত কথা। আমরা যুবক—তিনি বৃদ্ধ; কিন্তু তাঁহার আলাপ-আলাপন, আচার-আচরণ এই সুদীর্ঘ ব্যবধানকে মুহূর্ত্তের মধ্যে ধূলিসাৎ করিয়া দিল। পরবর্ত্তীকালে বহুবার নানা কাজে তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছি। কত কথা হইয়াছে; কিন্তু একটি কথা তিনি কখনও ভুলিতেন না। 'বয়স কত' জিজ্ঞাসা করিতেন এবং যখন শুনিতেন 'ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ' তখন হাসিয়া বলিতেন—'তবে তো শিশু, আমার অর্দ্ধেকেরও কম! প্রফুল্লচন্দ্রের শিশুসুলভ ব্যবহার যেমন সকলকে মুগ্ধ করিত তেমনি নিতান্ত অপরিচিতকেও একেবারে আপন করিয়া লইত। শিক্ষাব্রতী প্রফুল্লচন্দ্র অধুনাতন জগদ্‌বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের ছাত্রাবস্থায় যে এত আপন করিয়া লইয়াছিলেন তাহাও মনে হয় এই কারণে। তাঁহার শিক্ষাপদ্ধতি এবং তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার আলাপ-আলাপন যে অভূতপূর্ব্ব প্রেরণা জাগাইত তাহা বুঝিতেও আমাদের বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। আদর্শ শিক্ষাব্রতী, আদর্শ মানুষ, আদর্শ চিন্তানায়ক প্রফুল্লচন্দ্র জাতির স্মরণীয় এবং বরণীয়। আমি তাঁহার কলেজের ছাত্র—এই মাত্র সম্বল লইয়া পরবর্ত্তী নবেম্বর মাসে আচার্য্যদেবকে একখানি পত্র লিখিলাম। তিনি কলিকাতা সায়ান্স কলেজ হইতে ১৯২৩ সনের ১৮ই নবেম্বর ঐ পত্রের নিম্নরূপ উত্তর দিয়াছিলেন:

"কল্যাণীয়বরেষু,

তোমার পত্র পড়িলাম। তুমি history পড়, সেটা ভালই; যাহার যে বিষয়ে স্বাভাবিক রুচি (taste) তাহার সেই সেই বিষয়ই আলোচনা করা যুক্তিসঙ্গত। আমি এই বৃদ্ধ বয়সে অবসর পাইলেই নানা দেশের ইতিহাস পাঠে নিমগ্ন থাকি। এমন কি আমি অনেক সময় বলিয়া থাকি 'I became a chemist by mistake.' তুমি যে একটা কথা লিখিয়াছ 'যাহার যে দিকে গতি সে সেই বিষয় বুলডগের মত কামড়াইয়া ধরুক' আমার সুহৃদ পরলোকগত Gokhale সর্ব্বদাই আমাকে বলিতেন 'hold fast a thing like a bull-dog-like tenacity.' বাঙ্গালী কোন জিনিসে লাগ্‌পর হইয়া ধরিতে পারে না বলিয়া ব্যবসা বাণিজ্য এমন কি বিদ্যা-শিক্ষায়ও পশ্চাদপদ হইয়া রহিয়াছে। যাহা হউক, আমার সহিত দেখা না হইলে চিঠিপত্র লিখিয়া ভাব বিনিময় করা সোজা নয়; বিশেষতঃ আমি

বড় ব্যস্ত ! এখানে এমন অনুষ্ঠান আছে যে যাহার সংস্পর্শে আসিলে তুমি নূতন জীবন লাভ করিতে পার, যথা—ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের আশ্রম। যদি কলিকাতা কখনও আসিবার সুযোগ হয় তবে আমার এখানে ২।১ দিন থাকিলে অনেক বিষয় আলাপ করিতে পারি।

শুভার্থী—

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়"

১৯২৪ সন আমাদের ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। শুনিলাম বৈশাখ মাসে (এপ্রিল-মে, ১৯২৪) মূলঘরে খুলনা জেলা-সম্মেলন হইবে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সেখানে আসিবেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতিও আসিবেন। স্থির হইল মূলঘরে যাইব। একজন বন্ধুর সঙ্গে সব ঠিক করিয়া ফেলিলাম।

মূলঘর বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম, ভদ্র সম্প্রদায়ের বাস। উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের গৃহটি বড়ই মনোরম। আমরা যথাসময়ে মূলঘরে পৌছিলাম। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বাসস্থান ঐ বিদ্যালয় ভবন। তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি নানা কথায় ব্যস্ত; তথাকথিত ভদ্রশ্রেণীর কি কি করণীয়, যাহারা সমাজে নিম্নস্তরে অজ্ঞতার পঙ্কে ডুবিয়া আছে তাহাদিগকে কেমন করিয়া উপরে তুলিতে হইবে এইসব কথা তখন তাঁহার মুখে। আচার্য্য রায় তখন 'স্বদেশে'। স্বদেশের দোষত্রুটির কথাই সকলকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। যতদূর স্মরণ হয়, দেশবন্ধু সম্মেলনে পৌরোহিত্য করিবেন ঠিক হইয়াছিল। কিন্তু তিনি আসিতে পারিলেন না। সুভাষচন্দ্র বসু (পরে নেতাজী), বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, আজানুলম্বিত বসন অনিলবরণ রায় সম্মেলনে উপস্থিত হইলেন। প্রথম দিনের সভাপতির কাজ করিলেন শাসমল মহাশয়। কিন্তু এই নেতৃবৃন্দ ঐ দিন সন্ধ্যায় কলিকাতা ফিরিয়া গেলেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নির্দ্দেশে খুলনার জননায়ক একনিষ্ঠ দেশকর্ম্মী নগেন্দ্রনাথ সেন সম্মেলনের বাকী অংশে পৌরোহিত্য করেন। প্রফুল্লচন্দ্রের একটি কথা এখনও স্মরণ হইতেছে। খুলনা জেলা-সম্মেলনে খুলনাবাসীরই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের নিমিত্ত সম্মেলন। এখানে বাহির হইতে সভাপতি আনা হয় কেন ? হাঁ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন হইলে আলাদা কথা ছিল। তাঁহার ঘরোয়া কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম—নগেন্দ্রনাথের প্রতি তিনি বড়ই শ্রদ্ধাশীল।

নগেন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলনে, খুলনা দুর্ভিক্ষকালে বিস্তর ত্যাগ ও সেবার পরিচয় দিয়াছিলেন। পূর্ব্ব বৎসর যশোহর প্রাদেশিক সম্মেলনে যাইবার পথে আমরা শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক তাঁহার গৃহে অতিথি হইয়াছিলাম। তখন তিনি আমাদের যে উপদেশ দেন তাহাতে কর্ণপাত না করায় আজও অনুতপ্ত বোধ করিতেছি।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি প্রখ্যাত শিক্ষাব্রতী নেপালচন্দ্র রায়। সুপুরুষ সৌম্যমূর্ত্তি নেপালচন্দ্রকে সেই দেখিয়াছি তাহা আর কখন ভুলিতে পারি নাই। তিনি তখন রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের শিক্ষক। কিন্তু ইহাই তাঁহার সম্যক্ পরিচয় নয়। স্বদেশী আন্দোলনের বহু পূর্ব্ব হইতে তিনি এলাহাবাদে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার শিক্ষায় আদর্শে আচরণে ছাত্রেরা যে কতখানি অনুপ্রাণিত ও উদ্‌বুদ্ধ হইত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার দুই একজন ছাত্রের মুখে তাঁহার কত গুণপনার কথা শুনিয়া থাকি। স্বদেশী আন্দোলনকালে ঐ অঞ্চলে স্বদেশী প্রচারে আত্মনিয়োগ করায় তিনি উত্তরপশ্চিম প্রদেশের সরকার কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন! তাঁহার আচরণ মধুর, লেখা আরও মধুর। তদ্‌রচিত একখানি ভূগোল দেখিয়াছি, কি সুললিত ভাষায় দেশ-মাতার রূপ কথাচ্ছলে উহাতে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। সে রকম পাঠ্য বই এখন আর দেখি না।

কলিকাতায় বি-এ পড়িতে আসিয়া সিটি কলেজে ভর্ত্তি হই (জুলাই ১৯২৪)। সিটি কলেজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এডুকেশান সোসাইটি কর্ত্তৃক পারিচালিত। ইহাতে আচার্য্য রায়ের স্থান ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু সিটি কলেজের কোন ব্যাপারে তাঁহাকে সংশ্লিষ্ট দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সায়ান্স কলেজ তখন তাঁহার বিদ্যাপীঠ, গবেষণা-আলোচনার কেন্দ্র। তিনি এখানকার রসায়ন শাস্ত্রের পালিত অধ্যাপক। কিন্তু বেতন স্বরূপ তিনি একটি পাইপয়সাও নিজে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মাসিক বেতন জমা হইতে হইতে প্রায় লক্ষ টাকায় দাঁড়াইলে তিনি ইহা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়া দেন। সায়ান্স কলেজের সংলগ্ন দক্ষিণদিকের পশ্চিম কোণে এই অর্থের কিয়দংশের দ্বারা আরো খানিকটা বাড়াইয়া দেওয়া হইল। বাকী অর্থে "প্রফুল্লচন্দ্র অধ্যাপক বা গবেষক" নিযুক্ত হইবার ব্যবস্থা হয়। এই নব-নির্ম্মিত অংশের দ্বিতলের পশ্চিমদিকের প্রকোষ্ঠটিতে প্রফুল্লচন্দ্র

জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন। এখন এখানে প্রফুল্লচন্দ্র মিউজিয়াম হইয়াছে।

কলিকাতায় আসিয়া প্রথম কয়েক বৎসর কি জানি কেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে দেখাশুনা করি নাই। তবে বহু স্থানে তাঁহাকে দেখিয়াছি, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজে এবং এলবার্ট হলে তাঁহার বক্তৃতাও শুনিয়াছি। গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরে দিনকালের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। ঐ সময় এলবার্ট-হল ছিল কলিকাতার যুবক-সমাজের একটি প্রধান আকর্ষণ। এখানে লাইব্রেরী ও 'রীডিং রুম' ছিল। বাংলার এবং বাংলার বাহিরের নানা সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র সেখানে পড়া যাইত। গোলদীঘিতে বেড়াইতে গিয়া আমরা অনেকে একবার করিয়া এলবার্ট-হলের ত্রিতলে গিয়া এইসব দেশী-বিদেশী কাগজপত্র দেখিয়া, পড়িয়া, পাতা উল্টাইয়া আসিতাম। আকর্ষণের দ্বিতীয় বিষয় ছিল—এলবার্ট হলের সভা। এখানকার বিভিন্ন সভায় কত মনীষী—রাজনীতিবিদ্, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, নাট্যকার, অর্থনীতিবিদ্, সমাজ-সংস্কারক প্রভৃতির সমাগম হইত। এখানে বাগ্মীপ্রবর বিপিনচন্দ্র পাল, রসরাজ অমৃতলাল বসু, মিসেস্ এনি বেসাণ্ট, সাপুরজী সাকলত ওয়াল, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এবং পরে জবাহরলাল নেহরু, সরোজিনী নাইডু, ফজলুল হক, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কত জনার কত রকমের কথা শুনিয়াছি। তেহি ন দিবসাগতাঃ। আজ সেখানে কফি হাউস; আলাপ-আলাপনরত যুবক-যুবতীর কতই না ভীড়! আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতাও এখানে হইত। তিনি বক্তা ছিলেন না, কিন্তু বক্তব্য বিষয় বেশ গুছাইয়া বলিতেন। ইংরেজীতেও একবার তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছি। বাংলার চেয়ে ইংরেজী যেন তাঁর পক্ষে সহজতর।

একটি সূত্রে পুনরায় আচার্য্য রায়ের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইবার সুযোগ হইল। প্রফুল্লচন্দ্র তখন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি (১৩৩৮-৪১)। তিনি ইতিপূর্ব্বে বহু বৎসর পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন। প্রথম এই পদে তাঁহাকে অধিষ্ঠিত দেখি ১৩০৮ সালে (ইং ১৯০১-২)। ১৩১০ বঙ্গাব্দে পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ও আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রও পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য নির্ব্বাচিত হন। পরিষদ ১৩১৩ সালে তাঁহার "নব্যরসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি" শীর্ষক একখানি মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 'বাংলা রাসায়নিক পরিভাষা'রও সম্পাদক আচার্য্য

প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনেও প্রফুল্লচন্দ্র যোগ দিতেন। ১৯১৬ সনে (বাংলা ১৩২৩) বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয় যশোহরে। বর্ষীয়ান্ প্রফুল্লচন্দ্র এবং যুবক মেঘনাদ সাহা এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন প্রথিতযশা ভূতাত্ত্বিক টাটা-জামসেদপুর লৌহখনির আবিষ্কর্ত্তা প্রমথনাথ বসু মহাশয়। উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষায় বাংলা মাধ্যমের কথা এই সম্মেলনে আলোচিত হয়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি এই আলোচনায় যোগদান করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গত শতাব্দীর শেষ দশক হইতেই প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে বাংলা ভাষার মাধ্যমে রসায়ন শাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি বাংলা ভাষার বিশেষ দরদী ছিলেন। ইহাকে উচ্চতর শিক্ষার মাধ্যম করিতে যে আগ্রহশীল হইবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি?

উপরের সূত্রটির কথা এখন বলি। ১৩৩৯, ভাদ্র মাসে প্রবাসীতে আমার রাধানাথ শিকদার প্রবন্ধটি বাহির হয়। শিকদার মহাশয় সম্পর্কে ইংরেজী প্রবন্ধ 'মডার্ণ রিভিয়ু'র ১৯৩৩, এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত করি। এভারেষ্টের সর্ব্ব উচ্চতানির্ণয়কারী বলিয়া রাধানাথের কৃতিত্বই যে সর্ব্বাধিক এবং আমাদের একান্ত গৌরবের, এই কথাটি প্রমাণ প্রয়োগে উক্ত প্রবন্ধে আমি দেখাইতে প্রয়াস পাই। বাংলা প্রবন্ধটি প্রকাশের পর ডাঃ মেঘনাথ সাহার নিকট হইতে প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মারফত যে উৎসাহ-পত্রখানি পাই তাহা আমাকে বিশেষ প্রেরণা দিয়াছিল। রাধানাথ শিকদার সম্পর্কীয় প্রবন্ধ দুইটি এবং তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় এ বিষয়ে আলোচনা স্বতঃই আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যতই তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়াছি, ততই দেখিয়াছি তাঁহার স্বদেশপ্রেম কত প্রগাঢ় ছিল। স্বদেশ এবং স্বদেশবাসীর গৌরবে তাঁহার বুক যেন দশ হাত চওড়া হইয়া উঠিত। রাধানাথ শিকদারের গৌরব যে আমাদের জাতীয় সম্পদ এবং সম্বল; জাতীয় উন্নতির চড়াই-উৎরাইয়ের যে পাথেয়। ইহার পূর্ব্বেই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সদস্য হইয়া নিয়মিত যাতায়াত এবং পড়াশুনা সুরু করিয়াছি। প্রফুল্লচন্দ্র পরিষদের সভা-সমিতিতে সভাপতিরূপে উপস্থিত থাকিতেন; আবার মাঝে মাঝে অমনিও যাইতেন। কিন্তু সায়ংকালে তাঁহাকে কোথাও আটকাইয়া রাখা যাইত না। এলবার্ট হলে খুব জমজমাট

সভা ; দেখিতাম সংক্ষেপে বক্তব্য সারিয়া, অথবা বক্তৃতা দিতে দিতেই তিনি উঠিয়া পড়িতেন। কেননা সন্ধ্যা সমাগত, আচার্য্যদেব ময়দানে গিয়া কিছুক্ষণ মুক্ত বায়ু সেবন করিবেন। এই-ই তাঁহার অভ্যাস ও রীতি ছিল। রবি অস্তমিত, তখনও তমসা দিবালোককে সম্পূর্ণ গ্রাস করিতে পারে নাই। এমনি সময়ে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার ছ্যাকরা গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। আমি তাঁহার নিকটে গিয়া সংক্ষেপে আমার পরিচয় দিলাম। আমি 'রাধানাথ শিকদারে'র লেখক, এই মাত্র বলিতেই আবার সেই পূর্ব্বের আচরণ প্রত্যক্ষ করিলাম। আমার সঙ্গে কথা বলিতে তাঁহার কত আগ্রহ ; কিন্তু তখন সময় নাই। আমাকে সায়ান্স কলেজে সত্বর দেখা করিতে বলিয়া গাড়ী ছুটাইতে আদেশ দিলেন।

'প্রবাসী' 'মডার্ণ রিভিয়ু'র সম্পাদকীয় বিভাগে আমি তখন কাজে লিপ্ত। এই পত্রিকা দুইখানির সঙ্গে আচার্য্য রায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ; সম্পাদক রামানন্দ বাবুর সঙ্গে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠতর। আমি আচার্য্য নির্দ্দেশমত সায়ান্স কলেজে তাঁহার সঙ্গে দেখা করি। সকালে কি বিকালে স্মরণ নাই। সকালে ১০টা নাগাত এবং বিকালে ৩টা হইতে ৫টা তাঁহার সঙ্গে দেখা করার প্রশস্ত সময়। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি 'প্রবাসী', এবং 'মডার্ণ রিভিয়ুর' সম্পাদকের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে যতবার গিয়াছি', হয় আরম্ভে, নয় কথার মধ্যে এ দুইটি বিষয় শুধাইতে তিনি ভুলেন নাই। ন'টা দশটার সময় তিনি নিম্নতলে গবেষণাগারে থাকিতেন, সেইখানে বসিয়াই কথাবার্তা চলিত। মুখে কথা হাতে কাজ ; প্রায়শঃ গবেষক ছাত্রদের নানা বিষয়ে নির্দ্দেশ দিতেন। গবেষণা বা বীক্ষণাগারের এই সকল গবেষণার কথা কেমিক্যাল সোসাইটির মুখপত্র, এমনকি বিদেশের বৈজ্ঞানিক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইত। প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং তাঁহার নির্দ্দেশে যে ছাত্র যে বিষয়ে গবেষণা করিতেন উভয়ের নামেই এই গবেষণা-প্রবন্ধগুলি ছাপা হওয়ায় তাহা বিদ্বৎ-সমাজে মান্য হইত ; সঙ্গে সঙ্গে নূতন ও অজ্ঞাতনামা ছাত্র-গবেষককেও পরিচয় করাইয়া দিবার সুযোগ ঘটিত। কত গবেষক-ছাত্র যে এইরূপে উৎসাহ অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কোন কোন ছাত্র-গবেষক বিভিন্ন সময়ে তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারীর কার্য করিতেন। কি প্রেসিডেন্সী কলেজে কি সায়ান্স কলেজে সর্বত্রই ছাত্রেরা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া নিজ নিজ গবেষণায় বিশেষ প্রেরণা লাভ করিয়াছেন।

পূর্ব্বে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের কলেজের ছাত্র ছিলাম। সে পরিচয় তো আমার ছিলই। আমার নূতন পরিচয়ের সূত্রটিই ঘনিষ্ঠতা বাড়াইয়া দিল। প্রথম আলাপনে রাধানাথ শিকদার সম্পর্কে নানা কথা হইল। বাঙালীর কীর্ত্তি লাঘব করিবার অপচেষ্টা রাধানাথের জীবিত-কালে হইয়াছিল, এযুগেও হইতেছে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। আজও কিরূপ নির্লজ্জভাবে রাধানাথের গৌরব অপহ্নবের চেষ্টা চলিয়াছে, আচার্য্য রায় বাঁচিয়া থাকিলে তাহা জানিয়া নিশ্চয়ই দুঃখ বোধ করিতেন। রাধানাথ যে ঐসময়ে 'চীফ কম্পিউটর' ছিলেন এই জলজ্যান্ত সত্য কথাটাও এখন কেহ কেহ অস্বীকার করিতে চায়! রাধানাথ শিকদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন শ্রীনাথ শিকদার। রাধানাথ অবিবাহিত ছিলেন। এসব আমি জানিতাম। প্রফুল্লচন্দ্র শিকদার-পরিবার সম্বন্ধে আরও কিছু আমায় বলিলেন। শ্রীনাথ শিকদারের পুত্র কেদারনাথ শিকদার তাঁহার লোহার ব্যবসায় ছিল, কিন্তু নানা কারণে তাঁহাকে পরে এ ব্যবসা গুটাইতে হয়। অন্য সূত্রে কেদারনাথ শিকদারের ঠিকানা প্রাপ্ত হই এবং তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তখন তিনি অশীতিপরবৃদ্ধ এবং ঠিক পাকা শশাটির মত। তাঁহার নিকট হইতে রাধানাথ শিকদার সম্পর্কে অনেক নূতন তথ্য পাইয়াছিলাম। রাধানাথ শিকদারের পিতৃদেব তিতুরাম শিকদারের নিকট লিখিত জর্জ্জ এভারেষ্টের পত্র অন্য কতকগুলি পত্রসমেত মূলে আমি তাঁহার নিকটে পাই এবং এসকল পরে প্রকাশিত করি। আমার মুখে এসব কথা শুনিয়া এবং প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের কি আনন্দ। দেখা করিতে গেলে নানা কথার মধ্যে এই আনন্দের পরিচয় পাইতাম।

প্রফুল্লচন্দ্রের দৃষ্টি প্রসারিত, এমন বিষয় নাই, যে সম্বন্ধে তিনি জানিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু' হইতে তিনি অনেক তথ্য আহরণ করিতেন। আবার যখন কিছু জানিয়া লওয়া প্রয়োজন হইত মুখে বা পত্র দ্বারা জিজ্ঞাসা করিতেন। আমার শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয় গবেষণামূলক প্রবন্ধ কিছু কিছু তখন বাহির হইতেছিল। 'প্রবাসী', 'মডার্ণ রিভিয়ু' তো ছিলই; 'দেশ' সাপ্তাহিকেও ঐসময় বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহাতেও কিছু কিছু তথ্যধর্ম্মী রচনা প্রকাশিত করিতে লাগিলাম। হিন্দু কলেজের পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করিয়া একটি প্রবন্ধ 'দেশ' পত্রিকায় লিখি। ইহাও প্রফুল্লচন্দ্রের দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি সায়ান্স কলেজ হইতে ১৯৩৪,

২৭শে নভেম্বর তারিখে এই পত্রখানি লিখেন। পত্র সবই তাঁহার স্বহস্তে লেখা। পত্রখানি এই :

"My dear Bagal,

কিছুদিন হইল 'Modern Review'তে একটি Extract from the Cape Editor of Capital উদ্ধৃত হইয়াছিল। তাহাতে Injustice to Bengal due to Meston Award অতি সুস্পষ্টরূপে বিবৃত আছে, আমি এটা খুঁজিয়া পাইতেছি না। তুমি সেই issue একবার লোক মারফত দিলে বাধিত হইব।

তুমি 'দেশ' পত্রিকায় দেখাইয়াছ যে the Hindus of Bengal প্রধানতঃ Hindu মহাবিদ্যালয় স্থাপন করে। আমি ঠিক অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে (1885-86) Edinburgh published 'India'তে আরও নূতন authority quote করিয়া তাহা দেখাই !!

Yours Truly.

P. C. Ray

পত্রখানি ইংরেজী বাংলা মিশানো। সর্ব্বত্র ছেদ চিহ্নও নাই, কয়েকটি চিহ্ন আমি পূরণ করিয়া দিলাম। আচার্য্য রায়ের নিকট হইতে "India" পুস্তকখানি আনিয়া পাঠ করিলাম। এ বইখানি রচনার একটু ইতিহাস আছে। প্রফুল্লচন্দ্র এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এস্‌সি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে একটি রচনা-প্রতিযোগিতা কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন—বিষয় : 'আধুনিক ভারতবর্ষ'। প্রতিযোগিতায় উপস্থাপিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনার জন্য পঞ্চাশ পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল। প্রফুল্লচন্দ্র প্রতিযোগিতায় যোগ দেন। তাঁহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত না হইলেও "Second Best" বা "দ্বিতীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট" প্রবন্ধ বলিয়া বিঘোষিত হয়। পুস্তকখানি এডিনবরায় ছাপান হইয়াছিল। এখানি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল, না, প্রফুল্লচন্দ্র স্বয়ং ছাপাইয়াছিলেন ঠিক স্মরণ হইতেছে না। সে যুগের সংবাদপত্রের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া এই সময় বাংলা ও ইংরেজীতে কতকগুলি জীবনী-প্রবন্ধ লিখি। আলাপে বুঝিতাম প্রফুল্লচন্দ্র এ সকল বিষয় খোঁজখবর রাখিতেন। তাঁহার ইংরেজী আত্মজীবনী তখন বাহির হইয়া গিয়াছে। প্রথম খণ্ড তো হইয়া-

ছিলই, দ্বিতীয় খণ্ডও বোধ হয় বাহির হইল। প্রফুল্লচন্দ্রের পিতৃদেব হরিশ্চন্দ্র রায় চৌধুরী রাড়ুলি-কাটিপাড়া অঞ্চলে সে যুগের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। জমিদার হইয়াও তিনি ছিলেন স্বদেশবৎসল। ঐ অঞ্চলে আদর্শ ইংরেজী ও বাংলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, রঙ্গালয়ের প্রবর্ত্তন এবং অন্য দশরকম সংকার্য্যে তিনি লিপ্ত ছিলেন। ১৮৫৬-৫৭ কি ইহার অল্প পরবর্ত্তী এডুকেশন রিপোর্টে হরিশচন্দ্র রায় চৌধুরীকে একজন বিশেষ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 'সংবাদ প্রভাকরে' ভ্রমণকারী সম্পাদকের বিবরণ বাহির হইত। মনে হয়, 'প্রভাকর'-সম্পাদক' কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তখন স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশ্যে বাংলা দেশের কোথাও কোথাও জল পথে ভ্রমণ করিতেন। 'সংবাদ প্রভাকরে' ১৮৫৬ সনে রাড়ুলি কাটিপাড় বাঁকা প্রভৃতি তৎকালীন বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম সম্বন্ধে নানা কথা প্রকাশিত হইত। জমিদার হরিশ্চন্দ্র রায় চৌধুরীর কীর্তিকলাপের বিবরণও উক্ত 'ভ্রমণকারী সম্পাদক' প্রভাকরে পরিবেশন করিয়াছিলেন। এই বৎসরের 'সংবাদ প্রভাকরে'র পুরাতন ফাইলে হরিশ্চন্দ্র রায় চৌধুরীর বিদ্যালয় ও রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার যে সব বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহা আমি হুবহু 'দেশ' সাপ্তাহিকে পুনঃ প্রকাশিত করি। প্রফুল্লচন্দ্রের নজর কিন্তু এড়ায় নাই। উহা প্রকাশের পরে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতেই তিনি উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার অজানা এত কথা তাঁহার পিতৃদেব সম্বন্ধে বাহির করিয়াছি এজন্য বিস্তর সাধুবাদ করিলেন। আমি সংসারে অনভিজ্ঞ, বয়স তাঁহার অর্দ্ধেকেরও কম; কিন্তু তাঁহার প্রমুখাৎ এই রকম উৎসাহ আনন্দের কথা শুনিয়া আমার গবেষণা-স্পৃহা শত গুণ বর্দ্ধিত হইয়া গেল।

কয়েক বৎসর পরে। একদিন মেসে বসিয়া আছি। দেখি এক ভদ্রলোক আমাকে খুঁজিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট হইতে আসিতেছেন। তিনি বলিলেন, আচার্য্যরায়ের পিতৃদেব সম্বন্ধে আমি যে সব নূতন তথ্য বাহির করিয়াছি তিনি তাঁহার বাংলা আত্মজীবনীতে-ঐসব সংযোজিত করিবেন। আগেই শুনিয়াছি, আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রফুল্ল কুমার সরকার আচার্য্যদেবের ইংরেজী আত্মজীবনী বাংলায় অনুবাদ করিতে ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট একদিন গিয়াছি, তিনি বলিলেন, আমার বাহির করা তদীয় পিতৃদেব হরিশ্চন্দ্র সম্পর্কিত তথ্যগুলি তিনি উপযুক্ত স্বীকৃতিসমেত আত্মজীবনীতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। শুনিয়া নিজেকে ধন্য মানিলাম।

পূর্ব্বে প্রবাসী আপিস সায়ান্স কলেজ সংলগ্ন ছিল। ১৯২৯ সনের শারদীয়ার ছুটিতে বর্ত্তমান বাড়ীতে উহা চলিয়া আসে। সায়ান্স কলেজ ও প্রবাসী কার্য্যালয় কাছাকাছি থাকায় আমার পক্ষে আচার্য-দর্শনে হামেশা যাতায়াত সম্ভবপর ছিল। দুপুর বেলা তাঁহার বিশ্রামের সময়। ইহা ছাড়া সকালে-বিকালে সব সময়ই আমার যাওয়ার অনুমতি ছিল। প্রফুল্লচন্দ্র সকালের দিকে কিছু সময় নিয়মিত চরখায় সূতা কাটিতেন। তাঁহার পরণে মোটা ধুতী এবং গায়ে মোটা সূতার ফতুয়া; সবই খদ্দরের। বলিতেন—নিজের কাটা সূতায় যদি আমরা এ সব না করিয়া লই তাহা হইলে চরখায় সূতা কাটায় আর্থিক লাভ হইবে না। অর্থাৎ, আমাদিগকে নিজ নিজ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য এইরূপ স্বাবলম্বী হইতে হইবে। প্রত্যেক পরিবারকে অন্ততঃ বস্ত্র বিষয়ে স্বাবলম্বী করিতে পারিলে দেশের অর্থ নৈতিক চেহারা দ্রুত বদলাইয়া যাইবে। প্রফুল্লচন্দ্র গান্ধী-মতবাদের অর্থ নৈতিক দিক পুরাপুরি গ্রহণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। আজিকার স্বাধীনতার পরিবেশে এই ভাবনা কতখানি কার্য্যকরী হইয়াছে?

স্বদেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়ের উন্নতি বিষয়ে প্রফুল্লচন্দ্র নিয়ত চিন্তা করিতেন। কথাবার্ত্তায়, বক্তৃতায়, রচনায় এই সকল প্রকাশ করিতে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। কাহারো ভ্রূকুটি তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। অধুনা-বিখ্যাত কৃষিতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র ফরিদপুরের সরকারী কৃষিক্ষেত্রে একটি বড় পেঁপে জন্মাইয়াছিলেন। এই পেঁপে-হস্তে প্রফুল্লচন্দ্রের চিত্র সেই কবে দেখিয়াছি, এখনও ভুলিতে পারি নাই। বাঙালী বুদ্ধিমান, কিন্তু তাহার বুদ্ধি স্বদেশের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের উন্নয়ন ও প্রসারে নিয়োজিত না হইয়া বিপথে যাইতেছে, এ কারণ তাঁর কতই না আক্ষেপ! আমার যে-অঞ্চলে বাস তাহা সুপারীর জন্য বিখ্যাত। এই সুপারীর ব্যবসায়ে বাগেরহাট বেশ দু'পয়সা করিয়াছে। কিন্তু এ ব্যবসায়ের মূল চাবিকাঠি ভিন্ন প্রদেশীয়ের হাতে। তাহারা সুপারীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে, আর এই ব্যবসায়ে প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকা তাহাদের পকেটে যায়। বাঙালী শুধু 'hewers of wood' এবং 'drawers of water'! এই সব কথা বলিতে বলিতে প্রফুল্লচন্দ্র কতই না দুঃখ করিতেন। তিনি অনেক সময় কলিকাতার বনেদী বাসিন্দাদের কথা উল্লেখ করিয়াও আক্ষেপ করিতেন। তাঁহারা, এমন কি তরুণেরা পর্য্যন্ত, বাড়ীর রকে বসিয়া আড্ডা দেন, রাজা-উজীর মারেন, আলস্যে সময় কাটান;

অথচ তাঁহাদের পক্ষে কত সুবিধা এবং সহজ নানা রকম ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যবিধ দশকর্ম্মে লিপ্ত হওয়ার।

এই সম্বন্ধে আরও একটু বলি। আলোচনা বা বক্তৃতায় আচার্যদেব অনেক সময় কলিকাতা-প্রবাসী অবাঙালীদের কথাও বলিতেন। কেহ কেহ তাঁহার উপর ভ্রমক্রমে প্রাদেশিকতা-দোষেরও আরোপ করিত। বাস্তবিক পক্ষে তিনি ব্যবসাবিমুখ বাঙালীকে শিল্প ব্যবসায়ে লিপ্ত হইবার জন্যই আবেদন জানাইতেন; অবাঙালীদের দৃষ্টান্ত দিয়া এই কথাই বুঝাইতে চাহিতেন যে, তাহারা কঠোর পরিশ্রম করিলে ইহাদের মত হইতে পারিবে। লোটা-কম্বল সম্বল করিয়া যাহারা একদিন বাংলায় আসিয়াছিল তাহারা আজ কোটিপতি: বাঙালীরা তাহাদের কার্য্যালয়ে কেরাণীগিরি করিয়াই কি জীবনপাত করিবে? তাহাদের কি ভবিষ্যৎ নাই? বাঙালী যদি এভাবে চলে তাহা হইলে সে যে 'নিজ ভূমে পরবাসী' হইবে। পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রফুল্লচন্দ্র এই সকল কথা বলিয়াছিলেন। পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পরে, স্বাধীনতার নূতন পরিবেশে, কলিকাতা তথা বাংলার অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রফুল্লচন্দ্রের উক্তিগুলি যে কত মর্ম্মান্তিক সত্য ছিল তাহা প্রতীতি হইবে। সেদিন হয়ত বেশী দূরে নয়, যখন কলিকাতা-বাস সাধারণ বাঙালী গৃহস্থের পক্ষে একেবারে দুর্ঘট হইয়া হইবে।

তৃতীয় দশকের প্রথম দিকে প্রফুল্লচন্দ্রকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা কর্মব্যপদেশে গমন করিতে হইত। তিনি একবার আমাকে বলিলেন, এ বৎসর দুই হাজার মাইল রেল-ভ্রমণ করিয়াছেন! দক্ষিণ ভারতে বাঙ্গালোরে তাঁহাকে যাইতে হইত, কেননা ঐ সময় তিনি বাঙ্গালোর সায়ান্স ইন্‌ষ্টিটিউটের অন্যতম অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বলিতেন, বৃদ্ধ বয়সে রেল-ভ্রমণ স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। তবে বাংলা ও বাঙালীকে তিনি কখনও ভুলিয়া থাকিতে পারিতেন না। বাঙালীর প্রতি তাঁহার গভীর দরদ কথায় কথায় প্রকাশ হইয়া পড়িত। তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তিনি স্বতঃই আকুল হইয়া পড়িতেন। আমি যে-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, তাহার কথাও তিনি বিশেষ চিন্তা করিতেন। রামানন্দবাবু বৃদ্ধ, তাঁহার অবর্ত্তমানে যাহাতে এই প্রতিষ্ঠানটি সুন্দরভাবে চালিত হয় তাহার জন্য আচার্যদেবের কত ভাবনা। ১৯৩৫ সনের নবেম্বর মাসে আমি 'প্রবাসী' ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাই। আচার্যদেব এই সংবাদ কিরূপে পাইয়াছিলেন জানি না। প্রসিদ্ধ

ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় "উর্ম্মিমুখর" পুস্তকে (পৃঃ ২৬) লিখিয়াছেন ঃ

"একটা বেঞ্চে বসে আছি, ডাঃ পি, সি, রায় সামনে দিয়ে যাচ্ছেন। দু'জনে গল্প করতে করতে বেড়ালুম অনেকক্ষণ পর্যন্ত। উনি বেশীর ভাগ বল্লেন 'প্রবাসী'র কথা। যোগেশ বাগল প্রবাসী ছেড়ে গিয়েছে, সেজন্য দুঃখ করলেন।" *

আচার্যদেব আমাকে স্নেহ করিতেন জানিতাম। কিন্তু অন্যের নিকটও যে আমার কথা এমন ভাবে প্রকাশ করিতেন তাহা জানিতাম না। তবে তাঁহার জীবিতকালে আমার সম্বন্ধে তাঁহার উদ্বেগের নিদর্শন আর এক বন্ধু মারফতও শুনিয়াছিলাম। নিতান্ত ব্যক্তিগত বলিয়া এখানে উল্লেখ করিলাম না।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আদর্শ শিক্ষাব্রতী, নিষ্ঠাবান গবেষক, স্বদেশগতপ্রাণ কর্ম্মী ও নেতা, বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রতিষ্ঠাতা এবং অন্য বহু স্বদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা ও অনুপ্রেরক। কিন্তু ইহাই তাঁহার সম্যক্ পরিচয় নয়, তিনি ছিলেন আজীবন ছাত্র। নানা কাজের মধ্যেও পড়াশুনার জন্য কিছু সময় তিনি ব্যয় করিতেন। কতদিন তাঁহাকে কোন-না কোন বই পড়িতে দেখিয়াছি। কৈশোরে তাঁহার স্মৃতিশক্তি খুবই প্রখর ছিল। তাঁহার আত্ম-জীবনীতে তিনি ছাত্রাবস্থার বিষয় কিছু কিছু লিখিয়াছেন; কিন্তু প্রত্যেক বিষয়েই যেমন, এ বিষয়েও তেমনি লেখার চেয়ে অ-লেখা অনেক রহিয়া গিয়াছে। আচার্য্যদেব আমাকে বলিয়াছেন, কৈশোরে তিনি যাহা পাঠ করিতেন প্রায় সকলই তাঁহার মুখস্থ হইয়া যাইত। তিনি কৃষ্ণবিহারী সেনের এল্‌বার্ট স্কুলে পড়িবার সময় মিলটনের "প্যারাডাইস লষ্ট্" মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, এই বলিয়া একদিন আমায় তিনি প্রথম সর্গ প্রথম হইতে অনেকটা মুখস্থ বলিলেন। মুখস্থ করিবার উপকারিতা কত এ সম্বন্ধেও তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন স্মরণ হইতেছে। যখন আমরা পাঠ মুখস্থ করি তখন তাহার মানে হয়ত সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিনা। কিন্তু পরে আমরা বুঝিতে পারি। মনে গাঁথিয়া গেলে পর পর আবৃত্তি দ্বারা অনেক সময় মানে খোলসা হইয়া যায়। প্রফুল্লচন্দ্র আমাকে বলিতেন, তিনি আগে ইংরেজী

* শ্রীমান্ গোপালচন্দ্র দে পুস্তকখানির এই অংশের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।
—লেখক

ভাষাতেই বেশ লিখিতে পারিতেন, কিন্তু অনভ্যাস হেতু সে শক্তি আর তাঁহার নাই। তাঁহার ইংরেজী প্রতিযোগিতা-পুস্তকখানি সম্পর্কে কথা হইতেই মনে হয় এই কথা বলিয়াছিলেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের "সেক্সপীয়র" খুব ভাল পড়া ছিল। নানা কথার মধ্যে 'জুলিয়াস সীজার', 'ওথেলো', 'ম্যাকবেথ্', 'মার্চেণ্ট অব্ ভেনিস' প্রভৃতি হইতে কিছু কিছু আবৃত্তি করিতেন। তখন বুঝিতে পারি নাই তিনি সেক্সপীয়র সাহিত্যে অতখানি ব্যুৎপন্ন। * একটু আগেই বলিয়াছি, তখন আমি অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলাম, তাঁহার নিকটে তখন পূর্ব্বের মত বেশী যাওয়া আসা সম্ভব হইত না। একদিন গিয়া দেখি—তাঁহার টেবিলে বিভিন্ন সংস্করণের অনেকগুলি সেক্সপীয়রের নাটক গ্রন্থ, আর তাহার উপর সমালোচনা-পুস্তক। আমি কৌতূহল প্রকাশ করায় আচার্যদেব বলিতে লগিলেন—তিনি 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' মাসিকে সেক্সপীয়রের নাটক সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ-মালা লিখিতেছেন; কয়েকটি বাহির হইয়াছে, আরও বাহির হইবে। আর ঐ সমস্ত বই? কলিকাতার বিভিন্ন গ্রন্থাগার হইতে আনাইয়াছেন। ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী, ইম্পিরিয়াল (এখন ন্যাশলাল) লাইব্রেরী, এসিয়াটিক সোসাইটী, রামমোহন লাইব্রেরী হইতে আনাইয়াছেন সেক্সপীয়রের নাটক-সমূহের নানা সংস্করণ, বিভিন্ন সেক্সপীয়র-পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত। আবার হাডসন্ ডাউডেন, ব্রাড্লি এবং আরও অনেকের লেখা সেক্সপীয়রের নাটকের সমালোচনা-পুস্তক। এই সকল বই চোখের দৃষ্টিক্ষীণতার জন্য এখন আর নিজে পড়িতে পারেন না। সকালে বিকালে পাঠক নিযুক্ত করিয়াছেন—সকাল ৬টা হইতে ৯টা এবং বিকালে ৩টা হইতে ৫টা। এই পাঁচ ঘণ্টা তিনি তন্ময় হইয়া সেক্সপীয়র পাঠ শুনিতেন। বিকালে কখন কখন দেখিয়াছি তাঁহার চোখে কাপড় বাঁধা, পার্শ্বে পাঠক পড়িয়া চলিয়াছে। প্রয়োজন বোধ হইলে তিনি প্রশ্ন করিতেছেন। আবার, কোন কোন সময়ে প্রফুল্লচন্দ্র প্রবন্ধ dictate করিতেছেন—তিনি বলিয়া যাইতেছেন আর লেখক লিখিয়া চলিয়াছেন।

এই সেক্সপীয়র প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে এখানে একটু বিশদ করিয়া বলি।

---

* সম্প্রতি বন্ধুবর শ্রীযুত মন্মথনাথ সান্যালও একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া আচার্যদেবের 'সেক্সপীয়র' প্রীতির কথা আমাকে বলিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর বর্ষগুলিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই সেক্সপীয়রের কোন কোন নাটক পাঠ করিতে হয়। অধ্যাপকগণও নানাভাবে ছাত্রদের নিকট ইহার রস পরিবেশনে প্রয়াস পান। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ললিতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেক্সপীয়র অধ্যাপনায় বিশেষ সুনাম ছিল। তাঁহার অধ্যাপনা শুনিতে অন্যান্য কলেজের ছাত্রেরাও সেখানে ভিড় জমাইত। ইদানীংকালে এইরূপ দক্ষ অধ্যাপকের অধ্যাপনার কথা বড় একটা শুনি না। প্রফুল্লচন্দ্রের সেক্সপীয়র-প্রীতি ছিল অনন্যতুল্য ; আমি ইতিপূর্ব্বে তাহার খানিকটা পরিচয় পাইয়াছিলাম। আমার এক বন্ধুও সেদিন একথায় সায় দিলেন। সত্তরের উপর বয়স ; এই বার্দ্ধক্যেও সেক্সপীয়র সাহিত্য মন্থনের নিমিত্ত কি অপরিসীম আগ্রহ এবং পরিশ্রম! আচার্যদেব 'ক্যালকাটা রিভিয়ু'তে যতদূর স্মরণ হয় তের-চৌদ্দটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রতিটি প্রবন্ধেই তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাই। যখন পড়িতাম, মনে হইত এসব অমূল্য তথ্যবহুল সারগর্ভ প্রবন্ধ ছেলেদের জন্য নয়। ছেলেদের যাঁহারা অধ্যাপনা করেন, তাঁহাদেরই নিমিত্ত। সেক্সপীয়র-পাঠক ও পাঠিকাদের এগুলি সত্যিকার দিগ্‌দর্শন-স্বরূপ। আজকাল ইংরেজীর বড় অনাদর ; তথাপি কোন উদ্যোগী প্রকাশক এগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলে শিক্ষার একটি দিকে বিশেষ উপকার করিবেন।

ভারতের রাজনৈতিক আকাশ তমসাচ্ছন্ন। ইহার মধ্যেই সর্ব্ববিধ রচনাত্মক বা গঠনমূলক কর্মে আচার্যদেব লিপ্ত রহিয়াছেন। খাদি প্রতিষ্ঠান, হরিজন আন্দোলন, সঙ্কটত্রাণ সমিতি সকলের সঙ্গেই তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ। বেঙ্গল কেমিক্যালের তিনিই তো প্রাণ। কতবার ইহার কর্ণধারদের সঙ্গে তাঁহাকে চিন্তাপূর্ণ গভীর আলোচনায় নিমগ্ন থাকিতে দেখিয়াছি। অন্যান্য নূতন নূতন শিল্প বা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগীরা তাঁহার উপদেশ যাজ্ঞা করিতে আসিতেন। ক্রমে প্রফুল্লচন্দ্র শিক্ষাব্রত হইতে সম্পূর্ণ অবসর লইলেন। কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার সজাগ দৃষ্টি ছিল। যখনই তাঁহার পরামর্শ প্রয়োজন হইত, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহা দিতেন ; এবং তাঁহার কথা কার্য্যকর হইল কিনা সে বিষয়ে খোঁজখবর লইতেন। তিনি শিক্ষাব্রত হইতে অবসর লইয়াছেন বটে, কিন্তু অধ্যয়ন অনুধ্যান তাঁহার অব্যাহত ছিল। 'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ'—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মধ্যে মূর্ত্ত দেখিয়াছি। তাঁহার বাংলা আত্মজীবনী তখন প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি হইতে

তাঁহার পিতৃদেব সম্পর্কিত অংশটি সাগ্রহে আমাকে দেখাইলেন। এবং স্বহস্তে নাম স্বাক্ষর করিয়া আমাকে একখণ্ড দিলেন। ঠিক তারিখ মনে নাই, তবে এই দিনটিও আমার নিকট অত্যন্ত গৌরবের।

প্রফুল্লচন্দ্র সত্যকার দরদী ছিলেন। বাঙালী শিল্প ব্যবসায়ে পশ্চাৎপদ, এই বিষয়টি তাঁহাকে কতই না দুঃখ দিয়াছে। পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি। এখানে আর একটু বলি। তিনি আলাপন কালে বলিতেন, বক্তৃতায়ও অনেকবার বলিয়াছেন যে, আমরা কতই না বুদ্ধি রাখি; ইহার শতাংশের একাংশও যদি ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রয়োগ করিতাম তাহা হইলে বাংলা দেশের চেহারা কবে ফিরিয়া যাইত। আমরা ক্রমশঃ অলস, জড়, বাবু হইয়া পড়িতেছি। হাতেকলমে কাজ করিতে আমরা চাই না। কাপড়ে কালি মাখিতে হইবে, গায়ে ধূলা কাদা লাগিবে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলে চলিবে না। সব কাজই শিক্ষা সাপেক্ষ। মুদিখানার কাজেও শিক্ষানবিশি আবশ্যক। আমরা কোন কিছুতেই শিক্ষানবিশ হইতে চাই না। যেমন অন্য কাজে, তেমনি ব্যবসায়েও শিক্ষানবিশি একান্ত প্রয়োজন।

আমরা কিছু তৈরি করিবার শ্রম স্বীকার করিতে চাই না, একেবারে বাড়াভাতে ভাগ বসাইতে চাই। এইরূপ কত কথাই না তাঁহার মুখে শুনিতাম। এইসব কথা বলিতে বলিতে জাতির প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম দরদ এবং প্রীতি যেন উছলিয়া পড়িত।

কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁহার নিকট ঘন ঘন যাইতে পারি নাই এখন অবকাশ জুটিল। আবার প্রফুল্লচন্দ্র-সকাশে গিয়া নানা কথা শুনিতে লাগিলাম, তাঁহার সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় যোগ দেওয়া সম্ভব হইল। আর একটি ব্যাপারেও প্রায় যাইতে হইত। তখন আমি 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' রচনায় লিপ্ত। আচার্যদেব ভূমিকা লিখিবেন, কাজেই ফর্মা ছাপা হইলে তাঁহাকে দিয়া আসিতাম। তিনি একে একে সব পড়াইয়া লইলেন। জাতি যখন আত্মসচেতন হইয়া উঠে তখন ভাব প্রকাশের জন্য সাহিত্যকেই আশ্রয় করে। ইংলণ্ডে এইরূপ হইয়াছিল, বাংলা দেশেও হইয়াছে। ভূমিকার উপসংহারে তিনি এই কথার উপরই জোর দিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের মাত্র একখানি মামুলি ফটো—রোগাপট্‌কা চেহারা। পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করার জন্য তাঁহার নিকট একখানি ফটো চাহিলে, তিনি 'ষ্টেটস্‌ম্যান' কর্তৃক গৃহীত ছবিখানির কথা উল্লেখ করিলেন। তাঁহার ইংরেজী আত্মজীবনী বাহির হইয়াছে।

ষ্টেটস্‌ম্যান-এ বইখানি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হইবে, কিন্তু একখানি ভাল ছবি যে দরকার। প্রফুল্লচন্দ্র এই মর্মে বলিলেন, "তৈল মাখিয়াছি, স্নানের ঘরে ঢুকিব; ঠিক সেই সময় ফটোগ্রাফার আসিল, আর ঐ অবস্থায় ফটো তুলিয়া লইল। এখানি বড় ভাল উঠিয়াছে।" এই ফটোখানি সংগ্রহ করিয়া পুস্তকে সন্নিবেশিত করিলাম।

'মুক্তির সন্ধানে ভারত' বাহির হইল। প্রথমেই প্রফুল্লচন্দ্রকে দিব ভাবিয়া সায়ান্স কলেজে গেলাম। তখনও তিনি বিশ্রামরত। কিছু সময় পরে আসিয়া দেখি আচার্যদেব উঠিয়াছেন। তাঁহার হস্তে বইখানি দিবামাত্রই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সেই আনন্দ-মিশ্রিত মুখচ্ছবি এখনও ভুলিতে পারি নাই। আচার্যদেবের নিকট হইতে স্নেহপ্রীতি লাভ করিয়াছি যথেষ্ট। এখানে তাহার কিঞ্চিৎমাত্র উল্লেখ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

মেঘনাদ সাহা

ডক্টর মেঘনাদ সাহার সঙ্গে আমার বয়সের ব্যবধান—দশ বৎসর। ব্যবধান অল্প হইলেও তাঁহার খ্যাতির কথা ছেলেবেলাতেই শুনিতে পাই। তাঁহার একটি রচনার কথা মনে গাঁথিয়া রহিয়াছে, কারণ তখন ইহা মনকে খুবই ধাক্কা দিয়াছিল। আমরা জানিতাম, প্যারালাল বা সমান্তরাল লাইনগুলি কখন কোথাও মিলিত হয় না। ডক্টর সাহার এই প্রবন্ধ হইতে জানিলাম, ইহাও সম্ভব। বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের একটি মতবাদ বুঝাইতে গিয়া তিনি এই কথাই বলিয়াছিলেন। যতদূর মনে হয়, ১৯২১ সনে প্রবাসীর এক সংখ্যায় এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। তখন আমরা পল্লীগ্রামের স্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়ি।

তদবধি ডক্টর সাহার কথা আগ্রহ সহকারে শুনিতাম, পড়িতাম। ডক্টর সাহা কলিকাতায় প্রথম যুব-সম্মেলনের আয়োজন করিয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গ প্লাবনের সময় আর্তত্রাণে তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রেরণায় ডক্টর সাহা প্রমুখ ব্যক্তিগণ যেমন বিজ্ঞান সাধনায় তৎপর হন তেমনি সমাজ সেবায়ও মন দেন। ইহার পরে ডক্টর সাহা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মগ্রহণ করিয়া চলিয়া যান। সেখানে দীর্ঘদিন তিনি পদার্থ বিদ্যার প্রধান অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের হাতার মধ্যে ছাত্রদের অধ্যাপনায় এবং পরীক্ষণাগারে গবেষণাকার্য পরিচালনায় তাঁহার সবটুকু সময় কাটিত না। দেশের শিল্পোন্নতিতে বিজ্ঞানের সুষ্ঠু প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ক্রমে যুক্ত হইয়া পড়িলেন। এলাহাবাদ অবস্থান কালেই তাঁহার সঙ্গে পত্রের মাধ্যমে আমার পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটে। একদিন প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দবাবু আমাদের সম্পাদকীয় আপিস ঘরে আসিয়া আমাকে ডঃ সাহার একখানি পত্র দেখাইলেন এবং আমাকে বলিলেন যে, পত্রখানি তাঁহাকে লেখা বটে, কিন্তু উহার লক্ষ্য আমি। তিনি আমাকে কিছু উপদেশ দিয়া পত্রখানি আমায়

দিলেন। পত্রে আমার কথা প্রসঙ্গে প্রথমেই লেখা ছিল, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল নামধেয় একব্যক্তি রাধানাথ শিকদার শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন......... ইত্যাদি।" ডক্টর সাহা পত্রে লিখিয়াছিলেন যে রাধানাথ শিকদার প্রবন্ধটি ইংরেজী করিয়া দিলে বাঙ্গালোরের "সায়ানটিফিক জার্ণালে" অথবা লণ্ডনের 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া দিতে পারেন।

বড় আনন্দের কথা! অবিলম্বে ইংরেজীতে "রাধানাথ শিকদার" লিখিয়া ডক্টর সাহাকে পাঠাইয়া দিলাম। মাসখানেকের মধ্যে তাঁহাকে পত্র লিখিয়াও উত্তর পাই নাই। তখন তিনি শিল্পকর্ম ব্যপদেশে এলাহাবাদের বাহিরে ছিলেন। এই সময় এভারেষ্ট অভিযান এবং বিমান যোগে এভারেষ্ট পরিক্রমার কথা হয়। সময়োপযোগী বলিয়া মডার্ণ রিভিউতে ছাপাইবার কথা তাঁকে জানাইলাম। পত্রের উত্তরে তিনি লিখিলেন যে আমি যেন মডার্ণ রিভিয়ুতে ইহা সত্বর প্রকাশিত করি। বাস্তবিক পক্ষে "রাধানাথ শিকদার" শীর্ষক আমার রচনা সম্বন্ধে ডক্টর সাহার এইরূপ আগ্রহ আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছিল, যেমন উৎসাহ পাইয়াছিলাম শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের নিকট হইতে। তিনি আমার রচনা "রুস্তমজী কাওয়াসজী" পাঠ করিয়া প্রথম সাক্ষাতেই আমাকে বিস্তর সাধুবাদ করিয়াছিলেন। তখন সবেমাত্র গবেষণাকার্য্যে মন দিয়াছি। এই সময় ইঁহাদের নিকট হইতে উৎসাহ পাইয়া অধিকতর আগ্রহে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলাম। ডক্টর সাহার সঙ্গে আমার পত্রালাপ চলিত। হয়ত খুঁজিলে এখনও তাঁহার দুই-একখানি পত্র পাইব।

ডক্টর সাহার উৎসাহ হইতে আরও একটি বিষয় তখন লক্ষ্য করি. স্বদেশীয় কীর্তিমান পুরুষদের বিস্মৃত বা প্রায় বিস্মৃত গৌরব-গাথা উদ্‌ঘাটনে স্বদেশবাসীদের আত্মপ্রত্যয় বাড়িয়া যায়। এ কার্যে যাঁহারা ব্রতী, তাঁহারা প্রকৃত স্বদেশ প্রেমিক—তাঁহার পত্রাদি হইতে এই মনোভাব জানিতে পারিলাম। ডক্টর সাহা নিজেও যে ছিলেন সত্যিকার স্বদেশ-ভক্ত বৈজ্ঞানিক। এই প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার কথা মনে পড়ে। তিনি সাহিত্যসাধক দীনেশচন্দ্র সেনের ইংরেজীতে লেখা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সংশোধন করিয়া দিতেছিলেন। একদিন নিবেদিতা দীনেশচন্দ্রকে বলেন "দীনেশবাবু আপনি জানেন না যে আপনি স্বদেশের কি উপকার করিয়া যাইতেছেন। আপনি সত্য সত্যই একজন প্যাট্রিয়ট।"

'রাধানাথ' প্রসঙ্গের পর ডক্টর সাহার সঙ্গে আমার পত্রালাপ বন্ধ ছিল।

আমাদের 'প্রবাসী' 'মডার্ণ রিভিউ'র সঙ্গে ডক্টর সাহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বিশেষতঃ সম্পাদক রামানন্দবাবু তাঁহার বড়ই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। শেষবার যখন তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তখনও তিনি 'প্রবাসী' 'মডার্ণ রিভিউ' এর কথা পাড়িলেন এবং এক স্থানে বলিলেন; "I have a great regard for that old man Ramananda Babu।" দূর হইতে ডক্টর সাহার স্বদেশ-গঠনের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতাম। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের সায়ান্স এসোসিয়েশান বা বিজ্ঞান-সভাকে ব্যক্তি-বিশেষের কবল-মুক্ত করিবার যে প্রয়াস চলে তাহার মধ্যে ডক্টর সাহার বিশেষ হাত ছিল। পরবর্ত্তী কালে এই সভাটিকে তিনি একটি প্রথম শ্রেণীর গবেষণাগারে পরিণত করিতে কত যত্ন লইয়াছিলেন তাহা শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই অবগত আছেন। বৌবাজারের ছোট চত্বর হইতে যাদবপুরের বিরাট ভবনে লইয়া যাওয়ার সুযোগ দিয়াছিলেন তিনি। ভারত-রাষ্ট্র সায়েন্স এসোসিয়েসনের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। নব-রূপায়ণের পর, প্রথম ডিরেক্টর হইলেন ডক্টর মেঘনাদ সাহা।

ডক্টর সাহা কলিকাতা ইউনিভার্সিটি সায়ান্স কলেজে পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক হইয়া আসিয়াছেন। কবে আসিয়াছেন ঠিক খবর জানিতাম না। আমি তখন নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। "মুক্তির সন্ধানে ভারত" মুদ্রণ কালে প্রায়ই সায়ান্স কলেজে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নিকট যাইতাম। তখন ডক্টর সাহার সায়ান্স কলেজে যোগদানের কথা নিশ্চয়ই শুনিয়া থাকিব। 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' বাহির হইবার পর ডঃ মেঘনাদ সাহাকে ইহার একখণ্ড দিতে গেলাম। তিনি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বইখানি দেখিলেন, এবং তখনই বলিলেন "আপনি ইহার ইংরেজী করুন না কেন"? এত বড় বই, বাংলা দেশে ইহার ইংরেজি অনুবাদ কে ছাপিবে বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করায় তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "আপনি ইংরেজী করুন, আমি ছাপাইবার ব্যবস্থা করিব।" তখন বা কয়েক বৎসর পরেও বুঝি নাই ডক্টর সাহার প্রস্তাবের গুরুত্ব কতখানি। একখানি সুমুদ্রিত তথ্যভিত্তিক স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস কোনও বঙ্গ সন্তান কর্তৃক ইংরেজীতে রচিত ও প্রচারিত হইলে বাংলার দানের কথা বর্ত্তমানে কার্যত এমনভাবে অবজ্ঞাত ও উপহসিত হইত না। আমাদের অতিরিক্ত বাংলা-প্রীতি, আজিকার নূতন পরিবেশে যেন "গুণ হইয়া দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়।"

ইহার অল্পদিন পরে, বৈকালের দিকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নিকট বসিয়া আছি এমন সময় ডক্টর সাহা ঘরে ঢুকিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র আমাকে দেখাইয়া বলিলেন "মেঘনাদ, এঁকে জান?" তাঁহার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বলিলেন, "এঁর নাম যোগেশচন্দ্র বাগল।" নিজের কথা বলিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছি। তথাপি বলি যে, আচার্য রায় আমাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। ডক্টর সাহার দৃষ্টিও যেন ঐ দিন হইতে আমার দিকে বেশী করিয়া পড়িল। তিনি মডার্ণ রিভিয়ুতে "মুক্তির সন্ধানে ভারতের" সমালোচনা লিখিলেন।

ইহার পর ডক্টর সাহার সঙ্গে যোগাযোগ আর ছিন্ন হইতে দি' নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইলেন। তিনি বহুপূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের যশোহর অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রস্তাব উত্থাপন করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তরুণ মেঘনাদ ইহার সমর্থন করিয়াছিলেন। আমার অনুরোধে ডক্টর সাহা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আজীবন সদস্য হইলেন। পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্কিম রচনাবলী, মধুসূদন রচনাবলী এবং আরও বহু গ্রন্থ কিনিয়া লন। যখনই তাঁহার সঙ্গে দেখা হইয়াছে তখনই তিনি পরিষদ সম্পর্কে খোঁজখবর লইতেন। বুঝিতাম বাঙ্গালীর জাতীয় প্রতিষ্ঠান 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের' প্রতি তাঁহার কত দরদ। খাপছাড়া কিছু কিছু বাংলা প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছেন মাত্র। কোনও বাংলা পুস্তকাদি তিনি লেখেন নাই বা প্রকাশিত করেন নাই। এ কারণ কোনও সাহিত্য সম্মেলনে পৌরোহিত্য করায় তাঁহার বিশেষ সঙ্কোচ ছিল। কিন্তু এই সঙ্কোচ কাটাইয়া উঠিতে পারিলে তিনি বেশ পরিষ্কার প্রাঞ্জল বাংলায় তাঁহার বক্তব্য পেশ করিতে পারিতেন। ইহার প্রমাণ স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

তখন দ্বিতীয় মহাসমর প্রায় শেষ হয়-হয়। প্রথম শ্রেণীর একদল ভারতীয় বিজ্ঞানী আহূত হইয়া বৃটেন ও আমেরিকায় দেশ পুনর্গঠন ব্যাপার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য গমন করেন। বলাবাহুল্য ডক্টর সাহাও এই দলে ছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া ডক্টর সাহা সায়ান্স কলেজে এবং মনে হয় অন্যত্রও টেনেসী ভ্যালির পুনর্জ্জীবন লাভ সম্বন্ধে বক্তৃতার মাধ্যমে আমাদিগকে সচেতন করিয়া দিতে লাগিলেন। মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদ হইতে লোক আসিলেন, তথাকার সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতি স্থির করিবার জন্য। এই প্রতিনিধিকে লইয়া ডক্টর সাহার নিকটে গেলাম। সাহিত্য সম্মেলনে

সভাপতি হইবার অনুরোধ জানাইতেই তিনি অতিমাত্রায় বিস্ময় বোধ করিলেন। এবং বাংলা সাহিত্যের সেবায় তাঁহার মোটেই সময় হয় নাই ইত্যাদি বলিয়া ভয়ানক আপত্তি তুলিলেন। আমি বাধা দিয়া বলিলাম, টেনেসী ভ্যালীতে যাহা দেখিয়া আসিয়াছেন—মরুভূমি মানুষের অধ্যবসায়ে কিরূপে শস্য শ্যামল জনপদে পরিণত হইয়াছে তাহাই সভাক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় পরিবেশন করিবেন—আর ইহাই হইবে আজিকার নূতন সাহিত্য। কথাটি ডক্টর সাহার মনে ধরিল। তিনি অগত্যা রাজী হইলেন। যাতায়াতের সময় এবং লইয়া যাইবার ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে প্রতিনিধি মহাশয় ভার লইলেন।

আমিও নিমন্ত্রিত হইয়া মেদিনীপুরে যাই। মূল সভাপতি ডক্টর মেঘনাদ সাহা, সাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব। ডক্টর সাহা আসিয়াছেন; বিদ্যাসাগর ভবনে সম্মেলন ক্ষেত্র। লোক যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তিল ধারণের স্থান ছিল না। সভাপতি রূপে ডক্টর সাহা টেনেসি ভ্যালী সম্পর্কে দেড়ঘণ্টার উপর বক্তৃতা দিলেন। তৃতীয় বা শেষ দিনেও সামান্য কিছু বলিয়াছিলেন কিন্তু প্রথম দিনের বক্তৃতা শ্রোতাদের মনে নূতন ভাবনার সঞ্চার করিল। টেনেসি ভ্যালী একটি মরুভূমি; এখানে অভিনব ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশলে খাল ও দীর্ঘিকা খনন করা হয়, জল সিঞ্চনের সুব্যবস্থা করা হয় এবং এই শত শত মাইল ব্যাপী ভূখণ্ডকে প্রকৃত শ্যাম সবুজ গাছপালা তৃণ শস্যাদিতে পূর্ণ করিয়া তোলা হইয়াছে। অতি সরল অথচ প্রাঞ্জল ভাষায় ডক্টর সাহা জনমণ্ডলীর নিকট বলিয়া চলিলেন। ডক্টর সাহার ইংরেজী বা বাংলা বক্তৃতা ইতিপূর্বে শুনি নাই। তাঁহাকে বাগ্মীর পর্য্যায়ে ফেলা যায় না বটে তবে তাঁহার অনর্গল বাধাবন্ধহীন ভাষণ শুনিয়া বিশেষ তৃপ্তি পাইলাম, জ্ঞান লাভও করিয়াছি বিস্তর। সম্মেলন উপলক্ষ্যে তিন দিন আমরা মেদিনীপুরে ছিলাম। নিকট হইতে অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে তাঁহাকে দেখিবার সুযোগ এই সময় পাই। অত বড় বৈজ্ঞানিক কিন্তু অনাড়ম্বর, আলাপ-আলোচনায় ছিলেন এত মধুর, পোষাকে-পরিচ্ছদে এত সাদাসিধা।

মহাসমরের পরিসমাপ্তি ঘটিল। দিকে দিকে বিবিধ সমস্যা দেখা দিল। ইংলণ্ড বিজয়ী হইয়াও বিদ্ধস্ত। স্বভাবতঃই আত্মরক্ষা করিবার ব্যবস্থা লইয়া ব্যস্ত, এদিকে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা না দিলেও চলিবে না, তবে কি

আকারে দেওয়া হইবে তাহাই প্রশ্ন। বিদায় কালেও ইংরেজ এক অভিনব ভেদনীতির খেলা খেলিয়া গেল, যাহার ফলে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুইটি স্বতন্ত্ররাষ্ট্রে পরিণত হইল। বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ বিজ্ঞানের সাধনার সম্ভাবনাগুলিকে ভারতের জলমাটিতে রূপায়িত করিতে অগ্রসর হন। সায়ান্স কলেজ নব-রূপায়ন প্রচেষ্টার কেন্দ্রস্থল হইয়াছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই নব-রূপায়ন ত্বরান্বিত হইতে থাকে। বিগত মহাসমরে এ্যাটম বা পরমাণু-উদ্ভূত শক্তিকে দেখা যায় যুদ্ধে। এমনকি যুদ্ধ পরিসমাপ্তিতে ইহা কার্য্যকরী হইয়াছে। এই পরমাণু আজিকার মানবজাতির কল্যাণ কর্মেও তো পুরোপুরি লাগানো যায়। ধ্বংসাত্মক দিক্ বর্জন করিয়া পরমাণু শক্তির এই রচনাত্মক কল্যাণময় শক্তিকে দেখিবার জন্য বিশ্ববিজ্ঞানীগণ উদ্‌গ্রীব হইলেন। ভারবর্ষেও এই নিমিত্ত প্রথম উদ্যোগী হইলেন ডক্টর মেঘনাদ সাহা। যুদ্ধের মধ্যেই তাঁহার নেতৃত্বে "নিউক্লিয়ার ফিজিক্স" পরীক্ষণের কাজ সুরু হইয়াছিল। স্বাধীনতা লাভের পর তিনি ইহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে তৎপর হইলেন। কলিকাতা সায়ান্স কলেজে নূতন বহুমূল্য যন্ত্রাদি বসাইয়া এই বিভাগে পরীক্ষা কার্যের সূত্রপাত হইল। ডক্টর সাহা এই সকল কার্যে একেবারে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন।

দেশ-বিভাগ-ভিত্তিক স্বাধীনতা লাভের পর হইতেই পূর্ববঙ্গবাসীদের অবস্থা দুর্গতির শেষ সীমায় গিয়া পৌছিতে লাগিল। দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে উদ্বাস্তু সমস্যা ক্রমে জটিল হইয়া পড়ে। লক্ষ লক্ষ নর-নারীশিশু পিতৃ-পিতামহের ভিটামাটি ছাড়িয়া পশ্চিমবঙ্গে ভারতরাষ্ট্রে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইল। অগণিত মানুষের এই দুর্গতির দিনে ডক্টর সাহা বিজ্ঞানের পরীক্ষণাগারে আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি পূর্ববঙ্গ হইতে আগত জনসমষ্টি পরিসংখ্যান সংগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তিকা প্রচারিত করিলেন। উদ্বাস্তু অধ্যুসিত অঞ্চলসমূহ বার বার পরিক্রমা করিয়া তাহাদের অবস্থা নিজে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার আহ্বান আসিল পূর্ববঙ্গাগত অধিবাসীদের পরিসংখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সামাজিক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কাঠামো বিশ্লেষণ করিয়া একটি নাতিবৃহৎ বই লিখিবার জন্য। এই উদ্বাস্তু সমস্যা হইতেই বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ ক্রমে রাজনৈতিক মেঘনাদ হইয়া উঠিলেন। বহু বন্ধুর নিকট তাঁহার নিন্দা প্রশংসা শুনিয়াছি। হয়ত নিন্দাই শুনিয়াছি বেশী। মানব দরদী মেঘনাদকে জানিলে

হয়ত তাঁহারা এরূপ সমালোচনা করিতে অগ্রসর হইতেন না। মেঘনাদ পার্লামেণ্টের সদস্য হইলেন, মুখ্যতঃ উদ্বাস্তু সমস্যার সুরাহা করিবার নিমিত্ত। কিন্তু তিনি কখনও তাঁহার নিজের "ধর্ম" ভুলেন নাই। সরকারের বিভিন্ন বিজ্ঞান-ভিত্তিক কার্যে তিনি বরাবর সাহায্যই করিয়া গিয়াছেন। দিল্লীতে পথিমধ্যে তাঁহার মৃত্যুই তাহা প্রমাণ করিয়া দেয়।

ডঃ সাহা বিবিধ কাজকর্মে খুবই ব্যস্ত। কলিকাতা হইতে প্রায়ই দূরে থাকেন বলিয়া তেমন আর দেখা সাক্ষাৎ হইত না। তবে পরপর যে তিনটি ক্ষেত্রে তাঁহার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হয় তাহা এখন বলিতেছি। স্বাধীনতার পর ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর নামকরণ হয়—ন্যাশনাল লাইব্রেরী। এসপ্ল্যানেড হইতে ইহা বেল-ভেডিয়ারে প্রকৃতির রমণীয় প্রশান্ত পরিবেশের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে লাইব্রেরীর উদ্বোধন হইল কিছুকাল পরে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইহা উদ্বোধন করেন। দ্বিতলের সুদীর্ঘ হল-ঘরে সভা হইল। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিদ্বজ্জন সভায় উপস্থিত ছিলেন। ডক্টর সাহাকে দেখিয়া কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিলাম। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "একটা কথা অনেক দিন ধরিয়া ভাবিতেছি। আমাদের দেশের মধ্যযুগীয় অবস্থা কাটাইয়া আমরা পাশ্চাত্ত্যের সংস্রবে আসি—ইহার একখানি ইতিহাস লিখিতে পারেন কি? আপনি হাত দিলে নিশ্চয়ই পারিবেন।" কি জানি কেন, আমার সম্বন্ধে ডক্টর সাহার একটি ভাল ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল। ইহার প্রমাণ আরো পাইয়াছি।

দ্বিতীয় দিন ভূকৈলাসে। খিদিরপুর ভূকৈলাসের ঘোষাল পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা দানবীর উদারচেতা মানব-হিতৈষি জয়নারায়ণ ঘোষালের স্মৃতি-সভা। ডক্টর মেঘনাদ সাহা সভাপতি; আমাকে উদ্যোক্তারা প্রধান অতিথি করিয়া লইয়া গিয়াছেন। যথাসময় ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষালের অপূর্ব মহিমময় কীর্ত্তিসমূহের কথা বিবৃত করিলাম। ডক্টর সাহাও সময়োচিত একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। সভা শেষে আমরা পাশাপাশি বসিলাম। কিছু জলযোগও হইল। ডক্টর সাহা বিশেষ কিছু গ্রহণ করিলেন না। তিনি কিন্তু পুরাতন কথা ভুলেন নাই। আবার সেই সামাজিক বিবর্ত্তনের ইতিহাসের কথা উত্থাপন করিলেন। বাংলাদেশে গত দুইশত বৎসরে সামাজিক অদল-বদল হইয়াছে আশ্চর্য রকমের। দুইশত বৎসরের পূর্বেকার কোন ব্যক্তি যদি এখন সশরীরে আবির্ভূত হন তাহা

হইলে সমাজের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া তাঁহার তাক লাগিয়া যাইবে; নিশ্চয়ই ভাবিবেন, হয় স্বর্গে নয় নরকে আসিয়া পৌঁছিলাম। কখনও অর্থনীতি, কখনও ছোটবড় বিদ্রোহ, বিপ্লব সামাজিক বিবর্তনে রসদ যোগায়। তথ্যাদির ভিত্তিতে এই সব ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারিলে তবে বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনা সার্থক হইতে পারে। ডক্টর সাহা অল্প সময়ের মধ্যে এত কথা বলেন নাই বটে, তবে তিনি এই সামাজিক ইতিহাস রচনার ভার আমাকে গ্রহণ করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। বুঝিলাম আমার সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা দৃঢ়তর হইয়াছে।

তৃতীয় বিষয়টি লইয়া তাঁহার সঙ্গে আমার শেষ সংস্রব। আর এই কথা স্মরণ করিয়া মনে আজ যুগপৎ দুঃখ ও সুখ অনুভব করিতেছি। ডক্টর কালিদাস নাগের আগ্রহাতিশয়ে আমি জামসেদপুর লৌহ-খনির আবিষ্কর্তা প্রমথনাথ বসুর জীবনী লেখার ভার গ্রহণ করি। প্রমথনাথ বৈজ্ঞানিক, এবং স্বদেশের হিতকল্পে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। আমার এই দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে ঊনবিংশ শতাব্দির শেষ কুড়ি বৎসর এবং বিংশ শতাব্দির প্রথম ত্রিশ বৎসর এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালীর চিত্তোন্মেষে যে সব মনীষী প্রযত্ন লইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রমথনাথ বসুর স্থান অতি উচ্চে। বাস্তবিকই তিনি চিন্তাবিদ ছিলেন। ইহা তাঁহার জীবন ও কর্ম আলোচনা করিতে গিয়া বিশেষভাবে উপলব্ধি করিলাম। জামসেদপুর লৌহখনির আবিষ্কর্তা বলিয়া সাধারণের নিকট তাঁহার প্রসিদ্ধি। বৈজ্ঞানিকপ্রবর সমাজ-কল্যাণকামী মেঘনাদের চিত্তে প্রমথনাথ যে শ্রদ্ধা ভক্তির উদ্রেক করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি? প্রমথনাথের জীবনী রচনা কালে তাঁহার জ্যেষ্ঠাকন্যার আগ্রহ উৎসাহ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। বস্তুত তাঁহারই চেষ্টা-উদ্যোগে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছিল। বই লেখা শেষ হইল। কিন্তু ভূমিকা কাহাকে দিয়া লিখাইব। প্রমথনাথ মুখ্যতঃ বৈজ্ঞানিক, কাজেই কোনো বৈজ্ঞানিককে দিয়া ভূমিকা লিখাইলে ভাল হয়। ডক্টর সাহা তখন পার্লামেণ্টে বিরোধী-দলভুক্ত। প্রমথনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীযুক্তা সুষমা সেন কংগ্রেস পক্ষে পার্লামেণ্ট সদস্য। কিন্তু এক্ষেত্রে আমার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে তাঁহার আপত্তি হইল না। আগে জানিতাম না ডক্টর সাহা প্রমথনাথের জীবনী প্রকাশের বিশেষ উৎসাহী। শ্রীযুক্তা সুষমা সেন .তখন ডক্টর সাহার আগ্রহাতিশয়ের কথা আমাকে বলিলেন, আরও বলিলেন, "দেখুন, আপনি

বাবার জীবনী লেখার ভার নিয়েছেন জেনে ডঃ সাহা বলেছিলেন, তবে এবার প্রমথনাথের জীবনী নিশ্চয়ই বার হবে।"

বই লেখা শেষ হইল। ডক্টর সাহা কলিকাতায় আসিয়াছেন। আমি সায়ান্স কলেজে পুস্তকখানির পাণ্ডুলিপি লইয়া গেলাম। পাণ্ডুলিপি তিনি আগ্রহের সঙ্গে দেখিলেন। তাহার 'Foreward' বা ভূমিকা কয়েকদিন পরে আমাকে দিলেন। এই দ্বিতীয় দিন তিনি খুব ব্যস্ত ছিলেন। তিনি আমাকে পার্লামেণ্ট সদস্য, শ্রীযুক্ত ত্রিদিব চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। "সালজারের জেলে সতর মাস" লিখিয়া ত্রিদিব বাবু বর্তমানে সাধারণ শিক্ষিতের নিকটও প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছেন। অন্য টেবিলে—যেখানে আমি বসিয়া ছিলাম, আসিয়া তিনি ভূমিকাটি দিলেন। ভূমিকার শেষে তিনি আমার সম্বন্ধে বেশ দু-চার কথা লিখিয়া দেন। পুস্তক প্রকাশের পর তাঁহাকে নিজ হস্তে বইখানি দিতে যাই। কে জানিত মরধামে এই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ। ডক্টর মেঘনাদ সাহার বাড়ীতে কখনও যাই নাই, আমাদের মনে হইত—সায়ান্স কলেজই তাঁহার ঘরবাড়ী।

আচার্য যদুনাথ সরকার—ডক্টর সাহার মানব কল্যাণকর কার্যের বিশেষ সমজদার ছিলেন। অসুস্থতার কথা জানিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাই নাই। একদিন কাগজে পড়িলাম, তিনি ডক্টর সাহার স্মৃতি-সভায় পৌরোহিত্য করিয়াছেন। পরে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। কথা প্রসঙ্গে ডক্টর সাহার স্মৃতি-সভার কথা উঠিল! আচার্য যদুনাথ বলিলেন, "আমি এখন বৃদ্ধ হয়েছি। সাধারণ সভা-সমিতিতে যাওয়া একেবারেই কমিয়ে দিয়েছি। তবে মেঘনাদের স্মৃতিসভায় না গিয়ে পারিনি। দিল্লীতে যেদিন তার মৃত্যু হয় তার পূর্বদিনের পূর্বদিন সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিল। তখন কি বলেছিল জান? স্বাধীনতা লাভ করতে গিয়ে আমরা পূর্ববঙ্গ হারিয়েছি, এখন বাংলা-বিহার মার্জারের দরুণ পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বও ধুয়ে মুছে যাবে। নিতান্ত কর্তব্য বোধেই মেঘনাদের স্মৃতি সভায় গিয়েছিলাম।" বিজ্ঞান-সাধক, মানবহিতব্রতী ডক্টর সাহার সান্নিধ্য লাভ করিয়া জীবন ধন্য হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ

ঠিক চল্লিশ বৎসর আগের কথা। ১৯১৭ সাল, গ্রীষ্মের ছুটি হইয়া গিয়াছে। দিদির বাড়ীতে যাইব। ষ্টীমার বা নৌকা যোগে যাইতে হয়, হাঁটা-পথও আছে। কিন্তু কিশোরের পক্ষে একাকী হাঁটা-পথে যাওয়া প্রশস্ত নয়। আমাদের পল্লীর সন্নিকটস্থ ষ্টেশন হইতে ষ্টীমারে উঠিলাম খুব ভোরে। ষ্টিমারের দ্বিতলে উঠিলাম। তখন নবারুণ সবেমাত্র সোনালী-আলো বিকিরণ করিতেছিল। দ্বিতলে দীর্ঘকায় লম্বাকোট পরিহিত এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখিলাম। তিনি সকলেরই যেন দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিলেন। বালসুলভ চপলতাবশত, তাঁহার পাশে গিয়া বসিলাম। তিনি অন্য কাহারও কাহারও সঙ্গে আলাপে রত ছিলেন, তাঁহাকে বলিতে শুনিলাম—"রবিঠাকুর নাইটহুড্ ত্যাগ করেছেন, একি সাধে করেছেন?" নিকট আত্মীয়-আত্মীয়াদের খুবই হয়রাণি হওয়ায় তিনি 'সার্' উপাধি ছেড়েছেন।' আসল বক্তব্যটি বুঝা গেলেও বক্তার বলার ভঙ্গী ও নিন্দাবাদের ঔৎসুক্য কেমন যেন বেসুরা ঠেকিল। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমরা ছেলের দল তখনই বেশ একটা উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেছিলাম। এই সময় ঐরূপ উদ্দেশ্যমূলক উক্তিতে মনে বড় খটকা লাগিয়া গেল। ইহা মনে এতই গভীর রেখাপাত করে যে, দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পরেও ঐ ভদ্রলোকের কথা আজও ভুলিতে পারি নাই।

শক্তিমানের সর্বত্রই একটি বিরোধী দল থাকে। সে রাজনীতির ক্ষেত্রই বা কি, সাহিত্য ক্ষেত্রই বা কি। রবীন্দ্রনাথের বিরোধী দল ছিল। কলিকাতা হইতে দু'শ মাইল দূরে পল্লীগ্রামে থাকিয়াও তাহার কতকটা আভাস পাইতাম। বড়দের কাহারও কাহারও মুখে শুনিতাম রবিঠাকুরের কবিতা পড়িয়া বুঝা যায় না. মনে মনে প্রশ্ন করিতাম একথা কি ঠিক? কৈ, আমিও তো পারি, বুঝিতে তো বেশী কষ্ট হয় না। বলাবাহুল্য তাঁহার ভাবসমৃদ্ধ বড় বড় কবিতা পাঠের সুযোগ তখনও আমাদের হয় নাই। কথা ও কাহিনী, নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলী—এই রকম হয়ত আর কিছু কিছু তখন পড়িতে পাইয়াছি। 'দুই বিঘা জমি' পড়িয়া বুঝিতে কষ্ট হয় কি? "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার

নয়" যে কতবার পড়িয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। 'কত অজানারে জানাইলে তুমি কত ঘরে দিলে ঠাঁই।' এমন সহজ শব্দের গাঁথুনি কোথায় পাইব? 'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা'—বুঝিতে কষ্ট হইবে কেন? এই সকল কবিতার অন্তর্নিহিত নিগূঢ় ভাব হৃদ্গত হইবার বয়স তখনও আমাদের হয় নাই। কিন্তু এমন সহজ সরল শব্দের গাঁথুনি বাঁধুনি বুঝিব না কেন? বড়দের কথার ব্যঞ্জনা বুঝিতাম না। উক্তির প্রতিবাদ করার সাহস আমাদের ছিল না। কিন্তু মনে মনে ইহার ঘোর প্রতিবাদ জানাইতাম, আর রবিঠাকুরের প্রতি আমাদের মন শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিত।

আমরা কৈশোরেই রবীন্দ্রনাথকে আমাদের আপন জন বলিয়া লইতে ও বুঝিতে শিখিয়াছিলাম। তাহার বহুমুখী প্রতিভা ও বিপুল সাহিত্যের সন্ধান আমরা পাই নাই, পাইবার কথাও তখন আমাদের নয়। তবু আমাদের এইরূপ মনে হইত। ঐ সময় রবীন্দ্রনাথ ষাটের কোঠায় পা দেন নাই বটে, কিন্তু বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন বলা চলে। দীর্ঘকাল সাধনা দ্বারা বাঙলা সাহিত্যকে একটি ঐশ্বর্যময়ী রূপ দান করিয়াছেন। গীতাঞ্জলীর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশে বিশ্ববাসী বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে নোবেল পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করেন। যখন ষ্টীমারে ঐ কথা শুনিলাম তাহার প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব হইতেই রবীন্দ্রনাথের পুস্তকাবলী প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। কত পত্র-পত্রিকায় এই চল্লিশ বৎসর যাবৎ কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রকাশিত হইয়াছে। যতদূর জানা যায়, রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রাঙ্কিত "হিন্দু মেলায় উপহার' শীর্ষক কবিতা তাঁহার সপ্ততিবর্ষ পূর্তি উৎসবের প্রাক্কালে অমৃত বাজার পত্রিকা (তখন দ্বিভাষী পত্রিকা ফাইল হইতে উদ্ধার করা হইয়াছিল। কবিতাটি প্রকাশের সময় তাঁহার বয়স ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র। রবীন্দ্রনাথ কত পত্রিকায় কত বিষয় লিখিয়াছেন সে যুগের পত্র-পত্রিকার ফাইল যাঁহারা ঘাঁটিয়াছেন তাঁহারাই জানিতে পারিবেন। 'ভারতী', 'বালক' 'ভারতী ও বালক' 'সাধনা', 'বঙ্গ-দর্শন' (নবপর্য্যায়ে) 'ভাণ্ডার', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও কত পত্র পত্রিকায়ই না তাঁহার লেখা বাহির হইত। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক অর্থে সাংবাদিক ছিলেন না বটে, কিন্তু, সাংবাদিকসুলভ সকল গুণই তাঁহার মধ্যে ছিল। তিনি কোন কোন সময় উক্ত পত্রিকাগুলি সম্পাদনাও করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদনা-নৈপুণ্য এযুগেও আমাদের মুগ্ধ করে।

রবীন্দ্র-যুগের প্রথম পঞ্চাশ বৎসরে বাংলাদেশ ও বাঙালী জীবনের যে অবস্থা ছিল, আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন তাহা অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছে। প্রথম মহাসমরকালে বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর মন নব নব আশা-আকাঙ্ক্ষায় উজ্জীবিত হইয়াছে। এই উজ্জীবন সম-সাময়িক সাহিত্যের মধ্যেও ধরা দিতেছিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী', প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' এবং চিত্তরঞ্জন দাশের 'নারায়ণ' বাঙালীর বল, বাঙালীর আশার কথা প্রতি মাসে ব্যক্ত করিতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথের নব ভাবনা প্রথমোক্ত পত্রিকা দুইখানিতে বিধৃত হইতে থাকে। সার্ আশুতোষের কল্যাণে উচ্চ শিক্ষা শহর ছাড়িয়া পল্লীতে গিয়াও তখন পৌঁছিয়াছে। আমাদের বাল্যকালে দেখিতে দেখিতে কত হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। পল্লী ইংরেজী শিক্ষার কেন্দ্র হইয়া উঠিল। বহু উচ্চ-শিক্ষিত যুবক পল্লী অঞ্চলে পড়ুয়াদের পাঠে মুখর হইয়া উঠিল। যে বিদ্যা বা ভাবনা একদা শহরের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া শুকাইয়া মরিতেছিল তাহা তখন পল্লীর জল মাটির স্পর্শে আবার প্রাণবন্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। আমাদের সেই তথাকথিত অনুন্নত পল্লীতেও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। একটি বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের এখনও তারিফ করি। তাঁহারা স্কুলের পক্ষে 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'সবুজপত্র' প্রভৃতি পত্রিকা লইতে লাগিলেন। নিম্নতম তৃতীয় শ্রেণী হইতে উচ্চতম দশম শ্রেণী পর্যন্ত একক্রমে আট বৎসর একই স্কুলে অধ্যয়ন করি। এই সময়ে আমাদের স্কুলে ঐ সকল পত্র-পত্রিকা যাইত, আর শিক্ষক মহাশয়গণবাদে আমরা ছেলেরাও ঐ সকল পড়িতাম, পড়িয়া আনন্দ পাইতাম।

শুধু তাহাই নয়, একটি বিষয়ে আমরা খুবই উপকৃত হইয়াছি। তাহা হইল সাময়িকপত্রের মাধ্যমে রবীন্দ্র ভাবনার সঙ্গে পরিচিতি। রবীন্দ্রনাথের পক্ষ-প্রতিপক্ষ দাঁড়াইয়াছে তখনই। কিন্তু আমাদের কিশোর মনে ইহা এতটুকুও স্পর্শ করিতে পারে নাই। প্রবাসীর পৃষ্ঠায় প্রতি মাসে রবীন্দ্র-রচনা পাঠ করিতে শুরু করিলাম। 'সবুজপত্র', এক কথায় তো রবীন্দ্র-রচনা-সম্ভারে ভরপূর। 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথের মূল রচনা তো পাইতামই, উপরন্তু 'সবুজপত্র' বা অন্য পত্র পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের যা কিছু রচনা বাহির হইত তাহাও ইহার 'কষ্টি-পাথর' অধ্যায়ে ছাপিয়া দেওয়া হইত। পরে শুনিয়াছি—'সবুজপত্র'-সম্পাদক চৌধুরী মহাশয় অনুযোগ করিতেন—'প্রবাসী'তে সবুজপত্রের রবীন্দ্র-রচনা প্রায় সমুদয়ই পুনর্মুদ্রিত হওয়ায়

ইহার কাটতিতে ভাটা পড়িতেছে। একথার যাথার্থ্য যাচাই করিয়া এখন আর লাভ নাই, প্রয়োজনও দেখি না। তবে একথাটি অতি সত্য যে, একমাত্র 'প্রবাসী' পাঠ করিলে প্রতি-মাসের রবীন্দ্র-রচনা-সম্ভারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হইত। বস্তুতঃ রবীন্দ্র-জীবনের শেষ চল্লিশ বৎসর রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রচারে, 'প্রবাসী' যাহা করিয়াছেন তাহার কোন তুলনাই হয় না। আমরা 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'সবুজ-পত্র' খুবই পড়িতাম; কিন্তু ক্রমে প্রবাসীরই যেন গোড়া হইয়া উঠিলাম। রবীন্দ্র-রচনা অন্য কোথাও তো এত পাওয়া যায় না। সে সময় খুবই পড়িতাম; অনেকটাই হয় ত বুঝিতাম না, তবু পড়িতাম। পরে দেখিয়াছি বার বার অধ্যয়নের ফলে একদা যাহা ছিল অস্পষ্ট, ক্রমে তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

প্রথম মহাসমরকালীন এবং তাহার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে নব ভাবনাকে কত ভাবেই না বিভিন্ন রচনার মধ্যে ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আমাদের স্বদেশী যুগের কথা এখানে বলিতেছি না। তাঁহার 'স্বদেশী সমাজ' এই স্বাধীন যুগেও আমাদের পথিকৃৎ হইয়া আছে। স্বদেশী আন্দোলনকালে রচিত তাঁহার প্রাণ-মাতানো সঙ্গীতগুলি এখনও পাঠ করিলে আমাদের শরীরে শিহরণ জাগায়। "বাংলার মাটি বাংলার জল, বাঙালীর আশা বাঙালীর ভাষা' হৃদয়ের অন্তঃস্থলে স্থান দিতে আমরা এখনও কি উদ্বুদ্ধ হই না? পাবনায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি রূপে রবীন্দ্রনাথ জাতিকে যে রচনাত্মক কর্মের সন্ধান দিয়াছিলেন তাহাও তো আমরা কখনও ভুলিতে পারি না। কিন্তু প্রথম মহাসমরকালে বাঙালীর জীবন, আশা-আকাঙ্ক্ষা যে পদে পদে বিপর্যস্ত ও ব্যাহত হইতেছিল তখন জাতিকে—আশার বাণী শুনাইয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ তখন দিগ্বিজয়ী; নোবল পুরস্কার প্রাপ্তির পরে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে আশার বাণী শুনাইয়া স্বদেশে বাসা বাঁধিয়াছেন। কিন্তু পর-শাসনে স্বদেশীয়দের দুঃখ যে 'নিরবধি' বাড়িয়াই চলিতেছিল। এই সময় রবীন্দ্রনাথ সতেজ লেখনী ধারণ করিয়া গদ্যে-পদ্যে জাতিকে আশার কথা শুনাইতে লাগিলেন। এই অতি সত্য ঘটনাটি আজকাল যেন আমাদের চোখ এড়াইয়া যাইতেছে।

রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ', 'ছোট ও বড়', 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম', আপনারা হয়ত অনেকেই পড়িয়াছেন। পড়ুন বা না পড়ুন, আবার নূতন করিয়া পড়িতে আপনাদের সকলকে অনুরোধ করি। ও-সময়ে সব কথা

বুঝিতাম না। তবে একথাটি হৃদয়ঙ্গম হইত যে, রবীন্দ্রনাথ মূল সমস্যার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। অসহযোগের মরশুমেও তাঁহার কতকগুলি রচনা বাহির হয়; ইহার মধ্যেও তিনি আমাদের লক্ষ্যকে ভাবাবেগ-বিমুক্ত করিয়া স্পষ্ট করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রবন্ধ বা কবিতা নয়, গল্পের মাধ্যমেও বাঙালীর প্রাণ স্পর্শ করিতে পারিয়াছিলেন। একদা আমাদের হেড মাষ্টার মহাশয় সদ্য আগত 'সবুজপত্র' হইতে বোষ্টমী গল্পটি ক্লাসে পড়িয়া শুনাইলেন। রবীন্দ্রনাথকে চাক্ষুষ দেখি নাই, তাহার পৌরুষব্যঞ্জক চিত্র মাত্র দেখিয়াছি। উক্ত গল্পটি পাঠকালে আমরা মানস-নেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও বোষ্টমীকে যেন আলাপরত দেখিতে পাইলাম। রবীন্দ্রনাথের ভিতরে বোষ্টমী তাঁহার প্রাণের ঠাকুরকে দেখিতে পাইয়াছেন। আমাদের তরুণ মনে এই কথাটি তখন এতই যথার্থ প্রতিভাত হইয়াছিল যে, আজিও তাহা ভুলিতে পারি নাই।

১৯১৯ হইতে ১৯২২—এই কয় বৎসর ভারতের আকাশ-বাতাস আশা-নৈরাশ্যের আলো-আঁধারিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। শেষ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া বাংলার রাজধানী কলিকাতায় প্রথম গমন করি। যে মাসাধিককাল এখানে অবস্থান করি তাহার মধ্যেই কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ইহলীলা সংবরণ করিলেন। তিনিও আমাদের মনপ্রাণ জুড়িয়া ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন বাঙালীর কবি—সত্যেন্দ্রনাথের চিত্তে অভূতপূর্ব সাড়া জাগাইয়াছিল।

"চরকার ঘর্ঘর, পড়সীর ঘর ঘর"—কাব্য ছন্দে আমাদের নূতন করিয়া তিনি শুনাইলেন। এই ঘর্ঘর ধ্বনিটি শতবর্ষ যাবৎ তো প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এহেন সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু বাংলার তরুণ প্রাণে এক বড় রকমের আঘাত হানে। শুনিলাম স্মৃতি-সভা হইবে রামমোহন লাইব্রেরিতে আর সভাপতিত্ব করিবেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। চিত্রে রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়াছি। বড় বেশী চিত্র দেখি নাই। সেই বোষ্টমীর সঙ্গে আলাপন-রত রবীন্দ্রনাথের চিত্র মানস-নেত্রেই আঁকিয়া রাখিয়াছিলাম। এবারে রামমোহন লাইব্রেরীতে রবীন্দ্রনাথকে সশরীরে প্রত্যক্ষ করিলাম। শুভ্র-গুম্ফ, শুভ্র-কেশ; দীর্ঘাকৃতি এবং সুরুচির প্রতিমূর্ত্তি। রামমোহন লাইব্রেরীর ছোট্ট হলটিতে লোক যেন ভাঙিয়া পড়িল। আমরা সম্মুখে উপরের ব্যাল্‌কনীতে দাঁড়াইয়া। এখানে বিখ্যাত 'বীরবল' প্রমথ চৌধুরীকে প্রথম দেখি। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রমথবাবু বক্তৃতার একস্থলে বলিলেন যে, বাংলার একজনকে বাদ দিলে সত্যেন্দ্রনাথকে ছন্দ-রাজ্যের শীর্ষে স্থান দেওয়া চলে।

রবীন্দ্রনাথ এই সূত্রটি ধরিয়াই সভাপতির ভাষণ আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দের রাজা; তিনি তাঁহার নিকট হার মানিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের এই কৃতিত্বের অপহ্নব যেন কেহ ভ্রমক্রমেও না করেন। রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মর্মার্থ এখানে নিবেদন করিলাম। ইহার পর তিনি স্ব-রচিত কবিতা পাঠ সুরু করিলেন। এমন কবিতা-পাঠ জীবনে কখন শুনি নাই, পরেও শুনিব কিনা সন্দেহ। সেই উদাত্ত-অনুদাত্ত স্বরে দীর্ঘ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ পাঠ করিয়া গেলেন, মনে হইল যেন মুখস্থ আবৃত্তি করিতেছেন। এখনও যেন তাঁহার হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ সমন্বিত কবিতা পাঠ আমার কর্ণে অনুরণিত হইতেছে। বহুদিন হইতেই রবীন্দ্রনাথকে দেখিবার সাধ। আজ সেই সাধ মিটাইয়া কৃতকৃতার্থ হইলাম। শুধু দেখা নয়, কথাও শুনিলাম। একি কম সৌভাগ্য! কলিকাতা হইতে বহু দূরে পল্লীর স্নিগ্ধ পরিবেশে রবীন্দ্রনাথকে আন্তরিক শ্রদ্ধা-প্রীতি নিবেদন করিয়াছি এতদিন, এখন তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার মুখে কথা শুনিয়া যে কত আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। সভায় পঠিত চারুবাবুর প্রবন্ধ এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতা পরবর্তী সংখ্যা প্রবাসীতে ছাপা হইয়া গেল। এখনও কবি-দরদীরা এ দুইটি পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন।

বি-এ পড়িতে কলিকাতায় আসিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ প্রায়শঃ শান্তিনিকেতনে থাকিতেন। কখন-কচিৎ কলিকাতায় যে না আসিতেন এমন নহে। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ইহা লইয়া তো তিনি খুবই ব্যস্ত। ইহারই মধ্যে বিদেশ গমনের নিমিত্ত হামেসা আহ্বান আসিত। কলিকাতায় আসিয়াই শুনিলাম তিনি চীন-ভ্রমণে রওনা হইয়া গিয়াছেন। চীন-ভ্রমণকালীন কোন কোন কৌতুককর কাহিনী শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখাৎ আমরা পরে শুনিয়াছি। ব্যাঙের ডাল্‌না ভোজনছলে দীর্ঘায়ত শ্মশ্রুর ফাঁক দিয়া জামার ভিতরে ফেলিয়া দিতেন রবীন্দ্রনাথ। আজিও মনে হইলে হাসির উদ্রেক হয়। কবিগুরুর কৌশলের তারিফ না করিয়া পারি না। ভারতের আকাশে পুনরায় কালো মেঘ দেখা দিল। সুভাষচন্দ্র কর্পোরেশনের প্রধান

কর্মকর্তার পদে অধিষ্ঠিত হইবার অল্পকাল পরেই (২৫শে অক্টোবর, ১৯২৪) রাজদ্রোহের অভিযোগে ১৮১৮ সালের ৩ আইন বলে বিনা বিচারে নির্বাসিত হইলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন দক্ষিণ আমেরিকায়। তিনি দক্ষিণ আমেরিকার 'বুয়েনোস আইরেস'হইতে ২০শে ডিসেম্বর তারিখে কবিতাকারে দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একখানি পত্র লেখেন। এই পত্রে বাঙালী বীর সন্তানদের সদ্য নির্বাসনের বিষয় উদ্দেশ করিয়া মর্মবেদনা প্রকাশ করেন। এই কবিতাটি ১৩৩১ সনের ফাল্গুন সংখ্যা প্রবাসীতে হুবহু প্রকাশিত হয়। আমরা কবিতাটি পাঠ করিয়া বুঝিলাম, তিনি মুখ্যতঃ স্থভাষচন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়াই কবিতাটি লিখিয়াছেন। মুরুব্বীরা বলিতে লাগিলেন, রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে অনেক দিন পরে একটি মনের মত কবিতা পাইলাম। আবার কেহ কেহ বলিলেন, রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্ব' 'বিশ্ব' করিলেও যে কতখানি স্বদেশপ্রাণ এই কবিতায় তাহা পুরাপুরি প্রকটিত হইয়াছে। আমরা কত কি শুনিতে লাগিলাম।

দ্বিতীয়বার রবীন্দ্রনাথকে চাক্ষুষ করিলাম কলিকাতা ইউনির্ভাসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে। তিনি চীন পরিভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। চীন-ভারতের ঐক্য যে দীর্ঘকালের ধর্ম্ম-সাহিত্য-সংস্কৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে বিরাট সভা। এই সভায় তিনি তাঁহার চীন ভ্রমণের ফলে ঐ বিষয়ে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন, অনবদ্য ভাষায় তিনি তাহা বিবৃত করিলেন। হলটি বেশ বড়। তিল ধারণের স্থান নাই। আমরা দ্বিতলের ব্যালকনিতে মাঝামাঝি জায়গায় স্থান করিয়া লইলাম। সাধারণ সভা, টিকেটের হাঙ্গামা ছিল না। কাজেই ভীড় যে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি। রবীন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়া এক ঘণ্টা কাল কি তার একটু বেশী অনর্গল বক্তৃতা করিয়া গেলেন। বক্তৃতার ভিতরেও সেই উদাত্ত অনুদাত্ত স্বর। গদ্যের মধ্যেও যে কবিত্ব থাকিতে পারে এবারকার বক্তৃতায় তাহা সম্যক বুঝিলাম। অনেকের ধারণা রবীন্দ্রনাথ কবি, রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক, ঔপন্যাসিক, সাহিত্যিক প্রভৃতি। কিন্তু তিনি যে একজন উঁচুদরের বক্তাও এ কথাটি হয়ত অনেকে জানেন না। এবারে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইলাম। অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহের মুখে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পাঠকালেও যে লোকের ভীড় হইত তাহা শুনিয়াছিলাম। বক্তৃতা শুনিতে যে ভীড় হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি ? তখন মাইকের আবির্ভাব হয় নাই। অতবড় হলটির শেষ

প্রান্ত হইতে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার প্রতিটি কথা সকলে শুনিতে পাইয়াছিল। সবই নীরব নিস্তব্ধ, শ্রোতা ও বক্তার সহানুভূতিপূর্ণ সহযোগিতায় অপূর্ব বোধ হইয়াছিল।

তরুণ বয়সেই নানাভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্যের সহিত আমাদের যে কতকটা পরিচয় ঘটিয়াছিল এখন হয়ত আপনারা তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। ইস্কুল ছাড়িয়াছি কি কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছি ঠিক মনে নাই, হঠাৎ একদিন পিসে-মহাশয়ের বাটি হইতে একখণ্ড হিতবাদী সংস্করণ রবীন্দ্রগ্রন্থাবলী আবিষ্কার করিলাম। বইখানিতে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, ইউরোপ প্রবাসের পত্র প্রভৃতি বাহির হইয়াছিল, কি আগ্রহের সহিতই না পড়িতে আরম্ভ করি। 'একরাত্রি', 'পোষ্টমাষ্টার', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পগুলি পড়িয়া কত নূতন নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম। প্রবন্ধ সমূহের মধ্যে 'কাব্যে উপেক্ষিতা'র বিষয়বস্তু এখনও যেন হৃদয়ে গাঁথিয়া রহিয়াছে। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার কথা কতই না শুনি, কিন্তু চির-বিরহিণী সেবাপরায়ণা উর্ম্মিলার চরিত্র রবীন্দ্র-তুলিকায় মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়া ইহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। শকুন্তলার সংগেও আমরা নূতন করিয়া পরিচিত হইলাম। রবীন্দ্রনাথের পক্ষ-প্রতিপক্ষের কথা সেই তরুণ বয়সেই শুনিয়াছি; আপনারা আরম্ভেই তাহা বুঝিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার যেসব ভাবনা, সাহিত্যের মধ্যে বিধৃত হইয়াছিল তাহা আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলে, রবীন্দ্রনাথ আমাদের একান্ত আপন হইয়াই উঠিলেন। আজও তিনি আমাদের নিকট ভারত-আত্মার মূর্ত্ত-প্রতীক বলিয়া প্রতিভাত।

নেতাজী

'মহাত্মা' বা 'মহাত্মাজী' বলিতে আমরা যেমন মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধীকে বুঝি, তেমনি 'নেতাজী' বলিতে সুভাষচন্দ্র বসুর কথা আমাদের মনে স্বতঃই উদয় হয়। 'আজাদ-হিন্দ ফৌজ'-এর নায়ক বা নেতারূপে তিনি এই নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন। আজ সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের 'নেতাজী'। প্রতিবৎসর ২৩শে জানুয়ারী নেতাজীর জন্মদিবস প্রতিপালিত হইয়া থাকে। কাহারও ধারণা তিনি আর ইহলোকে নাই, আবার কাহারও কাহারও বিশ্বাস তিনি জীবিত আছেন। মৃত বা জীবিত যাহাই হোন না কেন, নেতাজী ভারতবাসীর চিত্তে একটি স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। এ দিক হইতে তিনি নিশ্চয়ই অমর। তাঁহার ত্যাগপূত কর্মময় জীবন আমাদের প্রাণে বল সঞ্চার না করিয়াই পারে না।

অসহযোগের মরশুমে বাঙলার দুইজন ত্যাগী যুবক কেমন স্বাভাবিক ভাবেই তরুণ-মন একেবারে জুড়িয়া বসেন—একজন ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ছাত্র-শিষ্য। রসায়নশাস্ত্রে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস্‌সি.। ঐ সময় তিনি সরকারী মিণ্টে 'অ্যাসে-মাস্টার' পদে নিযুক্ত ছিলেন। পদটির বেতনও বেশি। তিনি মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সরকারী কর্ম পরিত্যাগ করিয়া দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। দ্বিতীয়জন—সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি ছাত্রাবস্থায়ই কোনো বিশেষ কারণে শিক্ষিত জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ছাত্রবন্ধু আশুতোষের সহায়তায় সাময়িক বিপদ কাটাইয়া উঠেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. উপাধি প্রাপ্ত হইয়া বিলাত যান। সেখানে হইতে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (বা, সংক্ষেপে আই. সি. এস.) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। কিন্তু তখনই দেশমাতার আহ্বান তাঁহার চিত্তে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়। তিনি এই লোভনীয় পদ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে মনেপ্রাণে যোগ দেন। আমরা সুদূর পল্লী হইতে এই ত্যাগীশ্রেষ্ঠ যুবকদ্বয়কে আমাদের

প্রণতি জানাইলাম। উভয়ের প্রতিই আমাদের অন্তর শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল।

১৯২৩ সনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন হইল যশোহরে। আমরা একদল ছাত্র ও যুবক বাগেরহাট হইতে ভলাণ্টিয়ার হইয়া এই সম্মেলনে যোগ দেই। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। তখন কংগ্রেসী রাজনীতিতে নো-চেঞ্জার বা অসহযোগের স্বপক্ষ এবং প্রো-চেঞ্জার বা অসহযোগের সংশোধনকামী দুই দল দেখা দিয়াছিল। এই সম্মেলনে আমি সর্বপ্রথম তরুণ সমাজের আদর্শ প্রফুল্লচন্দ্র এবং সুভাষচন্দ্রকে দেখিলাম। আমরা ভলাণ্টিয়ার, নির্দিষ্ট সময় ও কর্ম (duty) ব্যতিরেকে সর্বত্র আমাদের অবাধ গতি। বিষয়-নির্বাচনী সমিতিতে আমাদের ডিউটি পড়িল। এ সময় অতি নিকট হইতেই এ দুজনকে প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ ঘটে। দুইজন দুই মতের পোষকতা করিলেন। সুভাষচন্দ্রের শান্ত শুভ্র সৌম্যমূর্তি। তিনি স্বল্পভাষী, অল্পসময়ের মধ্যেই যেন সকলকেই আপন করিয়া লইতে পারেন। বিষয়-নির্বাচনী সমিতির মতো প্রকাশ্য সম্মেলনেও তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কিন্তু কি বলিয়াছিলেন এতদিন পরে তাহা সঠিক মনে করিতে পারিতেছি না।

ইহার পর রাজনীতিক্ষেত্রে কতকগুলি পরিবর্তন আসিল অতি দ্রুত। রাজনীতি বলিতে কংগ্রেসী রাজনীতি। স্বরাজ্য দল অধিক সংখ্যায় প্রাদেশিক আইন-সভায় এবং কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদে নির্বাচিত হইয়াছে। দু'তিনটি প্রদেশে সংখ্যাধিক্যও লাভ করিয়াছে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ মন্ত্রীত্বকালে আইন পাস করাইয়া কলিকাতা কর্পোরেশনকে 'স্বদেশী' করিয়া তোলেন। নূতন আইন-বলে কর্পোরেশনের যে প্রথম নির্বাচন হইল তাহাতে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল স্বরাজ্য দল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রথম মেয়র এবং সুভাষচন্দ্র বসু প্রথম চীফ একজিকিউটিভ অফিসার বা প্রধান কর্মকর্তা। ১৯২৪ সনের প্রথমে কি মাঝামাঝি ঐরূপ হইল, ঠিক বলিতে পারিতেছি না।

সুভাষচন্দ্রের গুণপনার কথা নানা সূত্রে হামেশাই শুনিতেছিলাম। মিঃ বি. আর. সেন (শ্রীবিনয়রঞ্জন সেন) আই. সি. এস. পাস করিয়া প্রথমে বাগেরহাটে সেটেলমেণ্ট অফিসার হইয়া আসেন। তিনি সুভাষচন্দ্রের সতীর্থ। কিন্তু প্রথমবারে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হইতে পারেন নাই; দ্বিতীয়বারে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে প্রত্যহ সন্ধ্যায় আলাপ জমাইতাম। একমাসের উপর এইরূপ 'আড্ডা' দিয়াছি। একটি সর্ত ছিল—তিনি ইংরেজীতে কথা কহিবেন, আমিও ইংরেজীতে কথা কহিব। বিভিন্ন বিষয় লইয়া আলাপ হইত; এখানে সে-সব বলার প্রয়োজন নাই। তাঁহার কথাবার্তায় বুঝিতাম, তিনি সুভাষচন্দ্রের প্রতি কতই না শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁহার সম্পর্কে তিনি আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মর্ম এই: "দেখুন, সি. আর. দাশ প্রচুর ত্যাগ করেছেন। কিন্তু সুভাষ-চন্দ্রের তাগের তুলনা নেই। পৃথিবীর সমস্ত সুখ-সম্ভোগ তাঁর সম্মুখে। তিনি একে অগ্রাহ্য করেছেন সম্পূর্ণভাবে। তিনি কত বীর, কত শক্তিধর, তাঁর ত্যাগ কত মহান্!" বিনয়রঞ্জনের এই কথাগুলি আমার হৃদয়ে যেন খোদিত হইয়া আছে। ভারতবর্ষের কিছুই ভাল যাঁহার মুখে শুনিতাম না, তাঁহার মুখে এইপ্রকার অকৃত্রিম অযাচিত প্রশংসা! তখন কেমন যেন বেসুরো ঠেকিত, তবু বড়ই ভাল লাগিত।

ইহার পর এই বৎসরেই আবার সুভাষচন্দ্রকে অল্প-সময়ের জন্য হইলেও, নিকট হইতে দেখিলাম। আমাদের আই.এ. পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। মে মাসে মূলঘরে খুলনা জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল। আমরা মূলঘরে গেলাম। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সেখানে উপস্থিত। নগেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ জেলার নেতৃবৃন্দ সেখানে আসিয়াছেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী মূলঘর-নিবাসী নেপালচন্দ্র রায়। নির্দিষ্ট সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আসিতে পারিলেন না। তাঁহার স্থলে আসিলেন সুভাষচন্দ্র বসু, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এবং অনিলবরণ রায়। বীরেন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। সুভাষচন্দ্র কিছু বলিলেন কিনা ঠিক মনে নাই। সেই শান্ত শুভ্র সৌম্যমূর্তি দ্বিতীয়বার দেখিয়া বিমোহিত হইলাম। সুভাষচন্দ্র 'দর্শন'-এর ছাত্র। তাঁহার চক্ষু দেখিয়া মনে হইত তিনি যেন দূরবর্তী কি-প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আমরা যাহা দেখি শুনি তাহার মধ্যে অতীন্দ্রিয়কে দেখাই তো দর্শনের শিক্ষা; এই শিক্ষা সুভাষচন্দ্র বসু লাভ করিয়াছেন মনে হইল।

বি.এ, পড়িতে কলিকাতায় আসিলাম। কংগ্রেসী রাজনীতিতে বাদ-বিতণ্ডা চলিলেও, স্বরাজ্য দল নিজ শক্তিতে পথ কাটিয়া চলিয়াছে। শক্তিমান স্বরাজ্য দলের কর্মপদ্ধতি লইয়াও কত তর্ক-বিতর্ক। এবারে সুভাষচন্দ্রকে দেখিলাম কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তারূপে।

বর্ষাকালের চন্দ্রগ্রহণ। 'গভীর রাত্রে আমরা সিটি কলেজের মেসের কয়েকজন এবং অন্য একটি সেবা-সমিতির সভ্যগণ একযোগে দল বাঁধিয়া স্বেচ্ছাসেবক হইলাম। স্নান-যাত্রীর যাতায়াত-নিয়ন্ত্রণ স্বেচ্ছাসেবকের এক প্রধান কাজ। নিমতলা ঘাটের অদূরে নিমতলা ষ্ট্রীটের খানিকটা অংশে দাঁড়াইয়া থাকিয়া যাত্রী-যাতায়াত নিয়ন্ত্রণের ভার পড়িল আমাদের উপর। একসময়ে খুব বৃষ্টি হইল—খদ্দরের জামা গায়ে, বৃষ্টিতে ভিজিয়া দেহ অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকেরা নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ায় তাহাদের আর ভিজিতে হয় নাই। নির্দিষ্ট স্থান হইতে চলিয়া না গিয়া আমরা কেহ কেহ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভিজিলাম। আমার এক বন্ধু ইহাতে বড়ই অনুযোগ করিলেন। থাক্ সে কথা। রাত্রিশেষে যাত্রীর ভিড় কমিল, আমরাও গঙ্গাস্নান করিবার অনুমতি পাইলাম। গঙ্গার নিকটবর্তী হইয়াছি, দেখি প্রধান কর্মকর্তা সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি রাত্রিতে নিদ্রা যান নাই। চন্দ্রগ্রহণের পূর্ব হইতেই কলিকাতার উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের সকল ঘাটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্নানার্থী-নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা নিজে দেখিয়াছেন, সময় সময় বিভিন্ন কেন্দ্রের কর্মীদের নানা উপদেশও দিয়াছেন। এবারকার চন্দ্রগ্রহণের স্বেচ্ছা-সেবকদের সেবাকার্য যা সুষ্ঠুমতো হইয়াছিল তাহার মূলে সুভাষচন্দ্রের হাত ছিল অনেকখানি।

সুভাষচন্দ্র কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তারূপে বেশিদিন স্থিত রহিলেন না। সরকার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া অনির্দিষ্ট কালের জন্য মান্দালয়ে নির্বাসিত করিলেন। তখন দেশব্যাপী কি উত্তেজনা, কি তুমুল আন্দোলন! সুভাষচন্দ্র ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া ১৯২৭ সনে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। দেশমাতৃকার বেদীমূলে যাঁহার প্রাণ উৎসর্গীকৃত, তিনি কি ছাড়া পাইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন? তিনি আবার কর্মসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। এই সময়ে কখনও কখনও তাঁহার বক্তৃতাও প্রায়ই দীর্ঘ হইত।

সুভাষচন্দ্রকে পুনরায় অতি নিকট হইতে দেখিলাম ১৯২৮ সনে কলিকাতা কংগ্রেসের সময়। তিনি এবারে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর অধিনায়ক—'G.O C' বা 'জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং' হইয়াছেন। সকলই সেনা-বিভাগের আদব-কায়দা। এই সময় কেহ কেহ বিদ্রূপ করিয়া সুভাষচন্দ্রকে 'গক্' বলিয়াও আখ্যাত করিয়াছেন। কিন্তু তখন কে জানিত পরবর্তীকালে আজাদ-হিন্দ ফৌজের অধিনায়কের সূচনা হইয়াছিল ইহার মধ্যে। হাওড়া স্টেশন

হইতে পার্ক সার্কাস—দীর্ঘ পাঁচ-ছয় মাইল পথ সভাপতি মতিলাল নেহেরুকে চোদ্দ-ঘোড়ার গাড়ীতে বসাইয়া শোভাযাত্রা চলিয়াছে। জি-ও-সি সুভাষ-চন্দ্র ধীর শান্ত ভাবে খোলা মোটরের উপর দাঁড়াইয়া চলিলেন শোভাযাত্রার সবশেষে। ক্লান্তিহীন শ্রান্তিহীন সেই গতি এবং বেশ সম্পূর্ণ সেনানায়কের। কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স সবই নির্বিঘ্নে হইয়া গেল; কিন্তু রাজনীতির কুটীল গতি কে রোধিবে? আজ উহা ইতিহাসের বস্তু।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের পর সুভাষচন্দ্র কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তখন সত্যাগ্রহ আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। আইন-অমান্যের যুগ। বিদেশীর বে-আইনী আইন আমরা মানিব না—মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে জাতি তখন এই সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে। সত্যাগ্রহ বা আইন-অমান্য আন্দোলনের সুরু হইতেই কলিকাতায় ১৪৪ ধারা জারী হইল। সাধারণ সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা সকলই নিষিদ্ধ হইয়া গেল। কতকগুলি পুস্তক-পুস্তিকা সরকার বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আগে কি পরে ঠিক মনে নাই, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন হেদুয়ায় (বর্তমান 'আজাদ-হিন্দ বাগ') এক সাধারণ সভায় বে-আইনী পুস্তকের কিয়দংশ পাঠ করিতে কারাবরণ করিলেন। মেয়র সুভাষচন্দ্র ১৪৪ধারা ভঙ্গ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। সরকারী, বিশেষতঃ পুলিশ-মহলে বেশ সোরগোল পড়িয়া গেল। সেদিনকার কি আয়োজন! দেখিয়া মনে হইল—হৃতরাজ্য-উদ্ধারকল্পে রণ-সজ্জা! এই ব্যাপারটি আগে হইতেই জানাজানি হইয়া যায়, মেয়র ঐদিন আইন-ভঙ্গ করিবেন মিছিল বা শোভাযাত্রা করিয়া। সরকারী ও বেসরকারী মহলে ইহা বন্ধ করিবার নিমিত্ত কিছু চেষ্টাও চলিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে ফল হয় নাই। ময়দানের দিকে কিছু কিছু ভিড় হইতে থাকে, বৈকালের দিকে আমরা যখন পৌঁছাই তখন দেখি বেশ ভিড়। জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে সেদিন ময়দানে গিয়াছিলাম। বৈকাল ৫টা আন্দাজ কর্পোরেশন হইতে মিছিল বাহির হইল। মেয়র সুভাষচন্দ্র পুরোভাগে, তাঁহার পশ্চাতে ছিলেন তৎকালীন কর্পোরেশনের এডুকেশন-অফিসার শ্রীযুত ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। কর্পোরেশনের অন্যান্য কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন এই মিছিলে। মিছিলটি বেশ দীর্ঘ; ধীর পদক্ষেপে ময়দানের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। পুলিশের সে কি মহড়া! একবার এদিক একবার ওদিক টহল দিতেছে। মিছিলের অগ্রভাগ চৌরঙ্গীর প্রশস্ত রাস্তা পার হইবামাত্র

সার্জেণ্টরা বেটন-সহ মেয়র সুভাষচন্দ্রের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। লাল-বাজারের ডেপুটি কমিশনার স্বয়ং উপস্থিত, আরও কত সাদামুখ, সবই যেন একাকার। হঠাৎ দেখি সুভাষচন্দ্রের মাথা ফাটিয়া রক্তস্রোত বাহির হইতেছে। ডেপুটি কমিশনার অশ্বপৃষ্ঠে রোষকশায়িত নেত্রে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বীরনারী জ্যোতির্ময়ী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ডেপুটি কমিশনার ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে সবেগে গিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি ইংরেজীতে ডেপুটি কমিশনারকে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন তাহার তাৎপর্য এই—"করো কি, করো কি মিঃ ··,আমাদের মেয়রকে যে মেরে ফেলবে! তোমার পুলিশকে বলো নিরস্ত হতে।" ইত্যাদি ইত্যাদি। পুলিশের ভিতর দাঁড়াইয়া পড়িয়া কখন তাঁহার ডান হাতের কব্জিতে ও আঙুলে বেটনের আঘাত লাগিয়াছিল সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। মাত্র তিন চার হাত দূর হইতে আমি এইসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করি। সুভাষচন্দ্র নির্ভীক, প্রশান্তি যেন তাঁহার সর্বদেহে। এত আঘাত এত রক্তপাত, মুখে 'রা' শব্দটি পর্যন্ত নাই। ব্রিটিশ সরকার সুভাষচন্দ্র এবং কয়েকজন শোভাযাত্রীকে গ্রেপ্তার করিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন।

ইহার পর দীর্ঘকাল স্বদেশে ও বিদেশে নির্বাসিত জীবন যাপন করেন সুভাষচন্দ্র। তাঁহার জীবনের উপর দিয়া কত ঝড়-ঝঞ্ঝা বহিয়া গেল। জীবন সংশয়ও হইল কখনও কখনও। বিদেশে অসুস্থ অবস্থায় তিনি জননী ভারতবর্ষকে ভুলিতে পারেন নাই। যখনই সুযোগ ঘটিয়াছে তখনই বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে স্বদেশকে মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি তখন এইসকল লইয়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাদিতেও প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

১৯৩৭ সনে ভারতবর্ষে নূতন শাসন সংস্কার আইন চালু হইলে; সুভাষচন্দ্রের উপর আরোপিত নানাবিধ বাধা-নিষেধ তুলিয়া লওয়া হয়; তিনি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ভারতবাসী তাঁহাকে কংগ্রেসের সভাপতির পদ দান করিয়া নিজেদের গৌরবান্বিত বোধ করিল।

আজকাল 'পরিকল্পনা'র কথা কতই না শুনি। সুষ্ঠু পরিকল্পনার দ্বারা স্বদেশের কৃষি শিল্প বাণিজ্য শিক্ষা স্বাস্থ্য ইত্যাদিতে উন্নতি করিতে হইবে, এ কথা প্রথম যাঁহাদের মনে আসে তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে সুভাষচন্দ্রের কথা আমাদের মনে পড়ে। আর একজন ভারতবাসীও এ-কথা সবিশেষ চিন্তা করিতেছিলেন, তিনি বৈজ্ঞানিকপ্রবর ডক্টর মেঘনাদ সাহা। সুভাষচন্দ্রেরই

সভাপতিত্বকালে কংগ্রেসের আনুকূল্যে প্রথম প্ল্যানিং-কমিশন স্থাপিত হয়। ইহার পর কোনো কোনো মূল বিষয় লইয়া উর্দ্ধতন কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের সহিত সুভাষচন্দ্রের মতদ্বৈধ হইল। ইহার পরিণতি হয় বিচ্ছেদে। তিনি 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠন করিলেন। ভারতবর্ষের সত্যিকার স্বাধীনতা তাঁহার লক্ষ্য। আপোষরফার মনোভাব তিনি একেবারেই পছন্দ করিতেন না। ইহার পর যুদ্ধের মধ্যে তিনি স্বগৃহে অন্তরীণ অবস্থায় কিরূপে দেশান্তরী হইলেন তাহা আজ সকলেই জানেন।

'আজাদ-হিন্দ ফৌজ' ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (সংক্ষেপে আই.এন.এ.) বা ভারতীয় মুক্তি-ফৌজ গঠনের মূলে ছিলেন রাসবিহারী বসু। সুভাষচন্দ্র ইহাকে সুগঠিত করিয়া ভারতবর্ষের মুক্তি-প্রচেষ্টায় সক্রিয়ভাবে কাজে লাগাইতে অগ্রসর হন। এই বাহিনীর কার্যকলাপ সম্পর্কে কত পুস্তক-পুস্তিকাই না লেখা হইয়াছে। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের বিষয় এখনও রহস্যের অন্তরালে। 'আজাদ-হিন্দ ফৌজ'-এর অধিনায়কত্ব সুভাষচন্দ্র এমন সুষ্ঠুরূপে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অনুগামীরা তাঁহাকে 'নেতাজী' বলিয়া আখ্যাত করিতেন। এই স্বতঃ-উৎসারিত 'নেতাজী' সম্বোধনটি আজ সুভাষচন্দ্রের সম্যক ও সত্য পরিচয়।

জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়

কি সূত্রে ঠিক মনে নাই, ১৯২৬ সনে জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। বড়ই স্নেহপ্রবণ মহিলা, তিনি আমাদের সকলের 'দিদি' ছিলেন। ১৯২৬ সন হইতে ১৯৪৬ সনে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিতে সমর্থ হই। এই বিংশতি বৎসরের মধ্যে তাঁহার স্বদেশপ্রীতি এবং কর্মকুশলতা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাহার বিষয় এখানে কিছু লিখিব।

জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় উচ্চশিক্ষিতা, এম-এ পরীক্ষোত্তীর্ণা। বেথুন কলেজিয়েট স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করিয়া কটক র‍্যাভেন্‌শ' কলেজে অধ্যাপিকা হইয়া যান। সেখানে তিনি আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির সংস্পর্শে আসেন। কটক হইতে তিনি সিংহলের একটি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া গিয়াছিলেন, তখন ডক্টর কালিদাস নাগও ছিলেন ঐ অঞ্চলের একটি কলেজের অধ্যক্ষ। সেখান হইতে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ১৯২০ সনে কলিকাতা স্পেশাল কংগ্রেসের অধিবেশন অন্তে লালা লজপৎ রায়ের উপদেশে জলন্ধর কন্যামহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। অসহযোগের মরশুমে তিনি কর্মত্যাগ করিয়া পুনরায় কলিকাতায় আগমন করিলেন। লেডী অবলা বসুর আগ্রহাতিশয়ে জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষ হন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং তাঁহার দেহে বড় রকমের অস্ত্রোপচার হয়। ইহার পর অতিরিক্ত পরিশ্রমে, অপারগ হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর সঙ্গে আমার যখন প্রথম আলাপ হয় তখন তিনি লেডী অবলাবসুর নারী-শিক্ষা-সমিতির অধীনস্থ বিদ্যাসাগর বাণীভবনের অধ্যক্ষ। বাণী-ভবন বালবিধবা এবং অনাথা যুবতী নারীদের একটি শিক্ষাকেন্দ্র। ছাত্রীদের বিদ্যাশিক্ষা ও শিল্প-শিক্ষা দুই-ই এখানে দেওয়া হইত। জ্যোতির্ময়ী শিক্ষাব্রতীরূপে জীবন আরম্ভ করেন। শিক্ষাব্রতীর যে প্রধান গুণ—ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি দরদ ও মমতা—তাহা তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায়

বিদ্যমান ছিল। তিনি পরবর্তী জীবনে রাজনৈতিক কর্মী ও মহিলা নেতারূপে খ্যাতিলাভ করেন, কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি দরদ তাঁহাতে বরাবর প্রত্যক্ষ করিয়াছি; আর এই ছাত্র-বন্ধু রূপেই তাঁহার জীবনের একপ্রকার অবসান ঘটিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় এই ছাত্রবন্ধু হিসাবেই।

১৯২৬ সনে কলিকাতায় একটি ষ্টুডেণ্ট এসোসিয়েশন বা ছাত্র-সভা গঠিত হয়। সভার সভাপতি ছিলেন জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি সুরেশচন্দ্র রায়। সম্পাদক দুর্গাপদ দাশগুপ্ত। আমি ছিলাম সহকারী সম্পাদক। কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যদের মধ্যে কেহ কেহ জীবনে বেশ সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। ইদানীন্তন কালের ছাত্র-সভাগুলির মধ্যে এটি ছিল আদি। তবে এই ছাত্রসভাটির উদ্দেশ্যে ছিল রাজনীতি-বহির্ভূত। দরিদ্র-ছাত্রদের নানাপ্রকারে সাহায্য দান, রোগী ছাত্রদের সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা এবং ছাত্র-সমাজের বিবিধ অভাব-অভিযোগ দূরীকরণ ইহার উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য হইত। কলেজের ছাত্রদেরই সভার সদস্য করা হইত। সদস্যদের মাসিক চাঁদা চারি আনা। আমি তখন এম-এ পড়ি; সভার একটি ভাড়া-করা ঘর ছিল সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে। আমি এবং আর একজন ছাত্র এই ঘরে বাস করিতাম। সভার অধিবেশনগুলিতে স্বভাবতঃই জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করিতেন। এই সময় তাঁহার সংগঠনমূলক এবং ছাত্রদরদী মনের বিশেষ পরিচয় পাইতে লাগিলাম। ছাত্র-সভার উদ্দেশ্য অনুযায়ী কার্য-সম্পাদন-কল্পে অর্থসংগ্রহের নিমিত্ত আমরা দু' একবার জলসার আয়োজন করি। এ সময়কার একটি বিশেষ ঘটনার কথা বলি।

ছাত্র-সভার পক্ষ হইতে আমরা বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর একটি বৈজ্ঞানিক বক্তৃতার আয়োজন করি। সভাপতি জ্যোতির্ময়ী এই বক্তৃতার আয়োজনে বিশেষ উদ্যোগী হন। বর্তমান লেখক তাঁহার পত্র লইয়া প্রথমে আচার্য জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করেন। ইহার পরে অধ্যাপক নাগ (বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রধান কর্মী নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ) তারিখ ও সময় ঠিক করিয়া দিলে নির্দিষ্টদিনে আচার্য জগদীশচন্দ্র আমাদের সম্মুখে সরল ইংরেজীতে বক্তৃতা দিলেন। এই উপলক্ষে কয়েকবারই আচার্য জগদীশচন্দ্রের সন্নিধানে আমাকে যাইতে হইয়াছিল। তখন তাঁহার মুখে অনেক কথা শুনি। পূর্বে ইহার কিছু আভাস দিয়াছি। বক্তৃতা-সভায় ছাত্র-সদস্যেরা ভিড় জমাইয়াছিল। লেডী বসু সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির মুখে

শুনিয়াছি, তিনি এত ছাত্র-সদস্য দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন।' ছাত্র-সভা বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু এই সময়ে জ্যোতির্ময়ীর দরদী মনের বিস্তর পরিচয় পাইলাম।

বিদ্যাসাগর বাণী-ভবনে বিভিন্ন জেলা হইতে বালবিধবাগণ আসিয়া অধ্যয়নরত থাকিতেন। তাঁহারই পরামর্শে ও সহায়তায় আমার এক আত্মীয় বালবিধবাকে এই ভবনে ভর্তি করিয়া দি। তখন প্রত্যেক শিক্ষার্থিনীর মাথাপিছু প্রতিমাসে বারো টাকা ব্যয়বরাদ্দ ছিল। এই ব্যয় নির্বাহ হইত বিভিন্ন দাতার দান হইতে। এখানে দুই বৎসর শিক্ষালাভের ব্যবস্থা ছিল। আমার আত্মীয়টি এখানে দুই বৎসর শিক্ষালাভ করিয়া বাণীভবনেরই সাহায্যে সরকারী ট্রেনিং স্কুলে ভর্তি হন। তিনি পরে শিক্ষাব্রত গ্রহণ করেন এবং জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠ হন। আজ এই প্রসঙ্গে জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলীর নাম বিশেষভাবে স্মরণ করি।

১৯২৮ সনের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। কংগ্রেসের সঙ্গে গাঙ্গুলী পরিবারের যোগ ইহার প্রায় সৃষ্টি অবধি। জ্যোতির্ময়ীর মাতা কাদম্বিনী গাঙ্গুলী সর্বপ্রথম কলিকাতায় কংগ্রেসের একটি বার্ষিক অধিবেশনে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় নানাভাবে প্রথম যুগে কংগ্রেসের সেবা করিয়া গিয়াছেন। জ্যোতির্ময়ী ১৯১৭ সনের কলিকাতা কংগ্রেসে নারী-ভলান্টিয়ার বাহিনীর ক্যাপ্‌টেন হইয়াছিলেন। ১৯২০ সনের কংগ্রেসেও তিনি একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। এবারে, ১৯২৮ সনের কংগ্রেসের তিনি একজন প্রধান কর্মকর্তা হইলেন। বর্তমানে কলিকাতাস্থ পার্ক সার্কাসে যে বিরাট পার্ক দৃষ্ট হয় তাহা তখন পতিত অবস্থায় ছিল। জমি উঁচু নীচু, কোথাও কোথাও কাঁটা গাছে ভরা। এই সকল পরিষ্কার করিয়া জমি সমান করা হয় এবং এই জমিতে কংগ্রেস মণ্ডপ, সর্বদল সম্মেলন মণ্ডপ ও বিরাট প্রদর্শনীর স্থান করা হইল। জমি প্রস্তুতির সময় হইতেই জ্যোতির্ময়ী সেখানে রীতিমত যাইতেন, আমিও কখন কখন তাঁহার সঙ্গী হইতাম। শুনিয়াছি, কংগ্রেসী রাজনীতির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগহেতু 'অধ্যক্ষ জ্যোতির্ময়ীকে' বাণী-ভবনের কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজনও হইতে হয়। যাহা হউক, সিংহল হইতে আবার একটি কলেজের অধ্যক্ষ পদের জন্য তাঁহার নিকট আহ্বান আসে, এবং তিনি বাণী-ভবনের কর্ম ত্যাগ করিয়া সেখানে চলিয়া যান। এই সিংহল যাত্রা উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার

একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ চিত্রসহ 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে প্রকাশিত করি। বলা বাহুল্য, তখন আমি এই পত্রিকা তুইখানির সম্পাদকীয় বিভাগে কর্মে লিপ্ত হইয়াছি।

মনে হয় বৎসরেক কাল জ্যোতির্ময়ী সিংহলে ছিলেন। এই এক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের রাজনীতি বিশেষ জটিল আকার ধারণ করে। মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থরু করিয়া দিয়াছেন। বিখ্যাত দণ্ডী-যাত্রা অন্তে তিনি কারারুদ্ধ হন। ভারতবর্ষের সর্বত্র এক অভূতপূর্ব জনজাগরণ দেখা দিল। সদ্য-প্রত্যাগত জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় আন্দোলনে কায়মনে যোগ দিলেন। কলিকাতার নারী সত্যাগ্রহ সমিতির তিনি হইলেন একজন সহকারী সভাপতি। বাংলার নারী-সমাজের সে কি উৎসাহ-উদ্দীপনা! মহিলাগণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিলেন জাতীয় পতাকাসহ একটি শোভাযাত্রা বা মিছিলের আয়োজন দ্বারা। শ্রদ্ধানন্দ পার্ক হইতে মিছিল বাহির হইল। আমহার্ষ্ট স্ট্রীট, বৌবাজার স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হইয়া হেতুয়ায় (বর্তমান আজাদ হিন্দ বাগ) আসিয়া শেষ হয়। আমি এই মিছিলের সঙ্গে আগাগোড়া ছিলাম। দেখিলাম জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়ের কি তেজোদৃপ্ত কর্মতৎপরতা। উর্মিলা দেবীর একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার পর যে যাঁহার গন্তব্যস্থানে চলিয়া যান। ইহার পর নারী সত্যাগ্রহ সমিতির কর্মকুশলতা নানাভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

জ্যৈষ্ঠ মাসে ছুটি লইয়া 'দেশে'র বাড়ীতে গিয়াছিলাম; ফিরিয়া দেখি জ্যোতির্ময়ী আইন অমান্য করিয়া কারারুদ্ধ হইয়াছেন। সত্যাগ্রহীরা আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেন না। একটিমাত্র বিবৃতি পেশ করিয়া নিজ আদর্শ ব্যক্ত করিতেন। জ্যোতির্ময়ীও একটী বিবৃতি মাত্র দিয়াছিলেন। তখন কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট লর্ড সিংহের পুত্র স্থশীলকুমার সিংহ। তিনি জ্যোতির্ময়ীর আত্মীয়ও বটেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, বিবৃতির মুখ-পত্রে কংগ্রেসের ঐতিহ্য এবং ইহার সঙ্গে সিংহ মহাশয়ের পিতৃকুল ও শ্বশুর-কুলের যোগাযোগ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে ম্যাজিষ্ট্রেট স্থশীলকুমার খানিকটা বিপর্যস্ত বোধ করেন; কিন্তু তিনি তাঁহার কর্তব্য করিতে ভুলেন নাই। জ্যোতির্ময়ীকে তথাকথিত আইন বলে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। ক্রমে বহু মহিলা-সত্যাগ্রহী কারাগারে আবদ্ধ হন। আমরা কখনও কখনও জেলে জ্যোতির্ময়ী দেবীর সঙ্গে দেখা করিয়াছি। শরীর অপটু হইলেও মুখে

সেই তেজোদৃপ্ত হাসি! দ্বিতীয় সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময়ও তিনি কারাবরণ করেন।

ইহার পর স্বাধীনতা আন্দোলনের এক নূতন পর্যায় প্রবর্তিত হইল। সত্যাগ্রহীরা স্বায়ত্তশাসন মূলক প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রবেশের অনুমতি পাইলেন। কিন্তু বাংলার কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ এত বড় আন্দোলন সত্ত্বেও অন্তর্দ্বন্দ্বে বিভ্রান্ত। জ্যোতির্ময়ী দল-বিশেষে যোগ না দিয়া স্বতন্ত্র কংগ্রেসী প্রার্থীরূপে কলিকাতা করপোরেশনের সাধারণ নির্বাচনে অবতীর্ণ হইলেন। শুনিয়াছি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কর্ণধারগণ এইরূপ ত্যাগপূত সেবিকার মনোনয়ন-পত্র অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। জ্যোতির্ময়ীর উপস্থিত বুদ্ধি ও শক্তিমত্তার পরিচয় ইতিপূর্বে একাধিকবার পাইয়াছি। স্বদেশবাসীদের হীন অপচেষ্টার বিরুদ্ধে তাঁহাকে দাঁড়াইতে দেখিয়াছি, আবার অশ্বারোহী পুলিশের লাঠি চার্যের সম্মুখেও তাঁহাকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া রক্তাক্ত কলেবর মেয়র সুভাষচন্দ্রকে আগলাইয়া রাখিতে অতি নিকট হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এরূপ শক্তিমতী আত্মভোলা মহিলাকে যখন জনৈক 'বিপ্লবী' লেখিকার দ্বারা বিসদৃশভাবে চিত্রিত হইতে দেখি তখন বাস্তবিকই বড় দুঃখ পাই। এরূপ শ্লথ লেখনী-পরিচালনা যত শীঘ্র ক্ষান্ত হয় ততই মঙ্গল। জ্যোতির্ময়ী যে সকলেরই শ্রদ্ধাপ্রীতি অর্জন করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার নাম শুনিবা মাত্র ধনী-দরিদ্র, আবার নিরক্ষর বাঙ্গালী অবাঙ্গালীর সকলেই তাঁহাকে ভোট দিতে স্বীকৃত হইলেন। এবারকার করপোরেশনের নির্বাচনে যাঁহারা বিভিন্ন পল্লী হইতে নির্বাচিত হন, তাঁহাদের মধ্যে জ্যোতির্ময়ী সর্বাধিক ভোট পান। এসময় দ্বিতীয় মহিলা সদস্য নির্বাচিত হন কুমুদিনী বসু। দ্বিতীয় বার জ্যোতির্ময়ী কংগ্রেসের সমর্থন পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু নানা কারণে জনৈক ঐশ্বর্যশালা অবাঞ্ছিত সদস্যের নিকট তিনি হারিয়া যান।

জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় 'বিপ্লবী' বলিতে সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝি তিনি হয়ত সেরূপ ছিলেন না। তাই গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনকালে বিপ্লবী নর নারীদের সন্ত্রাসন কার্যকে তিনি সমর্থন করিতে পারেন নাই কিন্তু সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টায় তাঁহার ত্যাগস্বীকার দুঃখবরণ এবং তেজস্বিতা-প্রদর্শন বহু বিপ্লবীরই অনুকরণীয় ছিল, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। সত্যাগ্রহ আন্দোলন কালে মেদিনীপুর জেলার জনসাধারণের সাহস অভূতপূর্ব এবং বিস্ময়কর। ঐ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে রাজপুরুষদের অত্যাচার-নিপীড়নও

চরমে উঠিয়াছিল। কলিকাতার নারী সত্যাগ্রহ-সমিতির পক্ষে অন্য দুইজন মহিলা সহ জ্যোতির্ময়ী মেদিনীপুর পর্যটনে বাহির হন। তমলুকের পল্লী অঞ্চলে লবণ আইন ভঙ্গের ধূম পড়িয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট পেডি এখানে সেখানে টহল করিয়া বেড়াইতেছিলেন লবণ আইন ভঙ্গকারীদের সায়েস্তা করিবার নিমিত্ত। পেডির বেটনের আঘাতে একটি দশ বৎসরের বালক রক্তাক্ত কলেবরে অচৈতন্য হইয়া পড়ে। কিন্তু তখনও বালকটির হস্তে শোভা পাইতেছিল জাতীয় পতাকা। বালকটিকে তমলুক হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। তখন জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় সঙ্গীনীদের সহ তমলুকে পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহারা সব কথা শুনিয়া হতভম্ব হইয়া যান। বালকটিকে কোলে শোয়াইয়া রাখা অবস্থায় তাঁহারা তিনজনে ফটো তুলাইবার আয়োজন করেন। মেদিনীপুর সফর অন্তে কলিকাতায় আসিয়া জ্যোতির্ময়ী নেতৃবৃন্দকে এই সব কঠোর অত্যাচারের কথা বিবৃত করেন। আমরাও তাঁহার মুখে এই সকল কথা শুনিলাম। জ্যোতির্ময়ী আদতে ছিলেন শিক্ষাব্রতী এবং সাহিত্যিক। তাঁহার রচনা ছিল কাব্যধর্মী। আমার অনুরোধে তিনি মর্মন্তুদ ঘটনাটি লইয়া "The Crucifixion" নামে একটি প্রবন্ধ 'মডার্ণ রিভিয়ু'র জন্য লেখেন। লেখার সঙ্গে উক্ত ফটোটিও ছাপানো হইয়াছিল। এই রচনাটি তখন বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। জ্যোতির্ময়ী একদিন কথায় কথায় বলেন, সার্ পি, সি, রায় তাঁহাকে বলিয়াছেন, 'তুমি পেডির উপর বড় কঠোর হয়েছ, তুমি এত নিষ্ঠুর হতে পার!" নিতান্ত কর্তব্য বোধেই প্রীতি-পরায়ণা জ্যোতির্ময়ী এত 'কঠোর' ও 'নিষ্ঠুর' হইয়াছিলেন। মেদিনীপুরের পরবর্তী বিপ্লবাত্মক কার্যাবলী এখন ইতিহাসের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে।

রাজনীতি এবং সমাজ-সেবার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোতির্ময়ীর ভিতরকার সাহিত্যিক মানুষটিও উঁকিঝুঁকি মারিত। যখন সুযোগ ঘটিত তখন তিনি প্রাণমন ঢালিয়া সাহিত্য-সেবায় প্রবৃত্ত হইতেন। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত আর্যস্থান ইন্‌স্যুরেন্স নামক জীবনবীমা কোম্পানীর তিনি ছিলেন অন্যতম ডিরেক্টর। আবার তৎসম্পাদিত 'ইন্‌স্যুরেন্স ওয়ার্ল্ড' মাসিক পত্রিকার নিয়মিত লেখিকাও ছিলেন তিনি। জ্যোতির্ময়ী "classicus" ছদ্মনামে মাসের পর মাস জীবনবীমার অগ্রদূতগণের জীবন-কাহিনী স্থললিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি পুনরায় সাহিত্য-সাধনায় মন দিয়াছিলেন। তাঁহার একটি রচনা (মনে হয় শেষ রচনা) হিন্দু মহাসভা

কর্তৃক পরিচালিত 'হিন্দুস্থান' সাপ্তাহিকের শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছি।

শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ জ্যোতির্ময়ী কিছুকাল তিনি সক্রিয় রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তিনি কখনও স্থির থাকিতে পারেন নাই। মহাসমর শেষে ভারতবর্ষে মুক্তি-আন্দোলন অতিমাত্রায় ব্যাপক হইয়া পড়ে। তখন ভেদাভেদ ভুলিয়া হিন্দু মুসলমান শিখ খৃষ্টান সকলেই যেন একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিল। যুদ্ধকালীন পরিপোষিত হিন্দু-মুসলমান ভেদনীতি আর যেন থই পাইতেছিল না। দিল্লীতে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার বোম্বাইয়ের নৌবিদ্রোহ প্রভৃতি ও যুব আন্দোলন ভারতের আশু মুক্তিলাভ প্রচেষ্টার এক একটি স্তর। ধর্মতলা ষ্ট্রীটে ছাত্র-শোভাযাত্রা আটক করা হইয়াছে, সৈন্য মোতায়েন করা হইল। নির্দিষ্ট সীমানা অতিক্রম করিলেই গুলি চলিবে। যুবকগণ কে আগে বুক পাতিয়া গুলি খাইবে তাহা হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা! সমস্ত রাত্রি ছাত্রগণ রাস্তায়। জ্যোতির্ময়ী গৃহে স্থির থাকিতে পারিলেন না; যুবকদের পার্শ্বে আসিয়া সমস্তক্ষণ রহিলেন।

সমগ্র কলিকাতা নগরীতে ব্রিটিশ বিদ্বেষ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। যেখানেই গোরা সৈন্য সেখানেই তাড়া খাইতেছে। দক্ষিণ কলিকাতায় এরূপ একটি পলায়নপর গোরার জিপ গাড়ী জ্যোতির্ময়ীর গাড়ীর পিছন হইতে অতি জোরে ধাক্কা দেয়। জ্যোতির্ময়ী বাহির হইয়াছিলেন বিপন্নকে রক্ষার জন্য। গাড়ী চুরমার হইল জ্যোতির্ময়ী অজ্ঞান হইলেন। তাঁহার চেতনা আর ফিরিয়া আসে নাই। সেইদিনই মারা যান। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পঙ্‌ক্তি দুইটি আবার স্মরণ করিলাম—

"সাথে করে এনেছিলে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

বিপিনচন্দ্র পাল

১৯২১ সন। বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন। বাংলাদেশে তখন মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন বিশেষ সাড়া জাগাইয়াছে। বিখ্যাত ব্যারিস্টার সি. আর. দাশ আইন-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' হইয়াছেন। ত্যাগ ও সেবার প্রেরণায় তখন ভারতের আকাশ-বাতাস মথিত। মহাত্মা গান্ধী যেন 'এন্‌জেল' বা ঈশ্বর-প্রেরিত দূত-রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ। তাঁহার কথা আমাদের, বিশেষতঃ তরুণ-সমাজের নিকট 'গস্‌পেল' বা ভগবানের আদেশ। মহাত্মা গান্ধী আন্দোলন আরম্ভ করিয়াই বলিলেন, কয়েকটি সর্ত সাপেক্ষে আমরা এক বৎসরের মধ্যে 'স্বরাজ' পাইব। সাধারণ মানুষ স্বভাবতই সর্তগুলির কথা ভুলিয়া গেল, কিন্তু একবৎসরের মধ্যে 'স্বরাজ' পাইব এই বিশ্বাস তাহাদের মধ্যে জাগিতে দেরী হইল না। আমরা তরুণেরা মাতিয়া গেলাম। প্রাদেশিক সম্মেলনের নির্দিষ্ট সভাপতি বিপিনচন্দ্র পাল বরিশালে আসিবেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আসিবেন। গুজব রটিয়া গেল, মহাত্মা গান্ধীও সম্মেলনে উপস্থিত থাকিবেন। গান্ধী আসিবেন, আর কি কথা আছে? বাখরগঞ্জ জেলায় রেল-লাইন নাই, স্টীমারও সামান্য; ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূর হইতে লোক আসিয়া বরিশাল শহরে ভিড় করিতে লাগিল। আমরা হাঁটাপথে যথাসময়ে বরিশালে উপনীত হইলাম। ইতিপূর্বেই বিপিনচন্দ্রের নাম শুনিয়াছি। তিনি স্বদেশী নেতা, বড় বক্তা। কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে তিনি মহাত্মা গান্ধীর মূল অহিংস-অসহযোগ প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। তিনি একজন বড় লিখিয়ে বলিয়া ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে ধারণা জন্মিয়াছিল। তাঁহার "বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ" রচনাটি পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। সব যে বুঝিয়াছিলাম এমন কথা বলি না। আমরা তখন কিশোর, কৈশোরের এইরূপ জয়গানে আত্মপ্রসাদ লাভ করিব বৈকি।

বিপিনচন্দ্র বরিশালে পৌঁছিলেন সকালের দিকে। দীর্ঘ শোভাযাত্রা। আমরা আগন্তুকেরাও ইহাতে যোগ দিলাম। তখন বিপিনচন্দ্রকে চাক্ষুষ

দেখিলাম – নাতিদীর্ঘ মানুষটি, চোখে মুখে কি যেন একটা ভাবনার ছাপ লাগিয়া আছে। দুইজন মহিলা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, মনে হইল তাঁহার আত্মীয়া। সন্ধ্যায় আসিলেন চিত্তরঞ্জন। তিনি তখন 'দেশবন্ধু'। স্টীমার-ঘাটে যেন লোক ভাঙিয়া পড়িল। পুরনো কংগ্রেসীরা (প্রায় সবাই চরম-পন্থী; কারণ নরমপন্থীরা তখন কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছেন) এই সম্মেলনে অনেকে উপস্থিত ছিলেন। আবার মহাত্মাজীর ত্যাগমন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ যত প্রাদেশিক নেতাও এখানে সমবেত। অশ্বিনীকুমার দত্ত অসুস্থতা সত্ত্বেও অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি পদ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সকলকে আদর-আপ্যায়নে ব্যস্ত। চিত্তরঞ্জন পুরনো কংগ্রেসীদের নিকট 'দাশসাহেব' বলিয়া পরিচিত। অশ্বিনীকুমারকেও বলিতে শুনিলাম, 'দাশসাহেব'।

অশ্বিনীকুমার ও বিপিনচন্দ্রের যোগাযোগ বহুদিনের। বয়সে অশ্বিনীকুমার তাঁহার চেয়ে বৎসর দুয়েকের বড়। প্রায় প্রতিষ্ঠাবধিই উভয়ে কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক। আবার উভয়ে প্রগতিবাদী। বিপিনচন্দ্র ব্রাহ্ম, কাজেই তিনি সর্বপ্রকার সামাজিক মুক্তির পক্ষপাতী, অশ্বিনীকুমার ব্রাহ্ম না-হইয়াও সংস্কারমুক্ত এবং সমাজের সর্বপ্রকার উন্নতিসাধনে তৎপর। এক সময়ে অশ্বিনীকুমার সমাজের এতই সংস্কারপ্রয়াসী হইয়াছিলেন যে, তিনি 'পূর্ববঙ্গের কেশবচন্দ্র সেন' বলিয়া আখ্যাত হন। বিপিনচন্দ্র ও অশ্বিনীকুমার উভয়ে প্রচলিত 'গুরুবাদ'-এর সমর্থন করিতেন না; কিন্তু দুইজনেই একদা ব্রাহ্মনেতা এবং ভক্তপ্রবর বলিয়া পরিচিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র চমৎকার লিখিয়াছেন তাঁহার ইংরেজী আত্মজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ডে (অসম্পূর্ণ)। তিনি জপ করার মৌলিক গুণের কথা জানিয়াছিলেন বিজয়কৃষ্ণের নিকট হইতে। মনের একাগ্রতা-সম্পাদনে জপের কার্যকারিতা কত, এ কথা তিনি বন্ধুর মুখে শুনিয়াছিলেন, তিনি শ্রীহট্টে অবস্থানকালে বিপিনচন্দ্রকে কথার মধ্যেও জপ করিতে দেখিয়াছেন। তবে তাঁহার জপ-সাধন চলিত সাধারণতঃ লোকচক্ষুর অন্তরালে। আমি একবার তাঁহাকে মাঘোৎসবকালে অনুষ্ঠিত শোভাযাত্রার সঙ্গে দেখিয়াছিলাম। উড়ানির ভিতরে তিনি কি করিতেছিলেন, ঠোঁট নড়িতেছিল। পরবর্তীকালে বিপিনচন্দ্রের আত্মজীবনী পড়িয়া এবং বন্ধু প্রমুখাৎ উক্ত কথাগুলি শুনিয়া আমার কৌতূহল নিরসন হয়। বিপিনচন্দ্র এবং অশ্বিনীকুমার স্বদেশী-আন্দোলনকালেও ছিলেন ইহার

অগ্রভাগে। অশ্বিনীকুমার লোকশিক্ষকরূপে কেমন করিয়া লোকচিত্ত জয় করিয়াছিলেন তাহার কথাও বিপিনচন্দ্র সম্মেলনের বহু বৎসর পূর্বে 'চরিত-কথা'য় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উভয়ের মধ্যে পূর্বের ঘনিষ্ঠতা সুনিবিড় ; একজন অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, অন্যজন মূল সভাপতি ; যেন মণিকাঞ্চন-সংযোগ।

সম্মেলনের দিন সকালে শুনিলাম- মহাত্মা গান্ধী আসিবেন না ; আমরা দূরাগত তরুণেরা বিষণ্ণ হইলাম। তবু বিপুল উত্তেজনা ও গোলমালের মধ্যে সুবৃহৎ মণ্ডপে সম্মেলনের মূল অধিবেশন আরম্ভ হইল। অশ্বিনীকুমারের গলা ভাঙিয়া গিয়াছিল, একপৃষ্ঠা মাত্র পাঠ করিয়া অন্যের উপর পড়ার ভার দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার ভাষণ ছিল, বাংলায়। সভাপতি বিপিনচন্দ্র ইংরেজীতে লিখিত অভিভাষণের মর্ম বাংলায় বলিলেন। তখন মাইক ছিল না, বিরাট মণ্ডপের সর্বত্র তাঁহার আওয়াজ পৌঁছিল। আমরা দর্শকের গ্যালারি হইতে আওয়াজ শুনিলাম বটে, কিন্তু তেমন হৃদ্‌গত হইল না। পরদিন প্রাতে শিক্ষাব্রতী আচার্য জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করিতে তদীয় আবাসে (আশ্রম) গেলাম। দুই বৎসর পূর্বে তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া কিছু উপদেশ পাইয়াছিলাম। পূর্বপরিচয় দিয়া পদধূলি গ্রহণপূর্বক তাঁহার নিকট বসিলাম। এবারে বিপিনচন্দ্র পাল সত্য-সত্যই 'লজিক' বলিয়াছেন। তিনি বিপিনচন্দ্রের ভাষণে নিরতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছেন বোধ হইল। বরিশালের লোকের মুখে তখন এক কথা—'লজিক না ম্যাজিক', অর্থাৎ, যুক্তি না যাদু। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, এক বৎরের মধ্যে স্বরাজ-লাভ হইবে। বিপিনচন্দ্র যুক্তিপ্রমাণ-প্রয়োগে নিজ ভাষণে দেখাইলেন যে, এ উক্তি কখনও যুক্তিসঙ্গত নয়, ইহা 'যাদু' ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। সম্মেলনে উপস্থিত বর্ষীয়ান ব্যক্তিরা সকলেই বিপিনচন্দ্রের উক্তির যাথার্থ অনুভব করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী তখন আমাদের দৃষ্টি একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন, আমরা তখন কি 'লজিক আর ম্যাজিক'-এর মধ্যে তফাৎ করিতে পারি ? সম্মেলনের আভ্যন্তরীণ কার্য শেষ হইয়া গেল, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর অনুবর্তী লোকেরা সভাপতি বিপিনচন্দ্রের তীব্র সমালোচনা ভুলিতে পারিলেন না। তিনি যখন উপসংহার-বক্তৃতা করিতে উঠিয়া তাঁহার মতামত স্পষ্টতর করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি উত্তেজিত জনতার বিপুল চীৎকারে বক্তব্য অসমাপ্ত রাখিয়াই তাঁহাকে

আসনগ্রহণ করিতে হইল। ঠিক এই সময়টিতে আমি সভা-মণ্ডপে উপস্থিত ছিলাম না, পরে ঐ স্থানে আসিয়া শুনিলাম গোলমালের মধ্যে সভা ভাঙিয়া গিয়াছে। কিন্তু বিপিনচন্দ্রের সমালোচনার যাথার্থ অল্পদিনের মধ্যে আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করিতে লাগিলাম।

সেই স্বদেশী যুগে অরবিন্দ ঘোষ ('শ্রীঅরবিন্দ') বিপিনচন্দ্র পালকে বলিয়াছিলেন, ' Prophet of indian Nationalism', অর্থাৎ ভারতীয় জাতীয়তার ঋষি বা দার্শনিক ব্যাখ্যাতা। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ও আদর্শ লইয়া বিপিনচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এমনটি আর কাহারও দ্বারা হয় নাই।

আমাদের দেখা যুগের কথা বলিতেছি। মহাত্মা গান্ধী কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অহিংস-অসহযোগের যে প্রস্তাব আনেন তাহা ব্রিটিশ সরকারের দুইটি ভীষণ অন্যায় কার্যের প্রতিকারকল্পে উত্থাপিত বলিয়া ঘোষণা করা হয়। কিন্তু আমাদের স্বরাজ-লাভ না হইলে যে কোনো অন্যায়েরই স্থায়ী প্রতিকার হইবে না। বিপিনচন্দ্রের এই যুক্তি কংগ্রেসের প্রবীণ নেতারা মানিয়া লইলেন। মহাত্মা গান্ধী ইহার নিরিখে নিজ প্রস্তাবের হেতুবাদে স্বরাজ লাভই যে আমাদের মূল ও প্রধান লক্ষ্য এই কথা-কয়টি জুড়িয়া দিলেন। বিপিনচন্দ্র স্বাধীনতা তথা জাতীয় আন্দোলনে 'ধর্ম'কে জড়ানোর ঘোর বিপক্ষে ছিলেন। ধর্মকে রাজনীতির অঙ্গীভূত করার কুফল তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পান। রাষ্ট্রীয় আন্দোলন জাতীয়তার ভিত্তিতে হইবে, কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের ধর্মকে আশ্রয় করিয়া হইবে না। এই মত তিনি বরাবর পোষণ করিতেন। মিলনের এক একটা সুযোগ লইবার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মান্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমান সমাজের এক বিরাট অংশ হিন্দুদের বিরুদ্ধে তেরিয়া হইয়া উঠিল, আর ১৯২২-২৩ সন হইতেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা তাহারা সুরু করিয়া দিল। মহাত্মা গান্ধী হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য স্থাপনের কথা বার বার বলিতে লাগিলেন। ইহার ফল হইল উল্টা; বাহিরের লোকেরা ভাবিল—ভারতে হিন্দু-মুসলমানের মিল নাই, আবার মুসলমানেরা ভাবিতে লাগিল—তাহারা বিনা ভারতের স্বরাজ-লাভ হইবে না; কাজেই দর-কষাকষির মনোভাব ঐ সময় হইতেই দেখা দিল। দেশবন্ধুর হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট বা চুক্তি সাময়িক প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত হইলেও, ইহার স্থায়ী কুফলের কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বিপিনচন্দ্রের

দূরদৃষ্টি ছিল অসাধারণ। তিনি 'ইংলিশম্যান' কাগজে এবং অন্যান্য পত্রিকায় এই কুফলের কথা নিজস্ব দার্শনিক ভঙ্গীতে ব্যক্ত করিতে থাকেন। সমাজে চিন্তাশীল লোক ক'জনা? তাহার উপর দূরদৃষ্টিই বা ক'জনের থাকে? বিপিনচন্দ্র হক্‌-কথা বলিয়া লোকপ্রিয়তা হারাইলেন। যে. স্বরাজ্য-দল 'স্বতন্ত্র-প্রার্থী' বিপিনচন্দ্রকে ভারতীয় আইন-পরিষদের সদস্য-নির্বাচনে একসময়ে সহায়তা করিয়াছিলেন তাঁহারা বিরূপ হইলেন। ১৯২৮ সনের কলিকাতা কংগ্রেসে বিপিনচন্দ্র পালের মতো মনস্বী প্রবীণ রাজনীতিকের স্থান হইল না। তিনি বোধ হয় তাঁহার উক্তির যাথার্থ দূর হইতে দেখিয়া যুগপৎ কৌতুক ও দুঃখ অনুভব করিতেছিলেন। লালা লজপৎ রায় ১৯১৬. সনে কংগ্রেস-লীগ কর্তৃক নিষ্পন্ন লক্ষ্ণৌ-প্যাক্টকে একটি মস্তবড় ভুল (blunder) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা যতদূর জানি, বিপিনচন্দ্রের এই বিষয়ে ব্যাখ্যান বা উক্তির বহু পরে। হিন্দু-মুসলমানের 'ঐক্যের' প্রয়াস কি ভয়ানক পরিণতির মধ্যে পরিসমাপ্ত হইয়াছে তাহা আমরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছি।

বরিশালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের কথা বলিতে গিয়া অনেকদূর আসিয়াছি। দ্বিতীয়বারে বিপিনচন্দ্রকে দেখি কলিকাতায় অধুনালুপ্ত এলবার্ট-হলে। স্বামী বিবেকান্দের স্মৃতিসভা। সভাপতি কে হইয়াছিলেন মনে নাই। দুইজন বক্তার কথা এখনও স্মরণ আছে। ভারত-ধর্মের যথার্থ রূপ স্বামী বিবেকানন্দ পশ্চিমী মানুষের সম্মুখে যেভাবে ধরাইয়া দিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় পূর্বে কাহারও দ্বারা সম্ভব হয় নাই। বিপিনচন্দ্র একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের নিকট হইতে বৃত্তি লইয়া বিলাতে গিয়াছিলেন; সেখান হইতে ১৯০০ সনে চারি মাসের জন্য আমেরিকায় যান। সেই সময় তিনি মার্কিন মুল্লুকে স্বামীজীর প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া আসেন। সাম্প্রতিককালে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একটি বক্তৃতায় পশ্চিমের দেশগুলিতে এই প্রভাব-বিস্তৃতির কথা বর্ণনা করিয়াছেন। মেক্সিকোতে বিবেকানন্দের বাণীর অপূর্ব প্রভাব তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। নরওয়ে-সুইডেনও সেখানকার ভাষায় বিবেকানন্দ-সাহিত্যের অনুবাদ তাঁহার প্রভাবের কথা ঘোষণা করেনা কি?

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর স্মৃতিসভা। দেখি বিপিনচন্দ্র পাল উপস্থিত। কিছুক্ষণ পরে তিনি বক্তৃতা দিতে উঠিলেন।

শিবনাথের নেতৃত্বে হেয়ার স্কুলে রাত্রিকালে আগুন জ্বালিয়া (যজ্ঞ আকারে) কয়েকজন যুবক উহা প্রদক্ষিণ করেন এবং বটপত্রে লেখা কয়েকটি প্রতিজ্ঞা পাঠ করেন। এই প্রতিজ্ঞা বা সঙ্কল্পটির মধ্যে এই কথা ক'টিও ছিল—বিদেশী সরকারের অধীনে চাকরি গ্রহণ করিব না, যতদিন না এদেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনও 'স্বরাজ' কথাটির প্রচলন হয় নাই। 'স্বরাজ' অর্থে এই স্বায়ত্ত শাসন কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছিল। প্রতিজ্ঞাপত্রে আরও কয়েকটি দফা ছিল, এখানে সে-সবের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই যুবক-দলের মধ্যে ছিলেন – বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস, তারাকিশোর চৌধুরী ('সন্তদাস বাবাজী') প্রভৃতি। বিপিনচন্দ্র এ-দিনকার বক্তৃতায় এই বিষয় সবিস্তারে বিবৃত করিলেন। বক্তৃতায় একটি সম্পূর্ণ নূতন কথা শুনিলাম! তখনও আমরা ছাত্র, আমাদের জাতীয় ইতিহাস কতটুকুই-বা জানি। বিপিনচন্দ্রের এই বক্তৃতায় মুগ্ধ হইলাম। দেখিলাম, পরবর্তী সংখ্যায় 'প্রবাসী'তে সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বিপিনচন্দ্রের বক্তব্য-বিষয়টি সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন। তখনও 'প্রবাসী'তে বিপিনচন্দ্রের 'আমার সত্তর বৎসর' বাহির হইতে আরম্ভ হয় নাই। বিপিনচন্দ্রের ইংরেজী আত্মজীবনী প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে বা পরে। শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মজীবনীতে এই ঘটনাটির কথা কিছু ছিল, কিন্তু তখন ইহা আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে নাই। পরবর্তীকালে বিপিনচন্দ্রের ইংরেজী ও বাংলা আত্মকথায় এই প্রতিজ্ঞার বিষয়টি আরো পরিষ্কার হইয়াছে। এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণের গুরুত্ব যে কত তাহাও আমরা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছি। বিপিনচন্দ্র আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, ঐ সময়ে, গত শতাব্দীর সপ্তম দশকের শেষার্ধে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতার ফলে স্বদেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করার নিমিত্ত যুবচিত্তে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়াছিল। বিভিন্ন সভা-সমিতি করিয়া যুবকগণ ইহার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। বিপিনচন্দ্র বলেন, তিনি এমন অনেক সমিতির কথা জানেন, যাহার সদস্যগণ তরবারির দ্বারা বুক চিরিয়া রক্ত বাহির করিত এবং সেই রক্তে প্রত্যেককে স্বাধীনতা মূলক সঙ্কল্প-বাক্য লিখিয়া লইতে হইত। এইরূপ বহু সমিতির সভাপতি ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। সঙ্কল্প বিপ্লবাত্মক হইলেও, যুবকগণের মনে ইহাকে কর্মে রূপায়িত করার প্রচেষ্টার কথা তখনও জাগে নাই। শুধু রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক নহে, স্বদেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি-সাধনই তখনকার শিক্ষিতজনের

লক্ষ্য ছিল। এই প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রাজনারায়ণ-রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্জীবনী সভা'র কথা উল্লেখ করা যায়। বিপিনচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুগণ প্রগতিকামী ব্রাহ্মসমাজভুক্ত যুবক। তাঁহারা অগ্নিপ্রদক্ষিণপূর্বক যে সঙ্কল্প-বাক্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, রাজনৈতিক ছাড়া সামাজিক উন্নতি ও সংস্কার সাধনও ছিল ইহার এক-একটি প্রধান অঙ্গ। এই সঙ্কল্প-বাক্যের মধ্যেই আমরা বিপিন-চন্দ্রের জীবনাদর্শ বা জীবনের তন্ত্রের সম্যক পরিচয় পাই।

এই সঙ্কল্প বা প্রতিজ্ঞা যাহা তিনি বন্ধুদের সঙ্গে ১৮৭৭ সনে গ্রহণ করিয়াছিলেন বিপিনচন্দ্রের সমগ্র জীবন ও ধর্মকে উহা নিয়মিত করে। ইহার জন্য তাঁহাকে ত্যাগস্বীকার ও দুঃখবরণ করিতে হয় বিস্তর। বিপিনচন্দ্র ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত হইলেন। পিতা রক্ষণশীল হিন্দু। যে যুগে ব্রাহ্মধর্মগ্রহণ এবং বিবাহে ও আচার-আচরণে পূর্বসংস্কার বর্জন রক্ষণশীল হিন্দুদের নিকট ধর্মান্তর গ্রহণেরই নামান্তর বলিয়া গণ্য হইত। পিতৃ পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছেদের করুণ কাহিনী বিপিনচন্দ্র অনবদ্য ভাষায় আত্মজীবনীতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি প্রথম জীবনে শিক্ষান্তে অধ্যাপনা করেন। প্রথমে কটকে, পরে শ্রীহট্টে এবং শেষে বাঙ্গালোরে যান শিক্ষাব্রতী হইয়া। শ্রীহট্টে অবস্থানকালে তিনি 'পরিদর্শক' নামে একখানি সাপ্তাহিক-পত্র বাহির করিয়াছিলেন। বাঙ্গালোর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া 'ব্রাহ্ম পাব্লিক ওপিনিয়ন' নামক ইংরেজী সাপ্তাহিকের সহ-সম্পাদক রূপে নিযুক্ত হইলেন। গৃহমধ্যে মাত্র শিক্ষাদানে ব্রতী না হইয়া বাহিরের জগতে লোকশিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইলেন তিনি। বিপিন-চন্দ্র লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সহঃ-সম্পাদক হইয়া যান অষ্টম দশকের শেষদিকে। 'কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরী' নামে গত শতাব্দীতে একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল। বিপিনচন্দ্র এখানে বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়নে লিপ্ত থাকিতেন। তিনি ১৮৯০ সন হইতে দুইবৎসর কাল এখানকার গ্রন্থাগারটির লাইব্রেরিয়ান ছিলেন। অধ্যয়ন-মনন তাঁহার সমানে চলিত। এরূপ একটি গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ হইয়া তিনি অধ্যয়ন ও অনুশীলনে অতিশয় তৎপর হইলেন। কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী পরবর্তীকালে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী এবং বর্তমানে ন্যাশনাল লাইব্রেরীর অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। বিপিনচন্দ্র গ্রন্থাগারিকের পদ ত্যাগ করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের লাইসেন্স ইনস্পেক্টর হইয়াছিলেন। বিপিনচন্দ্র প্রতিজ্ঞায় অটল, কাজেই সরকারী কর্ম কখনও গ্রহণ করেন নাই: বেসরকারী

চাকরির এইখানেই শেষ। বিপিনচন্দ্র যে একেশ্বরবাদীদের পক্ষ হইতে বৃত্তিলাভে সমর্থ হইয়া বিলাত গিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বিলাতের ম্যানচেস্টার কলেজে ধর্মবিজ্ঞান-শিক্ষার নিমিত্তই এই বৃত্তিদানের ব্যবস্থা। বিপিনচন্দ্র লিখিয়াছেন, ওখানে গিয়া তিনি নূতন কিছুই বিশেষ শিখিতে পারেন নাই। ১৮৯৯ সনে তিনি বিলাত যান। ১৯০০ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চারি মাস থাকিয়া ঐ বৎসরেই তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

কর্মজীবনের এই কুড়ি বৎসরের মধ্যে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গেও বিশেষভাবে যুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কলিকাতার দুইটি জাতীয় সম্মেলন হয় যথাক্রমে ১৮৮৩ ও ১৮৮৫ সনে। বিপিনচন্দ্র ইহাতে উপস্থিত ছিলেন কিনা বলিতে পারি না। তবে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন (কলিকাতা, ১৮৮৬) হইতে তিনি ইহাতে বরাবর উপস্থিত হইয়া বিভিন্ন প্রস্তাবের আলোচনায় যোগদান করিতেন। তিনি আত্মজীবনীতে অতি জোরের সঙ্গে বলিয়াছেন যে, কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন হইতে যে বিষয়-নির্বাচনী কমিটি হয় তাহা বিপিনচন্দ্র ও অন্যান্য বাঙালী নেতাদের চেষ্টায়। আসামে চা-বাগানের শ্রমিকদের উপর ব্রিটিশ চা-করদের অত্যাচার-অনাচার সর্বজন-বিদিত। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে কংগ্রেসে প্রস্তাব আনিতে বিপিনচন্দ্র ও তদীয় বন্ধুগণ ব্যর্থকাম হন। প্রবীণ নেতৃবর্গ এই কারণ দর্শান যে, প্রস্তাবটি নিতান্তই প্রাদেশিক। কিন্তু প্রস্তাবটি মোটেই 'প্রাদেশিক' নয়, কারণ বিহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং মাদ্রাজ হইতেই বেশীর ভাগ শ্রমিক আসামের চা-বাগানে সরবরাহ হইত। যাহা হউক, এই ব্যর্থতা হইতে একটি সুফলের উদয় হইল; এই প্রস্তাবটি পুরোভাগে লইয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সৃষ্টি হইল ১৮৮৮ সনে। এই অধিবেশন কলিকাতায় হয় এবং ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ইহার পৌরোহিত্য করেন। বিপিনচন্দ্র পাল, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ চা-বাগানের শ্রমিকদের দুর্দশার কথা মর্মস্পর্শ ভাষায় ব্যক্ত করিলেন। দশ বৎসর অবিরাম চেষ্টার পর ১৮৯৬ সনে কংগ্রেসের কলিকাতা-অধিবেশনে এই বিষয়টি নিখিল-ভারতীয় বলিয়া স্বীকার করা হয়। কংগ্রেস এবারে শ্রমিকদের উন্নতি এবং চা-করদের নিয়ন্ত্রণ উদ্দেশ্যে প্রস্তাবও গ্রহণ করিলেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বঙ্গে এক নবযুগের সূচনা হইল। যে-সকল

মনস্বী ব্যক্তি চিন্তা ও কর্মদ্বারা এই নবযুগ-সৃজনে সহায়তা করেন, তাঁহাদের মধ্যে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, ভগিনী নিবেদিতা, সরলা দেবী, অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন অগ্রগণ্য। বিপিনচন্দ্র 'নিউ ইণ্ডিয়া' (১৯০১-০৮) সাপ্তাহিকে এই 'নিউস্পিরিট' বা নবভাবনা সম্পর্কে সপ্তাহের পর সপ্তাহ লেখনী পরিচালনা করিতে থাকেন। ত্যাগ-স্বীকার, দুঃখবরণ, স্বাবলম্বন এবং বীর্যের উদ্বোধন – মোটামুটি এইগুলি হইল এই নবভাবনার মূল উপজীব্য। প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথ, নিবেদিতা এবং বিপিনচন্দ্র ছিলেন এই নবভাবনার ব্যাখ্যাতা। কর্মেও তখন কেহ কেহ অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহারা বাঙালীর চিত্তে এই নবভাবনার বীজ ছড়াইয়া দিতে চাহিলেন। স্বদেশী-আন্দোলনের আরম্ভেই বাঙালী-চিত্তে যে অমন সাড়া জাগিয়াছিল তাহার মূলে ছিল পূর্ববর্তী চার-পাঁচ বৎসরের অবিরাম প্রযত্ন ও প্রচার। স্বদেশী-আন্দোলনের মধ্যে ১৯০৬ সনে যখন 'বন্দে মাতরম্' দৈনিক প্রকাশিত হয় তখন বিপিনচন্দ্র হন উহার প্রথম সম্পাদক। অল্পকাল পরে অরবিন্দ ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দ) ইহার সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন। প্রথমে 'নিউ ইণ্ডিয়া'য় এবং পরে 'নিউ ইণ্ডিয়া' ও 'বন্দে মাতরম্' উভয় পত্রে বিপিনচন্দ্র বাঙালী তথা ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয়-মুক্তি-সাধনকল্পে ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে লিখিতে লাগিলেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সিদ্ধিতে অন্যান্য দেশে অবলম্বিত 'Passive resistance' বা 'নিরুপদ্রব প্রতিরোধ'-নীতি ও আন্দোলন যে যুক্তিযুক্ত এবং তাহা যে সর্বজনসাধ্য তাহারও সবিশেষ ব্যাখ্যা করিলেন। স্বদেশী যুগের বিপ্লব-প্রচেষ্টাকে তিনি সমর্থন করিতে পারেন নাই, কিন্তু বৃটিশ-পাশ-মুক্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-অর্জন যে কাম্য এ মত তিনি ব্যক্ত করেন, এবং ইহার সাধনকল্পে নিরুপদ্রব-প্রতিরোধই যে মুখ্য অস্ত্র এ-কথাও তিনি বলিতে ভুলিলেন না। এই যে আদর্শ ও কর্মপদ্ধতিতে বিশ্বাসী একদল নেতা ও কর্মী স্বদেশী-আন্দোলনের মধ্যেই দেখা দিলেন, আর তাঁহারা 'এক্স্ট্রীমিস্ট' বা চরমপন্থী-দল বলিয়া প্রবীণদের দ্বারা অভিহিত হইলেন। এই দলের পুরোভাগে ছিলেন বঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল, পঞ্জাবে লালা লজপৎ রায় এবং মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলক। এই ত্রয়ীকে লোকে এককথায় 'লাল-বাল-পাল' বলিয়া উচ্চারণ করিত। স্বদেশী-আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার পক্ষে যে-সব বাঙালী-সন্তান জীবনপণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মনে হয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরেই

বিপিনচন্দ্রের স্থান। বিপিনচন্দ্র ব্রিটিশ আদালতে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করিয়া আদালত-অবমাননার দায়ে ছয়মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। কারামুক্তির পর (১৯০৭-০৮) তিনি অন্ধ্র ও মাদ্রাজ পরিভ্রমণ করেন। এই সময় ঐ ঐ প্রদেশে জাতীয় আদর্শমূলক যে-সকল বক্তৃতা তিনি করেন, তাহা দ্বারা ঐ অঞ্চলবাসীরা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন ও স্বদেশী-মন্ত্র গ্রহণ করেন। কয়েক বৎসর পূর্বে অন্ধ্র প্রত্যাগত জনৈক বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, সেখানকার প্রবীণ লোকেরা এখনও বিপিনচন্দ্র তথা বাংলার নিকট তাঁহাদের ঋণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতায় ও উপদেশে বাঙালী-অবাঙালী-নির্বিশেষে বহু লোকে ব্যক্তিগতভাবে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন।

বিপিনচন্দ্র ১৯০৮ সনে বিলাত-যাত্রা করিলেন। তিনি সেখানে তিন বৎসর কাটাইতে বাধ্য হন। এই প্রবাসকালও তিনি মাতৃভূমির সেবায় নিয়োজিত করেন। ১৯০৯ সনে 'স্বরাজ' নামে একখানি পাক্ষিক পত্র তাঁহার সম্পাদনায় লণ্ডন হইতে বাহির হইল। 'The Eteology of Bomb in Bengal' (বাংলার বোমার জন্মকথা) শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্গে বিপ্লববাদের উদ্ভবের বিষয় বিশদ করিয়া লিখিলেন। 'রিভিয়ু অফ রিভিয়ুজ' পত্রিকার সম্পাদক সুপণ্ডিত উইলিয়ম স্টেড-এর সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের বন্ধুত্ব হইয়াছিল। তিনি গুরুত্ব বিধায় নিজ পত্রিকায় এই প্রস্তাবটি হুবহু মুদ্রিত করিলেন। ইহা লইয়া ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে সরকারী মহলে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দেয়। সরকার স্টেড-এর কিছু করিতে পারিলেন না, কিন্তু বিপিনচন্দ্রকে ভুলিতে পারেন নাই ; ১৯১২ সনে বোম্বাইয়ে পদার্পণ করার সময়ে বিপিনচন্দ্র ধৃত হইলেন। ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং বহির্জগতের হালচাল দেখিয়া ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র সম্পর্কে বিপিনচন্দ্রের পূর্ব মতের এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। ইহার কথা একটু পরে বলিতেছি। বিপিনচন্দ্র এই সময়ে ক্রটি স্বীকার করিয়াও রেহাই পাইলেন না, সরাসরি বিচারে একমাসের নিমিত্ত তিনি কারারুদ্ধ হইলেন।

বিলাতে অবস্থানকালে বিপিনচন্দ্র ইউরোপীয় ও মার্কিন বিভিন্ন মনীষী ও চিন্তাশীল ব্যক্তির সংস্রবে আসেন। তিনি তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা এবং নিজ চিন্তা ও অনুধ্যানের ফলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেন যে, ভারতবর্ষের পক্ষে একক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মরক্ষা তৎকালীন আন্তর্জাতিক অবস্থায় কঠিন হইবে। 'বৃটিশ কমনওয়েল্‌থ' এই কথাটির তখন সবে আমদানি

হইয়াছে—সমান অংশীদার রূপেই ইহার অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি-সাধন এবং নিরাপত্তা বিধান সম্ভব। কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বিপিনচন্দ্র 'হিন্দু রিভিয়ু' নামক মাসিকপত্র বাহির করিলেন। ইহাতে তিনি তখনকার সদ্য উদ্ভূত 'প্যান-ইসলামিজ্‌ম' অর্থাৎ 'জগতের সকল মুসলমান জাতি এক হও'—এই আদর্শবাদ ভারতবর্ষের পক্ষে যে কি ভয়াবহ হইতে পারে তাহা সর্বপ্রথম বুঝাইয়া দেন। ইহার যথার্থতা বুঝিতে পরে বিলম্ব হয় নাই। ভাবী শাসন-সংস্কারের প্রস্তাবকে তিনি প্রথমে এই বলিয়া অভিনন্দিত করেন যে, 'স্বায়ত্ত' (self)-এর বদলে দায়িত্বপূর্ণ (responsible) শাসনতন্ত্র ইহাতে স্বীকৃত হইয়াছে। তিনি এ বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া লইবার জন্য লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে কংগ্রেস-প্রতিনিধি রূপে পুনরায় বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু সিংহল পর্যন্ত গিয়া তাঁহাকে সরকারের প্রতিবন্ধকতা হেতু ফিরিয়া আসিতে হয়। অল্পকাল পরে অবশ্য তাঁহাকে বিলাত যাইতে দেওয়া হইয়াছিল। বিপিনচন্দ্রের পরবর্তী জীবন-কথা নিজ অভিজ্ঞতা হইতে কিছু কিছু পূর্বেই বলিয়াছি। বিপিনচন্দ্র শিক্ষাব্রতী, সাংবাদিক, লোক-শিক্ষক এবং সাহিত্য-সাধক। তাঁহার সাহিত্য-সাধনার কথা বলার এখানে অবকাশ নাই। বিপিনচন্দ্র তিলে তিলে ত্যাগ-স্বীকার করিয়া জাতিকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিষয়ে আলোচনা করিয়া আমাদের পিতৃঋণ কথঞ্চিৎ পরিশোধ করিতে পারি।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নামের পূর্বে আমরা কখনও 'আচার্য' সংযুক্ত করি নাই। কিন্তু যে কারণে প্রফুল্লচন্দ্র বা জগদীশচন্দ্র 'আচার্য' সেই কারণে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও 'আচার্য' পদবাচ্য। তিনি ছিলেন সত্যিকারের লোকশিক্ষক। লোকশিক্ষার অন্যতম বাহন সাময়িকপত্র সম্পাদনা ও পরিচালনায় তিনি যে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন তাহা আধুনিক কালে বিরল। লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি নিশ্চয়ই 'আচার্য'। আবার সচরাচর যে অর্থে আমরা 'শিক্ষাব্রতী' কথাটি প্রয়োগ করি, সেই অর্থই অর্থাৎ শিক্ষাব্রতীরূপেই তিনি জীবন আরম্ভ করেন। প্রথমে কলিকাতার সিটি কলেজে অধ্যাপকরূপে এবং পরে এলাহাবাদ 'কায়স্থ পাঠশালার' প্রিন্সিপাল বা অধ্যক্ষরূপে জীবনের এক উৎকৃষ্টাংশ—পনের বৎসর কাল কাটাইয়াছিলেন। পরে, প্রাচীরের ভিতরে অল্প সংখ্যক লোককে শিক্ষা দানে তিনি আর তৃপ্ত থাকিতে পারিলেন না, শিক্ষাব্রতী অবস্থাতেই যে সাময়িকপত্রে সম্পাদনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষাব্রতীর কার্য ত্যাগ করিয়া উহারই মাধ্যমে ব্যাপকভাবে জাতির শিক্ষাব্রতীর কার্য উদ্‌যাপন করিয়া গেলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সমগ্র জাতির শিক্ষক, স্বতরাং তাঁহাকে 'আচার্য' না বলিলে কাহাকে বলিব ?

রামানন্দ বাবুর একটি বৃহৎ জীবনী গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক পাঠিকা ঐ গ্রন্থ হইতে তাঁহার জীবনাদর্শ এবং কর্মবহুল জীবনকথা জানিয়া লইতে পারিবেন। তাঁহার জীবনের শেষ পনের বৎসর আমি তাঁহার সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম। তাঁহাকে নানাভাবেই দেখিবার স্বযোগ ও সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। অপ্রত্যক্ষভাবে, দূর হইতে তাঁহাকে আমরা 'দেখিয়াছি', অর্থাৎ তাঁহার প্রভাব আমরা অনুভব করিয়াছি। ব্যক্তিগতভাবে বলিতে পারি, রাজনীতি, সামাজিক সমস্যা, সাহিত্য, সংস্কৃতি. স্বদেশীয় শিল্পকলা, কুটীরশিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিক্ষা. স্বাদেশিকতা প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহার মতামত কৈশোরে ও যৌবনে আমাদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার

করিয়াছে। এই কথা এবং তাঁহার প্রত্যক্ষ সংস্রবে থাকাকালীন বিষয়াদি এখানে কিছু কিছু বলিতেছি।

তখন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়ি। বয়স পনের ষোল। আমাদের বিদ্যালয়টি একেবারে পল্লী অঞ্চলে, কলিকাতা হইতে দুশ' মাইল দূরে। একটি তথাকথিত অনগ্রসর সম্প্রদায়ের গ্রামে এই বিদ্যালয়টি অবস্থিত ছিল। এই সম্প্রদায়ের নেতা ঐ অঞ্চলে যাইয়া প্রথম মহাসমরের অল্পকাল পূর্বে এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিয়াছিলেন। হয়ত প্রতিষ্ঠাবধিই এই বিদ্যালয়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী' রাখা হইত। 'হয়ত' বলিতেছি এইজন্য যে, আমি স্কুল লাইব্রেরিতে ১৯১৫-১৬ সনের প্রবাসী দেখিয়াছি, এবং লাইব্রেরি হইতে লইয়া গিয়া পাঠ করিয়াছি। সাময়িক পত্রিকায় আমাদের গ্রন্থাগারটি বেশ সমৃদ্ধ ছিল। প্রবাসী বাদে 'ভারতবর্ষ' 'সবুজপত্র' 'স্বাস্থ্য-সমাচার', এবং পরে 'মাসিক বসুমতী' স্কুলে রাখা হইত। এ সমুদয় পত্রিকাই কমবেশী পড়িতাম। কিন্তু 'প্রবাসী' পাঠের আগ্রহ কি জানি কেন উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। ক্রমে 'প্রবাসীর' গোঁড়া হইয়া উঠিলাম। পরবর্তীকালে ইহার কারণ নির্ণয়ের প্রয়াস পাইয়াছি, এবং কতকটা কারণ বুঝিয়াছি। অন্যান্য পত্রিকায় প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, কবিতা থাকিত। 'প্রবাসী' মাসিকে এসব তো থাকিতই আরো অনেক কিছু থাকিত। আমার নিজের পাঠের ধারা এখানে বলি। প্রথমেই ছোট ছোট কবিতাগুলি পড়িতাম। পরে ছোট অক্ষরে যে সব অনুচ্ছেদ থাকিত তাহার দিকে দৃষ্টি যাইত। প্রবন্ধ খুবই পড়িয়াছি। রবীন্দ্রনাথের 'ছোট ও বড়,' 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম', 'সত্যের আহ্বান' আমার বড়ই ভাল লাগিত। সব যে বুঝিতাম তাও নয়, বুঝিবার বয়সও তখন নয়। কিন্তু ভাল লাগিত, এবং কিছু কিছু বেশ বুঝিতাম। মাসিক পত্রের মধ্যে যেমন 'প্রবাসী'র গোঁড়া হইয়া উঠি, কবিতা ও প্রবন্ধ পড়িয়া আমি তেমন রবীন্দ্রনাথের ভক্ত হইয়া পড়িলাম। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-বিশ্রুত কবি, কিন্তু জনসাধারণ এবং অল্প শিক্ষিতদের মধ্যে তাঁহার রচনা প্রচারে 'প্রবাসী' যে কার্য করিয়াছে তাহা অনুপম। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা লেখা তখনও 'বোঝা যায় না' 'ধোঁয়াটে' এইরূপ অপবাদ শুনিতাম। বড়দের মুখে এই ধরনের কথা শুনিয়া দুঃখ পাইতাম। কই আমরা, কিশোররাও তো তাঁহার লেখা অনেকটা বুঝি, তবে কেন এরূপ মন্তব্য ?

যাহা হউক, সেই সময়েই আমার নিকট একটি প্রধান আকর্ষণ হইয়া

পড়িয়াছিল 'প্রবাসী'র 'বিবিধ প্রসঙ্গ'। প্রতি সংখ্যায় 'বিবিধ প্রসঙ্গ' সাগ্রহে পাঠ করিতাম। পুরানো প্রবাসী লইয়া গিয়াও এই 'প্রসঙ্গ' পড়িতাম। এতদিন পরে, সে আজ চল্লিশ বৎসর পূর্বের কথা, নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, 'প্রবাসী'র 'বিবিধ প্রসঙ্গ' পাঠে আমাদের মনুষ্যত্ব উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল। মানুষ আমরা, সবকিছুই আমাদের সাধ্যায়ত্ত; দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা পরাধীন হইয়াছি। কিন্তু আমাদের মনুষ্যত্ব জাগ্রত হইলে পরাধীনতার নাগপাশ কোথায়—যেন সকলের অজ্ঞাতসারেই খুলিয়া যাইবে। আমার মনে হয়, 'প্রবাসী'র সর্বশ্রেষ্ঠ দান আমাদের জাতীয় জীবনে এই মনুষ্যত্বের উদ্বোধন। কিন্তু ইহা তো সোজা কথা নয়। মানুষকে যেমন আচারে-আচরণে, কথায় ও কাজে সত্যনিষ্ঠ এবং সহানুভূতিশীল হইতে হইবে তেমনি নূতনকে গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গৌরবময় অতীত সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করিয়া লইতে হইবে। প্রবাসীর পৃষ্ঠায়, বিশেষ করিয়া 'বিবিধ প্রসঙ্গে' এই সমুদয়ের নির্দেশ থাকিত। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কার কোথায় কি রকম হইতেছে তাহার বিবরণ যেমন পাইতাম, তেমনি আমাদের স্বদেশের বৈজ্ঞানিকগণ আচার্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, তখনকার দিনের অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, নীলরতন ধর প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা দ্বারা কত কি আবিষ্কার করিয়া জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছেন তাহার আভাস আমরা এখানে পাইতাম। আবার বাংলা স্বকীয় গ্রামীণ শিল্পকলা রীতির পুনঃপ্রবর্তনকে প্রবাসী সাগ্রহে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছে। ইহার প্রচারের ভারও লইয়াছিল প্রবাসী। ভগিনী নিবেদিতার কৃত শিল্পরীতি নূতন ব্যাখ্যান ইংরেজী 'মডার্ণ-রিভিয়ু'তে ছাপাইয়া সম্পাদক রামানন্দ-বাবু তাহার অনুবাদ আবার প্রবাসীতেও প্রকাশিত করিতেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস, ঐতিহ্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পকলা, ভারতীয় বিজ্ঞান, জ্যোতিষ ধর্মের শাশ্বত রূপের পরিচয়, আদিবাসীদের কথা—কত কি লইয়া প্রবাসীর পৃষ্ঠা পূর্ণ হইত। এ সকলের 'ধরতাই' হিসাবে ছিল 'বিবিধ প্রসঙ্গ'। আমরা কৈশোরে স্বকীয় সম্পদ সম্বন্ধে যে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়াছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে যে নূতনকে গ্রহণ করিতেও উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলাম তাহার মূলে রহিয়াছে প্রবাসী, বিশেষ করিয়া ইহার 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র শিক্ষা।

মানুষটি কিন্তু বরাবর থাকিতেন অন্তরালে। প্রবাসীর সম্পাদক বা

পরিচালককে জানিবার কৌতূহল তখনও হয় নাই। আমরা প্রবাসী পাঠেই মশগুল। যতদূর বুদ্ধিগ্রাহ্য, ততটাই আমাদের চিত্তকে ভরপুর করিয়া রাখিত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসীর সম্পাদকের বিষয় জানিবারও আগ্রহ হইল। আমার স্বগ্রামবাসী এক বন্ধুর লেখা প্রবাসীতে বাহির হইতে লাগিল। তিনি পরিসংখ্যানের সাহায্যে তথ্যমূলক প্রবন্ধ লিখিতেন। প্রবাসী যেন কতকটা আপন হইয়া উঠিল। প্রবেশিকা পরীক্ষান্তে সহর হইতে যেদিন বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করি, তাহার পূর্বদিন স্বনামধন্য অশ্বিনীকুমার দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসি। 'কি করিব' জিজ্ঞাসা করিলে প্রথমে খানিকটা রহস্য করিয়া পরে বলিয়াছিলেন, প্রবেশিকা পাশ করিয়াই কোন টেক্‌নিক্যাল লাইনে গেলে ভাল। আমিও কলিকাতায় আসিয়া এইরূপ কিছু করিতে প্রয়াসী হইলাম। কিন্তু তখনই দেখিয়াছি 'টেক্‌নিক্যাল' কিছু শিখিতে হইলে সাধারণ কলেজী শিক্ষার চেয়ে অধিক অর্থের প্রয়োজন। ১৩২৯ সাল, জ্যৈষ্ঠ মাস। কালিকাতায় আসিয়াছি। উক্ত বন্ধুটির পরামর্শে প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একদিন সকালে দেখা করিলাম। আমি অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক, রামানন্দ বাবু তখন প্রৌঢ়। উভয়ের মধ্যে বেশী কথাবার্তা হয় নাই। তবে তাঁহার সেই প্রিয়দর্শন সৌম্য মূর্তি এখনও চক্ষুর সম্মুখে ভাসিতেছে। আমার প্রয়োজন বা কথা অতি সামান্য। কিন্তু একজন অপরিচিত তরুণের সঙ্গেও তিনি দেখা করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। রামানন্দ বাবু মিতভাষী ছিলেন, ইহার দুই বৎসর পরে সিটি কলেজে যখন পড়িতে আসি তখন কলেজের অধ্যক্ষ-অধ্যাপকদের লইয়া রচিত একটি ছড়া শুনিয়াছিলাম। ছড়াটিতে ব্যঙ্গ ছিল, কিন্তু অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় নাই; স্বল্প কথায় তাঁহাদের চরিত্র প্রকটিত হইয়াছিল। ছড়ার সবটা মনে নাই, শেষাংশ এই—"রামানন্দ মিতভাষী, উমেশ দত্ত দিদিমা"। রামানন্দ মানে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, আর উমেশ দত্ত—অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত।

কয়েক বৎসর পরে। রামানন্দ বাবু ইতিমধ্যে রাষ্ট্রসংঘের আমন্ত্রণে জেনেভায় গিয়াছিলেন। ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তিনি "সম্পাদকের চিঠি" মারফত প্রতি মাসে আমাদের পরিবেশন করিয়াছেন। ভারতবর্ষেও রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন সুরু হইয়া গিয়াছে। জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে। মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য মুসলিম ও সরকারী ইউরোপীয় জোট তখন স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল।

সরকারী নীতি তথা পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা এই জোটে ইন্ধন জোগাইতে লাগিয়া গিয়াছে। হিন্দুদের পক্ষেও সংঘবদ্ধ হওয়া এই সময় বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়ে। হিন্দু মহাসভা এই উদ্দেশ্যে গড়িয়া ওঠে। ঘোর জাতীয়তাবাদী হইয়াও রামানন্দবাবু মুসলিম-ইউরোপীয় জোটের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন, এখন তিনি আর লেখনী পরিচালনা করিয়াই ক্ষান্ত নন, কর্মক্ষেত্রেও অবতীর্ণ হইলেন। ১৯২৯ সনে তিনি নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার আহ্‌মদাবাদ অধিবেশনে পৌরোহিত্য করিলেন। তাঁহার অভিভাষণ উক্ত জাতীয়তার ভিত্তিতে রচিত, এবং নানা যুক্তি দিয়া তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের অসঙ্গত ও জাতীয়তাবিধ্বংসী দাবির বিরুদ্ধে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিলেন। রামানন্দ বাবুর মতামত এতদিন নিজ পত্রিকা দুইখানি—প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুর মাধ্যমেই প্রকাশিত হইত, এখন তিনি সর্বজনসমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তবে তিনি রাজনৈতিক নেতা হইবার কখনও দাবি রাখেন নাই। তাঁহার প্রকৃতি ছিল ভিন্ন রূপ। কিন্তু যখনই জাতির সমক্ষে কোন জাতীয়তাবিধ্বংসী ও স্বাধীনতা-পরিপন্থী সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে তখন তিনি প্রকাশ্যে আসিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। ১৯৩৫ সনে কংগ্রেসের 'না-গ্রহণ না বর্জন' নীতির বিরুদ্ধে যখন কলিকাতায় 'কংগ্রেস ন্যাশনালিষ্ট কন্‌ফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয় তখন তিনি তাহাতে সাগ্রহে এবং সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক সভা-সমিতি ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে তিনি এই সময় হইতে হামেশা যোগ দিতে লাগিলেন। এলবার্ট হলে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে এবং আরো কোন কোন স্থানে তাঁহার তথ্যপূর্ণ ভাষণ ও বক্তৃতা শুনিয়াছি, এবং শুনিয়া আমরা তরুণেরা বিশেষ উপকৃতও হইয়াছি। এই অনাড়ম্বর কর্মনিষ্ঠ মানুষটির সাক্ষাৎ সংস্রবে আসার সুযোগ ঘটিল অবিলম্বে।

১৯২৮ সন। সেবার কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন। বৎসর শেষে 'প্রবাসী'র সঙ্গে কার্যত সংযোগ স্থাপিত হইল। নূতন বৎসরের 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু'র সম্পাদকীয় বিভাগে শিক্ষানবিশরূপে কার্য সুরু করি। রামানন্দবাবুর প্রতাপ প্রত্যক্ষ করি। তিনি সকাল ১০টা নাগাদ আপিসে আসিতেন এবং বেশ কিছুক্ষণ থাকিতেন। সকল দিকেই তাঁহার শ্যেন দৃষ্টি। তাঁহার কাজের ধারার সঙ্গেও ক্রমশঃ পরিচিত হইলাম। প্রত্যহ কলিকাতার এবং মফঃস্বলের—কলিকাতা বাদে অন্য অঞ্চলকে তখন মফঃস্বল বলা হইত—কাগজ-পত্র তিনি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে পড়িতেন এবং প্রয়োজনীয় অংশ চিহ্নিত

করিয়া রাখিতেন। দেশী-বিদেশী সাময়িক পত্রাদিও তিনি একবার দেখিয়া লইতেন; কি কি অংশ গ্রহণযোগ্য সে সম্বন্ধেও মাঝে মাঝে নির্দেশ দিতেন। নানা ধরনের পুস্তক আপিসে আসিত; তাহার মধ্যেও কিছু কিছু তিনি পড়িয়া যাইতেন, তাহার নিদর্শন পাইতাম। ইংরেজী বাংলা দুইখানি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকার সম্পাদক তিনি। পনের দিন করিয়া এক এক খানি পত্রিকার জন্য তাঁহাকে পরিশ্রম করিতে হইত। সারা মাস ধরিয়া তিনি যে সব বিষয় অধ্যয়ন করিতেন এবং ভাবিতেন, পনেরো দিন অন্তর অন্তর প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গ এবং মডার্ণ রিভিয়ুর 'Notes' এ তাহা সন্নিবেশিত করিতেন। নিয়মিত অধ্যয়ন ও অনুধ্যানের ফলে তাঁহার মন্তব্যগুলি সারগর্ভ হইত।

প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ু সম্পর্কে রামানন্দবাবু কত গভীরভাবে চিন্তা করিতেন, মাঝে মাঝে তাঁহার কোন কোন উক্তি হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারিতাম। একদিন তিনি আমাদের প্রকোষ্ঠে আসিয়া অন্যান্য কথার মধ্যে বলিয়াছিলেন, "দেখুন, কত বিষয় ভাবি কিন্তু লিখবার সময় এগুলি যেন কোথায় পালিয়ে যেতে চায়। তাই যখনই যে কথা মনে আসে 'নোট' ক'রে রাখি। স্নান করতে করতে কোন বিষয় মনে এলো স্নান সেরেই ঘরে গিয়ে তা কাগজের টুকরোয় লিখি। আবার হয়ত খেতে বসেছি, হঠাৎ একটি জটিল বিষয়ের সপক্ষে কতকগুলি যুক্তি মনে এলো—আহার-অন্তে তা লিখে রাখি।" এরকম আরও কত কথাই না তাঁহার মুখ হইতে আমরা শুনিয়াছি। প্রায় প্রত্যেকটি মন্তব্যের পিছনেই এইরূপ অধ্যয়ন অনুধ্যান ছিল বলিয়াই তাহা পাঠক মাত্রেরই মনে ধরিত। কোন গুরুতর বিষয়ে প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ু, তথা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতামত জানিবার জন্য শত্রুমিত্র সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। কাহারও কাহারও ধারণা ছিল, এখনও হয়ত আছে, প্রবাসীর ইংরেজী রূপ হইল মডার্ণ রিভিয়ু। উভয়ের মধ্যে মত-সাম্য রহিয়াছে নিশ্চয়ই, কিন্তু অন্য সকল বিষয়েই ইহারা সম্পূর্ণ আলাদা। ভারতীয় সম্পদ ও ঐশ্বর্যের কথা, ভারতবর্ষের সর্ববিধ উন্নতির বিষয় উভয় পত্রিকার পৃষ্ঠাই পূর্ণ রাখিত, কিন্তু বিষয়সাম্য ছিল না। উভয় পত্রিকায়ই বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা থাকিত। রামানন্দবাবুর নিয়ম, সংযম ও নিষ্ঠা দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইতাম।

রামানন্দবাবু অনেক সময় বলিতেন, লোকরঞ্জনের জন্য আমাকে গল্প উপন্যাসও বেশি করিয়া ছাপিতে হয়, কিন্তু সেজন্য রুচি-শালীনতাকে বিসর্জন

দিব কেন? রুচি-শালীনতা বজায় রাখিয়া গল্প-গুণ-সমন্বিত যে কোন রচনা প্রবাসীতে স্থান পাইত। বস্তু থাকিলে নামী, কি অনামী সকল লেখকের রচনারই কদর করিতেন তিনি; প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হইলে প্রবাসীতে অবশ্যই স্থান পাইত। আমরা যখন প্রবাসীতে যোগ দিই তখন রচনা নির্বাচনের ভার অন্যের হাতে ছিল। তবে রামানন্দবাবুও যে লেখা না দেখিতেন এমন নয়। অধুনা বাংলা কথা-সাহিত্যে যে সব সাহিত্যিক প্রথিত-যশা হইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেরই প্রথম দিক্‌কার লেখা প্রবাসীতে বাহির হয়। অ-নামী বলিয়াই কোন লেখকের রচনা কখনও ফেরৎ যাইত না। তবে কতগুলি মৌলিক বিষয়ে তাঁহার স্পষ্ট মতামত ছিল। এই সব প্রকাশ সম্বন্ধে তিনি খুবই কঠোর ছিলেন। তিনি রচনা প্রকাশ অপ্রকাশ সম্বন্ধে সর্বদা কতগুলি নিয়ম মানিয়া চলিতেন। তাঁহাকে ইহার ব্যতিক্রম করিতে কদাচিত দেখা যাইত।

প্রবাসী মডার্ণ রিভিয়ুর প্রবন্ধসম্পদ সর্বজনস্বীকৃত। গুরুগম্ভীর অথচ তথ্য পূর্ণ এবং শিক্ষাপ্রদ রচনা প্রকাশে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। আজকাল দেখি, সংবাদপত্রের সম্পাদক বা পরিচালক হালকা ছাঁদের রচনার খুবই পক্ষপাতী। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, জীবনী, শিল্পকলা, লোক-সাহিত্য, অর্থশাস্ত্র, রাজনৈতিক সকলই রমণীয় করিয়া লিখিতে হইবে, যেন গল্প পড়িতেছি। আজকাল আবার 'রম্য রচনার' বড় ছড়াছড়ি। কঠিন বিষয় সরল সহজ করিয়া লিখুন, ভালই। কিন্তু সবই হালকা ছাঁদে লিখিতে হইবে এরূপ মনোবৃত্তির মূল খুঁজিয়া পাই না। কোন কোন মাসিক পত্র দেখিলে মনে হয়, এ যেন 'উড়েরযাত্রা' দেখিতে আসিয়াছি, এখানে রামও নাচেন, সীতাও নাচেন, লক্ষ্মণ, ভরত সকলেই নৃত্য করেন। রামানন্দ বাবুর সম্পাদনা-রীতি এরকমটি ছিল না। কঠিন বিষয় সোজা করিয়া লিখিতে তিনিও বলিতেন, কিন্তু উহা লইয়া ছেলেখেলার একান্ত বিরোধী ছিলেন তিনি। রামানন্দ বাবু তথ্যমূলক পরিসংখ্যান ভিত্তিতে রচনার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। পূর্বে আমার যে বন্ধুটির কথা বলিয়াছি তিনি ছিলেন নিতান্তই অ-নামী। কিন্তু তাঁহার রচনা প্রবাসী পত্রে স্থান পাইয়াছিল এই একই কারণে। আরও অনেকে আমার এই কথার সাক্ষ্য দিতে পারেন। তিনি যুবকদের পরিসংখ্যান মূলক রচনায় সর্বদাই উৎসাহ দিতেন। আমাদের এক শ্রদ্ধাভাজন অগ্রজ-প্রতিম বন্ধু মডার্ণ রিভিয়ুতে পরিসংখ্যান-ভিত্তিক রচনা লিখিয়া দেশ বিদেশে প্রসিদ্ধি লাভ

করিয়াছেন। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে তাঁহার প্রবন্ধ যখন রামানন্দবাবু মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশ করিতে থাকেন, তখন তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিলেন, "দেখুন,······বাবু, আপনার প্রবন্ধ আমরা তিনজন নিশ্চয়ই পড়ি। আপনি লেখক, তাই আপনি পড়েন, আমি সম্পাদক, তাই আমাকে পড়িতে হয়, আর পড়েন প্রুফ-রীডার বা প্রুফ-সংশোধক। একথা বলি এইজন্য যে, আমি এসব এই সময় প্রকাশ করা কর্তব্য বলিয়াই এরূপ করিয়া থাকি।" এই কথা-গুলির কি দৃঢ়তা, কি কর্তব্য-পরায়ণতা, কতখানি দেশাত্মবোধের পরিচায়ক, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

তখন স্বাধীনতা-কামীদের মধ্যেও বৃটিশ কর্তৃপক্ষের মত মুসলমান তোষণের প্রয়াস উৎকট হইয়া দেখা দিয়াছিল। এই সময় জাতীয়তার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া হিন্দু-সমাজের পক্ষে তাহার বিভিন্নমুখী কৃতির কথা যুক্তি প্রয়োগে যথাযোগ্য পরিসংখ্যান সাহায্যে সরকারী ও বেসরকারী কর্তৃপক্ষের এবং শিক্ষিত সাধারণের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। রামানন্দ বাবু কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি উচ্চতর আদর্শ তথা কর্তব্য ও দেশপ্রেমের সম্মুখে তথাকথিত লোকরঞ্জন, যাহাকে আমরা আজকাল কথায় কথায় popularity বলিয়া থাকি, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। প্রকৃত সাংবাদিকের কর্তব্য হইল লোকমত গঠন, জনমত নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন। রামানন্দবাবু আজীবন এই আদর্শ অনুযায়ী কাজ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গোলটেবিল বৈঠককালে, বিশেষত পার্লামেণ্টের জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির সাক্ষ্যদানের সময়ে এই সব পরিসংখ্যাপূর্ণ রচনা বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল। ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়িল। এই সেদিন একটি বিখ্যাত সাময়িক পত্রের সম্পাদকের সঙ্গে জনৈক বিখ্যাত ব্যক্তির সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। আমি বলিলাম, তিনি পপুলার হইতে চেষ্টা করিতেছেন। উত্তরে তিনি বলিলেন, unpopular না হইবার চেষ্টা করিতেছেন মাত্র, তাহাতে তো দোষ নাই! সংবাদপত্র কি সাময়িকপত্র পরিচালনায় লোকপ্রিয় কি অপ্রিয় এই কথাগুলি আমাদের ভুলিয়া যাইতে হইবে। লোকরঞ্জনের আয়োজন চাই; রামানন্দ বাবুও বলিতেন, "আমাকে কাগজটা বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে তো, গল্প উপন্যাস আমাকে দিতেই হয়।" খুবই ঠিক কথা, কিন্তু লোক-শিক্ষার ও লোকরঞ্জনের নিমিত্ত তিনি আরও অনেক উপায়

উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। প্রবাসীতে রাজনীতি, ভ্রমণকাহিনী, কষ্টিপাথর, পঞ্চশস্য, দেশের কথা, এবং কিছু পরে ছেলেদের পাততাড়ি, মহিলা সংবাদ, বেতালের বৈঠক, কত কি পরিবেশিত হইত। এগুলি তৃপ্তিকর অথচ জ্ঞানপ্রদ। কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে ছেলেদের পাততাড়িতে প্যারিমোহন সেনগুপ্তের 'কাফ্রিদের দেশ আফ্রিকায়' শীর্ষক একটি রোমাঞ্চকর অভিযান কাহিনী পাঠ করিয়া কতই না আনন্দ পাইয়াছিলাম, এখনও যেন তাহার রেশ অনুভব করিতেছি। জনপ্রিয়তার কথা এখানে আরো একটু বলি। আজকাল 'সার্কুলেশন দেবতা' নামে একটি কথার উদ্ভব হইয়াছে। এই দেবতার কাছে সাংবাদিক, সম্পাদক, পরিচালক সকলেই প্রতিদিন নতি জানাইতেছেন। যাহার ফলে বেশ দুপয়সা রোজগার হইতেছে সত্য, কিন্তু স্বদেশপ্রেম বা স্বজাতি প্রেমকে এই সার্কুলেশন দেবতার পায়ে বলি দেওয়া হইতেছে। সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রের আদর্শচ্যুতি জাতির প্রকর্ষের পক্ষে একটি ভীষণ বাধা হইয়া উঠিয়াছে। জাতীয় চরিত্র যে কতখানি শিথিল হইয়া পড়িতেছে তাহা আজই কিছু কিছু আমাদের চোখে ধরা পড়িয়াছে। 'মিলটন' সনেটে কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ আক্ষেপ করিয়া যেমন বলিয়াছিলেন, Milton ! Thou should'st be in this hour ! সেইরূপ আমাদের মনে হয় এই সংবাদপত্র মাৎস্যন্যায়ের দিনে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মত দৃঢ়চেতা সেবাপরায়ণ সাংবাদিকের একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

আমি যখন প্রবাসী মডার্ণ রিভিয়ুর সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করি, তাহার পূর্ব হইতেই ইহার সম্পাদনা সম্পর্কিত কাজের ভার নানাজনের উপর বাঁটিয়া দিয়াছিলেন। মডার্ণ রিভিয়ু মোটামুটি তিনি প্রায় সবটাই দেখিতেন। তবে ইহার কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ভার ক্রমে অন্যের উপর অংশতঃ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাহা হইলেও ইহাদের বিষয় নিয়ত চিন্তা করিতেন, কি উপায়ে ভাল লেখা সংগ্রহ করা যায় তাহার উপদেশ দিতেন, পত্রিকা দুখানি প্রকাশের পর পড়িয়া দেখিতেন। এখানে দুইটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। প্রবাসীর এক সংখ্যায় একই শব্দের বানান ভুল পর পর কয়েকটা হইয়াছিল। তাঁহার নিকট নিয়মিত ফাইল যাইত। প্রবাসী প্রকাশের পরই এই ভুলগুলি তাঁহার নজরে পড়িয়া থাকিবে। তিনি ভুলগুলি কাটিয়া, যতদূর মনে হয়, ঐ সংখ্যা প্রবাসী আমাদিগকে পাঠাইয়া দিলেন, কোন মন্তব্য করিলেন না। আমরা সতর্ক হইয়া গেলাম। বিশুদ্ধ এবং

পরিচ্ছন্ন ভাবে যাহাতে প্রতিটি রচনা প্রকাশিত হয় সেদিকে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি প্রায়ই বলিতেন, প্রুফের ভুল থাকিলে সবই মাটি হইয়া গেল। বর্তমানে সাময়িক পত্রে পুস্তকাদিতে প্রুফ দেখার শৈথিল্য বড়ই চোখে পড়ে, ইহা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এখন বিলাতে ছাপা বইয়েও তুই একটা ভুল নজরে পড়ে বটে, কিন্তু খুবই কদাচিৎ। নির্ভুল ছাপা হওয়া সর্বদা এবং সর্বত্রই বাঞ্ছনীয়। আমরা ছাপার জন্য এত খরচ করি, কিন্তু নির্ভুল ছাপা না হইলে যে তাহা অপাঠ্য হয় এ বোধ এখনও অনেকের মনে জন্মে নাই। রামানন্দবাবুর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিচালনার দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি এই। প্রবাসী বাহির হইয়াছে, আমরা আপিসে গিয়াছি। দেখি, রামানন্দবাবুর নিকট হইতে একখানা চিরকুট আসিল। প্রবাসীর প্রচ্ছদপট সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন। "......কে বলিবেন, আগে দর্শনধারী পিছে গুণবিচারী।" সেবার প্রচ্ছদপট তেমন চিত্তাকর্ষক হয় নাই—কি রঙে, কি চিত্রণে; তাই তাঁহার এই মন্তব্য! বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন ব্যক্তির হাতে ছাড়িয়া দিলেও তিনি বরাবর লাগাম ধরিয়া থাকিতেন। দীর্ঘ দিন পরেও তাই ভাবি, পত্রিকা সম্পাদনার কি সুষ্ঠু আদর্শই না তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন।

কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ কতই না প্রবাসীর মারফত পরিবেশিত হইয়াছে। কষ্টিপাথরেও তাঁহার বহু রচনার উদ্ধৃতি দেখিয়াছি, পড়িয়াছি ও পড়িয়া আনন্দ পাইয়াছি, জ্ঞান বাড়াইয়াছি। বহু নামী ও অ-নামী উৎকৃষ্ট গল্প এবং উপন্যাস-লেখকের-রচনার সঙ্গেও পরিচিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। প্রবন্ধ বিষয়ে প্রবাসীর সুনাম প্রথম হইতেই। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাঃ বামনদাস বসু, রজনীকান্ত গুহ প্রমুখ মনীষিগণের রচনা পাঠের সুযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পরলোকগত মহাপ্রাণ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির বিভিন্ন বিষয়ে রচনা প্রথম বর্ষ হইতেই প্রবাসীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইতেছিল। তাঁহার নূতন বানান অনুসারে নূতন ছেনি কাটাইয়া লইতেও রামানন্দবাবু অগ্রসর হইয়াছিলেন। পশু, গরু, সরু প্রভৃতি দেখিয়া সে যুগে কতই না হাসিয়াছি। নৃতত্ত্ববিদ্ শরৎচন্দ্র রায়, সুপণ্ডিত মহেশচন্দ্র ঘোষের বিস্তর রচনা প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত হইয়াছিল। উভয়ের সম্বন্ধেই সংক্ষিপ্ত জীবনী-প্রবন্ধ লিখিয়াছি শুধু মহেশচন্দ্রের লেখা ইংরেজী বাংলা প্রবন্ধ দেড়শতের

কাছাকাছি হইবে। বাংলা প্রবন্ধ বেশি, প্রায় নব্বুইটি। শরৎচন্দ্র রায়ের আদিবাসী সম্পর্কিত নৃতত্ত্বমূলক প্রবন্ধাবলী দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর যাবৎ প্রবাসীতে এবং ত্রিশ বৎসর যাবৎ মডার্ণ রিভিয়ুয়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। চিত্র ব্যাখ্যা ছাড়া সিস্টার নিবেদিতার বহু ঐতিহাসিক ও শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ মডার্ণ রিভিয়ুতে স্থান পায়। ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে রামানন্দবাবুর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড়। তাঁহার মৃত্যুতে তিনি যে সম্পাদকীয় লিখিয়াছিলেন তাহার তুলনা মেলা ভার। আচার্য যদুনাথ সরকারের ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলী মডার্ণ রিভিয়ুর গুরুত্ব যথেষ্ট বাড়াইয়া দিয়াছিল। আমাদের সময়ে তিনি নিয়মিতভাবে বাংলা প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন প্রবাসীতে। বিদেশী লেখকেরাও অনেক লিখিতেন। ডাঃ জে. টি. সাণ্ডারল্যাণ্ড তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার প্রবন্ধের কতক লইয়া দুইখানি পুস্তকও রামানন্দবাবু প্রকাশিত করেন। India in Bondage দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইতেই বিদেশী সরকার তাহা বাজেয়াপ্ত করিলেন এবং প্রকাশক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও মুদ্রাকর শ্রীসজনীকান্ত দাসকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন।

দীর্ঘকাল যাবৎ রামানন্দবাবুকে অতি নিকট হইতে দেখিয়াছি। তাঁহার সম্বন্ধে কত কথাই না মনে পড়ে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি ছিলেন বিশিষ্ট সদস্য এবং বহু বৎসর ধরিয়া সহকারী সভাপতি। সেখানেও বিভিন্ন উপলক্ষে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। সাধারণ সভায় এলবার্ট হল প্রভৃতিতে, তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছি। তিনি তথ্যের উপর, পরিসংখ্যানের উপর বিশেষ জোর দিতেন। তিনি বক্তা ছিলেন না, কিন্তু বক্তব্য বিষয়টি গুছাইয়া বেশ বলিতে পারিতেন। Facts are more eloquent then speeches—তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া এই কথার সারবত্তা বুঝিয়াছি। রামানন্দবাবুর সাহিত্য-মানস কৈশোর হইতেই প্রকটিত হইয়াছে। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন, তাঁহার প্রথম বাংলা রচনা, একখানি চিঠি বঙ্গবাসী কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পর আরও পত্র তিনি উক্ত সাপ্তাহিকে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি যখন বাঁকুড়া স্কুলের ছাত্র তখন বিখ্যাত সিভিলিয়ান, ঔপন্যাসিক ও চিন্তানেতা রমেশচন্দ্র দত্তের হস্ত হইতে একটি পুরস্কার লইয়াছিলেন। একথা বলিতে তাঁহার কত আনন্দ! এক বন্ধুর সঙ্গে তিনি কলেজে অধ্যয়নকালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটিতে গিয়াছিলেন। তিনি আমাদের বলিয়াছেন, "আমরা সেখানে গিয়াছি, কি কথা হইয়াছিল মনে নাই ; তবে তিনি যে আমাদের প্রত্যেককে দুইটি করিয়া রসগোল্লা খাইতে দিয়াছিলেন তাহা মনে আছে। তিনি বৈঠকখানার একটি তাকে হাঁড়িতে রসগোল্লা রাখিয়া দিতেন।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর পর রামানন্দবাবু তিন পয়সা মূল্যের একখানি পুস্তিকা * লিখিয়াছিলেন। তত্ত্ব কৌমুদী, Indian Messenger, ধর্মবন্ধু, দাসী, প্রদীপ এবং সর্বশেষে প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ু—তাঁহার সাংবাদিক জীবনের এক একটি ধাপ। অর্ধ শতাব্দীর সাময়িক সাহিত্যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দান অপরিমেয়।

লেখকদের সঙ্গে রামানন্দবাবুর সম্পর্ক ছিল খুবই প্রীতিপূর্ণ। তিনি তাঁহাদের অনেকের কথা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বলিতেন। প্রবীণ লেখকেরা কেহ কেহ দক্ষিণা লইতেন না বটে, কিন্তু রামানন্দবাবুর নিয়ম ছিল, নূতন পুরাতন নির্বিশেষে লেখক মাত্রকেই যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা প্রদান। 'যৎকিঞ্চিৎ' কথাটি প্রয়োগ করিতেছি এইজন্য যে, তিনি নিজেই এই মর্মে একাধিকবার আমাদের বলিয়াছেন, "আমি লেখকগণের লেখার উপযুক্ত মূল্য দিতে পারি না কিন্তু সামান্য কিছু দক্ষিণা বা প্রণামী তাঁদের দিয়ে থাকি।" মাসিকপত্রের লেখকদের দক্ষিণাদানের রীতি হয়ত তিনি প্রথম প্রবর্তন করেন নাই কিন্তু নিয়মিতভাবে লেখকদের দক্ষিণা দেওয়ার কৃতিত্ব তাঁহারই বোধহয় প্রাপ্য। এই প্রসঙ্গে সদ্য পরলোকগত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের (সেকালে 'হিতবাদী'র বৃদ্ধের বচন রচয়িতা 'শ্রীবৃদ্ধ' বিখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক) একটি কথা স্মরণ হইতেছে। তিনি একদিন আমাদিগকে বলিলেন, আমার তখন বয়স অল্প সবে কিছু কিছু লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। এই সময় এলাহাবাদের ঠিকানায় প্রবাসীতে একটি গল্প পাঠাই। কয়েক মাস পরে দেখি, আমার গল্প প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। আমি তো একখণ্ড প্রবাসী পাইলামই, তাহার উপর মণি-অর্ডারে আসিল পাঁচটি টাকা! রামানন্দবাবু মণি-অর্ডারের কুপনে নিজস্বাক্ষরে লিখিয়াছেন, আমি আপনার লেখার জন্য এই যৎসামান্য দক্ষিণা পাঠাইলাম, গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন। আমি

---

* বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ—৩১শে ডিসেম্বর ১৮৯১ পর্যন্ত যে ত্রৈমাসিক সংখ্যা প্রকাশিত হয় তাহাতে পুস্তিকাখানির নাম দেওয়া হইয়াছিল "স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর"—পৃষ্ঠা ১৬, প্রকাশকাল ৮ই সেপ্টেম্বর ১৮৯১।

পাঁচটি টাকা পেয়ে তো অবাক, লেখার জন্য আবার দক্ষিণা! আমি আনন্দিত তো হয়েছিলামই, তার চেয়ে বিস্ময়বোধও আমি কম করি নাই।

রামানন্দবাবুর স্নেহপ্রীতি বহু উদীয়মান সাহিত্যিকের ভাগ্যে জুটিয়াছিল। আমি-প্রীতি লাভে ধন্য হইয়াছিলাম। আমার রাধানাথ শিকদার প্রবন্ধ তাঁহাকে পড়িতে দিই। তিনি মনোনীত করিয়া দিলে প্রবাসীতে ছাপা হয়। প্রবন্ধ প্রকাশের মাসখানেকের মধ্যেই তিনি একদিন আমাদের ঘরে আসিয়া ডক্টর মেঘনাদ সাহার একখানি পত্র আমাকে দিয়া বলিলেন, পত্রখানি আমাকে লেখা বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য আপনি। আপনার রাধানাথ শিকদার প্রবন্ধটি অবিলম্বে ইংরেজী করিয়া তাঁহাকে পাঠান। তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী প্রবন্ধটির মোদ্দা কথা ইংরেজী করিয়া ডক্টর সাহাকে পাঠাইলাম। কিন্তু পরে ইহা প্রথমে মডার্ণ রিভিয়ুতেই প্রকাশিত হইল। কয়েক বৎসর পরে আমি প্রবাসী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাই। মধ্যে মধ্যে প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুতে লিখিতাম। আমাকে যে তিনি মনে রাখিয়াছেন তাহার প্রমাণ পাইলাম কিছু কালের মধ্যে। আপিসে গিয়া দেখি, আমার নামে একখানা চিঠি। চিঠিখানা খুলিয়া দেখি ডক্টর ফিলিমোর ডি. এস্‌সি (জরীপ বিভাগের জিওডেসি ডিপার্টমেণ্টের ডিরেক্টার) আমার বাসস্থানের খোঁজ করিয়া তাঁহাকে লিখিয়াছেন। উদ্দেশ্য রাধানাথ শিকদার সম্বন্ধে আলোচনা। রামানন্দবাবু পত্রে সত্বর আমাকে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে বলিয়াছেন। আমি যথা সময়ে গিয়া ডক্টর ফিলিমোরের সঙ্গে দেখা করিলাম।

পাঁচ বৎসরের কিছু অধিককাল পরে আমি পুনরায় প্রবাসী মডার্ণ রিভিয়ুর সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দিই। তখনও রামানন্দবাবু নিজে বিবিধ প্রসঙ্গ ও Notes রীতিমত লিখিতেছিলেন। কিন্তু এমনটি আর বেশিদিন চলিল না। তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি তখন ছিলেন আচার্য যদুনাথ সরকার। সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে রামানন্দবাবুকে একখানি মানপত্র দেওয়া হইল। মানপত্র দানের পর কয়েক মাসের মধ্যেই ১৯৪৩ সনের ৩০শে অক্টোবর তাঁহার ভবলীলা সমাপ্ত হয়। এরূপ প্রবীণ মাতৃ-সাধকের সান্নিধ্য লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২৮ সন। কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন আসন্ন। সেখানে মাঝে মাঝে যাই। কিন্তু মন যে অন্য ধরনের কাজ চায়। সীতানাথ আচার্যের সঙ্গে একদিন 'প্রবাসী' কার্যালয়ে গেলাম। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের সহিত পরিচয় হইল। 'শনিবারের চিঠি'র অন্যতম কর্ণধার ও 'প্রবাসী'র লেখকরূপে তাঁহার নামের সঙ্গে ইতিপূর্বেই আমার পরিচয় ঘটিয়াছিল। সাক্ষাৎ দর্শন ও পরিচয় লাভ এই প্রথম হইল। তাঁহার নির্দেশে সম্পাদকীয় বিভাগের প্রাথমিক সোপানস্বরূপ প্রবাসী প্রেসে প্রুফ দেখা শিখিতে শুরু করি। কংগ্রেস-সপ্তাহে প্রবাসী প্রেস ছাড়িলাম। কয়েক দিন গেল। পরে আবার 'প্রবাসী'-আপিসে গেলাম। সজনীবাবু ও আশোকবাবু (শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়) পরামর্শ করিয়া আমাকে 'প্রবাসী' 'মডার্ন রিভিউ'য়ের সম্পাদকীয় বিভাগে স্থান করিয়া দিলেন। এ তারিখটি ছিল ১৯২৯ সনের ১৪ই জানুয়ারি। ইহারই কয়দিন পূর্বে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'য়ের প্রধান সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন। ব্রজেন্দ্রবাবুর রচনা ইতিপূর্বেই কিছু কিছু পাঠ করিয়াছি। তাঁহার 'বেগম সমরু'র সমালোচনা সেই কৈশোরে 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় দেখি। 'প্রবাসী'তে কর্ম লইয়া যখন তিনি আসেন, তখনই তিনি মোগল-যুগের কোন কোন দিকের উপর আলোকপাত করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। এ হেন ব্রজেন্দ্রবাবুকে সাক্ষাৎ দেখিলাম। আমাদের উভয়েরই পূর্বে শ্রীযুক্ত নীরদ চৌধুরী সহকারী সম্পাদকরূপে যোগ দিয়াছিলেন।

'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'য়ের সম্পাদকীয় বিভাগে আমার শিক্ষা-নবিশি চলিতে লাগিল। এক বৎসরের মধ্যেই বাড়ি বদল করিয়া বর্তমান বাড়িতে আমরা চলিয়া আসি। ব্রজেন্দ্রনাথের কর্মতৎপরতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা ইতিমধ্যেই আমাকে বিমোহিত করিয়াছে। সম্পাদকীয় বিভাগে তাঁহার সঙ্গে কাজ করিতে করিতে গভীর অধ্যয়নে মন দিলাম। আমি যুবক, ভবিষ্যৎ সম্মুখে পড়িয়া আছে। ব্রজেন্দ্রবাবুর উপদেশে আমি

একখানি পিটম্যানের শর্টহ্যাণ্ড বই কিনিলাম, টাইপের ক্লাসে ভর্তি হইলাম। ব্রজেন্দ্রবাবু আমাকে শর্টহ্যাণ্ড শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তবে শর্টহ্যাণ্ড শেখাও বেশিদূর অগ্রসর হইল না। ইহা সত্ত্বেও ব্রজেন্দ্রনাথ আমার উপর বেশ একটা আস্থা পোষণ করিতেন। আমার মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ব'-গ্রাজুয়েটও যে কোন কাজে আসিতে পারে—এ বিশ্বাস তাঁহার মধ্যে তখনও লক্ষ্য করিয়াছি।

'প্রবাসী' আপিস হইতে ব্রজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে প্রায়ই পার্শিবাগানের আড্ডায় যাই। সেখানে তখন দিনের কাজের পর সুধীবৃন্দ সমবেত হইতেন। মধুর তিক্ত কষায় নানা রকমের আলোচনা হইত। ইহাদের সঙ্গে ক্রমে ব্রজেন্দ্রবাবু পরিচয় করাইয়া দিলেন। তখন রবিবাসর ব্রজেন্দ্রবাবু ও তাঁহার বন্ধুবর্গের উদ্যোগে পুনর্গঠিত হইয়াছে। পার্শিবাগানের আড্ডার প্রায় সকলেই ইহাতে যোগ দিলেন। 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক জলধর সেন সর্বাধ্যক্ষ, ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পাদক। ব্রজেন্দ্রবাবুর নির্দেশে আমি একটি মোটা খাতায় কার্যবিবরণী লিখিতাম। আচার্য যদুনাথ সরকার এখানে একবার মোগল-যুগের বিচার-প্রণালী সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। আর একদিনের কথা মনে আছে। সেই দিন করাচিতে কংগ্রেস। ক্যালকাটা হোটেলের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণের ঘরে শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধ একটি সিম্পোসিয়াম বা আলোচনা-বৈঠক বসে। প্রমথ চৌধুরী প্রধান বক্তা বা সভাপতি। আচার্য যদুনাথ, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সভাপতি মহাশয় ও আরও অনেকে আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। সভায় শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে কাহারও কাহারও অভিমত এখনও আমার স্মরণ আছে। কিন্তু এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন।

'প্রবাসী'-আপিসেই একদিন ব্রজেন্দ্রনাথ বলিলেন, একটি বড় জিনিস পাওয়া গিয়াছে। জানিতে বড়ই কৌতূহল হইল। ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে নীরদ বাবুর বাসায় গেলাম। দেখিলাম, শতাধিক বৎসরের পুরাতন 'সমাচার দর্পণে'র ফাইল। ব্রজেন্দ্রবাবুর কথায় আমিও ইহার পাতা উলটাইলাম। তাহার পর তাঁহার সঙ্গে একদিন শোভাবাজার রাজবাটিতে রাজা রাধাকান্ত দেবের পারিবারিক গ্রন্থাগারটি দেখিতে যাই। কত পুরাতন পুস্তক, পুরাতন ইংরেজী-বাংলা সংবাদপত্রের ফাইল, আবার একটা ঘরে বহু পুরাতন অথচ সুদৃশ্য ছবি। ইহার পরে বহু বার একত্রে এবং অনেক

সময় একা গিয়াছি। কিন্তু প্রথম দর্শনের আনন্দ আজও যেন হৃদয় ছুঁইয়া আছে। ব্রজেন্দ্রবাবু 'সমাচার দর্পণ' হইতে সংবাদ ও মন্তব্যগুলি সংকলন করিয়া 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় পাঠাইতে লাগিলেন। জলধরদাদাও সাগ্রহে তাহা ধারাবাহিকরূপে ছাপাইতে থাকেন। সুধী-মহলে কেমন একটা সাড়া পড়িয়া গেল। এই 'সমাচার দর্পণ' আবিষ্কারই ব্রজেন্দ্রনাথকে বাংলা সাহিত্যের গবেষণায় একান্তভাবে নিয়োজিত হইতে প্রেরণা যোগায়। তাঁহার 'সমাচার দর্পণে'র সংকলন আমাকে যেন অজ্ঞাতসারেই ধীরে ধীরে গবেষণার দিকে টানিতে লাগিল।

ব্রজেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে গত যুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন অর্গল ক্রমশই খুলিয়া যাইতে থাকে। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ্-মন্দিরেও যাওয়া দরকার বোধ করিলেন। প্রথম অবধি ব্রজেন্দ্রনাথের শরীর অপটু দেখিয়াছিলাম। আপিসের ছুটির পর কোথাও যাইতে হইলে প্রায়ই তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। আজ স্পষ্ট মনে পড়িতেছে, ব্রজেন্দ্রনাথ আমাকে লইয়া সাহিত্য-পরিষদে গেলেন। আপিস হইতে একসঙ্গে যাইতাম। কিছুকালের মধ্যেই তিনি 'রবি-বাসর' ছাড়িয়া সাহিত্য-পরিষদের সভ্য হইলেন। তাঁহার সভ্য হইবার দিন তারিখ পরিষৎ-দপ্তরে নিশ্চয়ই মিলিবে। যতদূর মনে হয় ব্রজেন্দ্রবাবু ১৯৩২ সনে ইহার সভ্য হন। আমিও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলাম। সাহিত্য-পরিষদের সভ্য হইলাম। ইহার অল্পকাল পরে ব্রজেন্দ্রনাথ পরিষদের কার্য-নির্বাহক-সমিতির সদস্য হইলেন। 'সমাচার দর্পণ' ও অন্যান্য পত্রিকা হইতে সংবাদ ও তথ্য আহরণ করিয়া সংকলন-গ্রন্থখানি প্রথম তিন খণ্ডে পর পর পরিষৎ প্রকাশিত করিল।

পরিষদের কথা বলিতে গিয়া একটু পরবর্তী বিষয়ে আসিয়া পড়িয়াছি। বস্তুত 'সমাচার দর্পণে'র ফাইল আবিষ্কারের পর হইতেই পুরাতন-সংবাদপত্র-অনুসন্ধান-কার্য যেন ব্রজেন্দ্রনাথকে একেবারে পাইয়া বসিল। আরও পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল মেলা সম্ভব পুরাতন গ্রন্থাগারগুলিতে। তাই পুরাতন গ্রন্থাগার কোথায় আছে জোর খোঁজ পড়িল। যতদূর মনে হয়, প্রথম আমরা—ব্রজেন্দ্রনাথ, নীরদবাবু ও আমি উত্তরপাড়ায় যাই। কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায় আমাদের জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন, তিনি আমাদিগকে উত্তরপাড়ার জমিদার রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ভবনে লইয়া গেলেন। রাসবিহারীবাবু ফরাসীসাহিত্য-রসিক। তাঁহার সুসজ্জিত গ্রন্থাগারটি

ফরাসী পুস্তকে পরিপূর্ণ। নীরদবাবুও ফরাসীনবিশ। আর যায় কোথায়! দুই জনে খুবই আলাপ জমিল। ব্রজেন্দ্রনাথ কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ভুলেন নাই। কিছুক্ষণ পরে আমরা গঙ্গাতীরে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী গৃহে উপনীত হইলাম। দীর্ঘশ্মশ্রু বর্ষীয়ান গ্রন্থাগারিক বসিয়া ছিলেন। আমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া গ্রন্থাগারটি দেখিতে লাগিলাম। দক্ষিণ পার্শ্বের বারান্দায় গিয়া দেখি, পুরাতন সংবাদপত্রের বাঁধানো ফাইল স্তূপীকৃত। দুই-এক খানির পাতা উল্টাইয়া দেখিলাম, 'বেঙ্গল ক্রনিকল' ১৮৩২ সনের। পরে এই ফাইলগুলির খোঁজ করিয়াছি, কিন্তু আর দেখিতে পাই নাই। কোথায় ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে কেহ বলিতে পারে না। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পক্ষে অপরিহার্য দেখিলাম বোধ হয় এক বৎসরের বাঁধানো—'সংবাদ রসরাজে'র ফাইল। ব্রজেন্দ্রনাথ তো খুবই খুশি। পরে গিয়া কাজ করা যাইবে বিবেচনায় রাখিয়া দেওয়া গেল। কিন্তু হায়, কিছু দিন পরে গিয়া সেগুলিও মিলিল না। ছেঁড়া 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র কয়েক সংখ্যা ছাড়া পরবর্তী সময়ে আর কিছুই পাই নাই।

ইহার পর ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে পুরাতন পত্র-পত্রিকার অনুসন্ধানে যাই বহরমপুরে। আচার্য যদুনাথের অনুজ অধ্যাপক বীরেন্দ্রনাথ সরকারের গৃহে ব্রজেন্দ্রনাথ ও আমি অতিথি হইলাম। পরদিন সকালে কাশিমবাজার হইতে কবি শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আসিলেন। আমরা ডাঃ রামদাস সেনের গ্রন্থাগার দেখিবার জন্যই বহরমপুর গিয়াছি। ভোরে সেখানে গেলাম। কিন্তু তখন গ্রন্থাগারটির অংশবিশেষের অবস্থা দেখিয়া যে দুঃখ পাইয়াছিলাম তাহা এখনও মনে অনুভব করিতেছি। আলমারির তাকে তাকে উই ইঁদুর বাসা করিয়াছে। বহু মূল্যবান পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা তাহাদের ভোগে লাগিয়াছে। বুভুক্ষু ব্রজেন্দ্রনাথের জন্য বড় একটা বাকি রাখে নাই। তথাপি কিছু কাজের জিনিস সেখানে পাওয়া গেল। আমরা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম বলিয়া মনে হইতেছে না। পরে হয়তো শৌরীন্দ্রনাথ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই অমূল্য গ্রন্থাগারটি ডাঃ সেনের বংশধরগণ ন্যাশনাল লাইব্রেরিকে দান করিয়াছেন। ঐ সময়ে জানা গেল, কাশিমবাজার মহারাজের গ্রন্থাগারেও কিছু পুরাতন কাগজ-পত্র পাওয়া যাইতে পারে। শৌরীনদাদার উপর সে ভার দিয়া আমরা কলিকাতায় ফিরিলাম। ইহার অল্প দিন পরে আমি একা কাশিমবাজার গিয়া 'সংবাদ প্রভাকরে'র বাঁধানো ফাইল আনি।

এই প্রসঙ্গে দুইটি কথা বলিতে চাই। একটি এখন বেশ কৌতুককর ঠেকে। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন সাবধানী পুরুষ। আমরা বর্ষাশেষে বহরমপুরে যাইতেছি। সেখানে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব। আমরা বহরমপুর যাত্রার পূর্বে প্রত্যেকে দশ গ্রেন করিয়া কুইনাইন খাইয়াছিলাম। ব্রজেন্দ্রবাবুর বোধ হয় ম্যালেরিয়ার ধাত, অহেতুক কুইনাইন সেবনে কোনও বৈলক্ষণ্য হয় নাই। কিন্তু বহরমপুর হইতে ফিরিয়া আসার পরও চার-পাঁচ দিন আমার মাথা ঘুরিয়াছিল। দ্বিতীয় কথাটি কিন্তু ভিন্ন এবং গুরুতর। আমরা যখনই যেখানে যাইতাম, ব্রজেন্দ্রবাবু সব খরচ নিজে বহন করিতেন। গবেষণা-কাজে যে কিছু অর্থব্যয়ও আবশ্যক, এ কথা আজিকার দিনেও যেন অনেকের স্বীকার করিতে বাধে।

এই পুরাতন-সংবাদপত্র-অনুসন্ধান-অভিযান সমানে চলিল। কলিকাতায় ও কলিকাতার বাহিরে আরও বহু জায়গায় আমরা যাই। কলিকাতায় একজন ছাত্রের হেপাজতে পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল আছে জানিয়া আপিসের ছুটির পর তাঁহার হস্টেলে রওনা হইলাম। সাড়ে পাঁচটা হইতে রাত্রি সাড়ে নয়টা পর্যন্ত অপেক্ষা করিবার পর তাঁহার দর্শন মিলিল। তিনি কয়েকখানা মাত্র ফাইল দেখাইলেন, মনে হইতেছে গুড়গুড়ে ভট্টাচার্যের 'সম্বাদ ভাস্করে'র। তাহাতেই আমাদের কি আনন্দ! শুনিলাম ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে (বর্তমানে ন্যাশনাল লাইব্রেরী) পুরাতন বাংলা সংবাদপত্রের ফাইল আছে। ছুটিলাম সেখানে। বাস্তবিকই কিছু কিছু পাওয়া গেল। ব্রজেন্দ্রনাথের সাক্‌রেদী করিতে করিতে আমারও দৃষ্টি এতদিনে খুলিয়া গেল। তখন 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' পুস্তক-আকারে ছাপা হইবে স্থির হইয়াছে। 'সমাচার দর্পণে'র সমসময়ের অন্যান্য প্রাপ্তব্য সংবাদপত্র হইতেও তথ্যাদি ইহার 'পরিশিষ্ট' অংশে দেওয়া হইবে। ইহার ব্যবস্থাও অচিরে করা হইল।

ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে পুরাতন পত্র-পত্রিকার ফাইল খুঁজিতে ও ঘাঁটিতে আরও বহু স্থানে গিয়াছি। এখানে সব উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। আমরা চাংড়িপোতা বিদ্যাভূষণ-লাইব্রেরিতে পর্যন্ত পরে গিয়াছি। সে কথা একটু পরে বলিব। সংবাদপত্র সংকলন ও সম্পাদন হইতে ব্রজেন্দ্রনাথের আর এক দিকে দৃষ্টি পড়িল। নাট্যশালার প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। তিনি যে এক সময়ে খুব অভিনয় দেখিতেন তাহাও গল্পচ্ছলে আমাদের বহু-

বার বলিয়াছেন। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় নানা বিষয়ের অবতারণা হইত, এখনও হয়,—নাট্যশালা সম্পর্কেও নানা কথা আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। তিনি ইহারও তথ্যমূলক ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইবার 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র প্রথম যুগের ফাইল ঘাঁটিবার পালা। ১৮৭০ সন হইতে ১৮৭৭ সন পর্যন্ত ইহার ফাইল দেখা হইল। পত্রিকা অফিসেও আমরা একত্রে গিয়াছি। তখন বর্তমান বিরাট ভবন হয় নাই। সম্মুখে পুরানো বাড়ির নিম্নতলে বসিয়া ফাইল দেখিতাম। ব্রজেন্দ্রনাথ প্রথম প্রথম গিয়াছেন, পরে আমিই যাইতাম। এই সময় রবীন্দ্র-জয়ন্তীর তোড়জোড় আরম্ভ হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রনাথের নির্দেশে ফাইল ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে রবীন্দ্রনাথের হিন্দু মেলায় (১৮৭৪) পঠিত একটি কবিতা মুদ্রিতাকারে পাইলাম। এটির নাম "হিন্দু মেলার উপহার"। ব্রজেন্দ্রনাথকে আসিয়া বলিলাম। তিনি ইহার সদ্ব্যবহার করিলেন। অনুসন্ধেয় তথ্যাদি ব্যতিরেকে এই সময় আরও অনেক কিছু পাওয়া যাইতে লাগিল।

এখানে 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' সম্পাদনার বিষয় কিছু বলি। আমরা যত জায়গায় গিয়া পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল পাইয়াছি বা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি, তাহা সমুদয়ই আমরা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছি। তখন ব্রজেন্দ্রবাবুর অপটু শরীরেও বিপুল শ্রমশক্তি ও অধ্যবসায় দেখিয়া আমিও সবিশেষ অনুপ্রাণিত হইয়াছি। প্রয়োজনীয় অংশ ব্রজেন্দ্রবাবু সর্বদা 'নোট' করিয়া লইতেন। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' প্রথম তিন খণ্ডে, ও পরে দুই খণ্ডে বিরাট আকারে বাহির হইয়াছে। ইহার সম্পাদকীয় অংশের পাতায় পাতায় সংবাদপত্র-সমুদ্র-মন্থনের পরিচয় মিলে। প্রতি সংস্করণে সংশোধন-সংযোজন সমানে চলিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতির উপর ব্রজেন্দ্রনাথ কতখানি আলোকপাত করিয়াছেন, ঐ সময়ে বাঙালী-জীবন সম্বন্ধে যতই আলোচনা চলিবে ততই বুঝা যাইবে। বাংলার নাট্যশালার ইতিহাস ও সাময়িকপত্রের ইতিহাস বিষয়ক পুস্তকে ঐকান্তিক অনুসন্ধিৎসা ও অপরিমেয় অধ্যবসায়ের ছাপ রহিয়াছে। সংবাদপত্রের ফাইল প্রথম দেখিবার কালে বহু জিনিসের প্রতি ব্রজেন্দ্রনাথের দৃষ্টি সম্যক্‌ভাবে খুলে নাই। শেষোক্ত দুইখানির তথ্যসংগ্রহে কাগজগুলির অনেকাংশই আবার নূতন করিয়া তাঁহাকে ঘাঁটিতে হইয়াছে। চাংড়িপোতাস্থ বিদ্যাভূষণলাইব্রেরিতে 'সোমপ্রকাশে'র বহু বর্ষের

ফাইল সংরক্ষিত আছে। আমরা সেখানে যাই এবং যতদূর মনে পড়ে, প্রথম দিন প্রায় পাঁচ ঘণ্টা একাদিক্রমে দেখিয়া কয়েক বৎসরের ফাইল দেখা শেষ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তথ্যাদি 'নোট' করিয়া লন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে ক্রমে ক্রমে 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' এবং 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' (পরে নাম দেওয়া হইয়াছে—'বাংলার নাট্যশালা') প্রকাশিত হইল। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে 'দেশীয় সাময়িক-পত্রের ইতিহাস' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকখানি প্রকাশের ভার, পরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ লন। এখন ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'বাংলার সাময়িকপত্র'। "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা" (রঞ্জন পাবলিশিং হাউস) ও "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"র (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ) সূত্রও পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ব্রজেন্দ্রনাথের মনে উদিত হইয়াছিল নিঃসন্দেহ।

ব্রজেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিয়া আমার ভিতরের সহজ ইতিহাস-অনুশীলন প্রবৃত্তি একটি সুস্পষ্ট পথ পাইয়াছে। ইতিহাসের গবেষণা যে কত বিপুল শ্রমসাধ্য এবং অধ্যবসায়-সাপেক্ষ তাহা বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। বস্তুত গত ও গতপূর্ব শতকে বাঙালী-জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রেরণাও তাঁহারই সাহচর্যের ফল। তাঁহার সাক্ষাৎ সংস্পর্শ হইতে—তাঁহার অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা ও নিষ্ঠা দেখিয়া আমি প্রেরণা পাইয়াছি, আবার নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যেও তাঁহার উৎসাহ-বাণীতেও অনুপ্রাণিত হইয়াছি। তাঁহার সঙ্গে প্রথম সাত বৎসর কাল এমন একাত্ম হইয়া কাজ করিয়াছি যে, অনেকে আজও তাহা উল্লেখ করিয়া থাকেন। আমার প্রতি ব্রজেন্দ্রনাথের অকপট প্রীতি ও প্রত্যয়ের এখানে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব।

তখন পরিষৎ দুইটা হইতে আটটা পর্যন্ত খোলা থাকিত। সংবাদপত্রের ফাইল ঘাঁটিতে গিয়া উপলব্ধি করিয়াছি, কলিকাতা-প্রবাসী পার্শী বণিক রুস্তমজী কাওয়াসজী এক বিরাট পুরুষ। তাঁহার সম্বন্ধে গবেষণা করিব স্থির করিয়া প্রত্যহ আপিসের ছুটির পর ব্রজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে পরিষদে যাই ও পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল দেখি। 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'র দশ বৎসরের ফাইল একে একে দেখিয়া ফেলি। কাওয়াসজী সম্বন্ধে যেখানে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিলাম ও পড়িয়া ফেলিলাম। এই সময় রাধাকান্ত দেবের গ্রন্থাগার ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে পুস্তকাদিও

ঘাঁটিলাম। প্রায় ছয় মাস অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের পর "রুস্তমজী কাওয়াসজী" প্রবন্ধ লিখি। ব্রজেন্দ্রনাথ পাঠ করিয়া এতই খুশি হইলেন যে আমাকে লইয়া জলধরদাদার বাড়িতে গেলেন। অত্যল্প সময়ের মধ্যে 'ভারতবর্ষে'র দুই সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়, স্বনামে লেখা প্রবন্ধ আমার এই প্রথম।

এই অল্পকালের মধ্যেই ব্রজেন্দ্রনাথের চরিত্রে অপূর্ব দৃঢ়তা লক্ষ্য করিলাম। রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে সত্যকার গবেষণা ব্রজেন্দ্রবাবুই মনে হয় প্রথম আরম্ভ করেন। কত কাগজপত্র ইণ্ডিয়া আপিস হইতে আনাইয়াছেন এবং কত প্রবন্ধ রামমোহনের উপর লিখিয়াছেন! এগুলির অধিকাংশই 'মডার্ন রিভিউ'য়ে বাহির হইয়াছিল। এই সময় রামমোহন সংক্রান্ত এমন কতকগুলি দলিলপত্র তাঁহার হস্তগত হয়, যাহার মর্ম প্রকাশিত হইলে যেমন রামমোহনের বহুমুখী প্রতিভার উপরে আলোকপাত করিবার সম্ভাবনা, তেমনই বিষম বিতর্কও সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু সত্যসন্ধ ব্রজেন্দ্রনাথ একবার যাহা ঠিক বলিয়া ধরিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিতে, দ্বিধা করিতেন না। রামমোহন সম্বন্ধে কতক নূতন তথ্য সম্পাদক শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অনুমোদনে প্রকাশিত হইল। অন্য প্রবন্ধগুলি অন্যত্র প্রকাশিত হয়। যাহা আঁচ করা গিয়াছিল তাহাই হইল। ভীষণ বিতর্ক দেখা দিল। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ অচল অটল, নিজের ভ্রম না বুঝা পর্যন্ত তিনি মাথা নোয়াইবার পাত্র নন। শেষ পর্যন্ত তাঁহার চরিত্রের এই বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিয়াছি। আজ তাঁহার সম্বন্ধে কত কথাই না মনে হইতেছে!

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ৬ই এপ্রিল (১৯৫৭) সাতষট্টি বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। সাধারণ বাঙালীর আয়ুষ্কাল গণনা করিলে বলিতে হয়, তিনি পরিণত বয়সেই মরদেহ ত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার মৃত্যু বঙ্গ সাহিত্য ও বঙ্গ সংস্কৃতির পক্ষে সত্য সত্যই অকাল বিয়োগ, কেননা তাঁহার দীর্ঘকালের গবেষণালব্ধ ফলসমূহ তিনি গৌড়জনের নিকট সবিস্তারে পরিবেশন করিতে সবেমাত্র স্বরু করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্তি অবধি এই কথাই বার বার মনে হইতেছিল।

দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে আমার পরিচয় প্রায় পঁচিশ বৎসর আগে। তিনি ঢাকা, কলিকাতা, রাজসাহী গবর্ণমেণ্ট কলেজ ঘুরিয়া, চট্টগ্রাম-গবর্ণমেণ্ট কলেজে স্থিত ছিলেন একক্রমে চৌদ্দ বৎসর। ইহার পর ১৯৩৬ সনে হুগলী কলেজে বদলী হইয়া আসেন। তদবধি অবসর লাভ পর্যন্ত ঐ কলেজেই অধ্যাপনা কার্যে লিপ্ত ছিলেন। অবসর গ্রহণের পরেও বহু বৎসর তিনি চুঁচুড়ায় বাস করেন; মৃত্যুর দু' তিন বৎসর পূর্বে তিনি কলিকাতা সিঁথি অঞ্চলে বাসাবাটী তুলিয়া আনেন। বিভিন্ন কলেজে, বিশেষত, চট্টগ্রাম কলেজ ও হুগলী কলেজে অধ্যাপনা এবং অবস্থিতির সঙ্গে দীনেশচন্দ্রের গবেষণা কার্যের বিশেষ যোগ আছে বলিয়া এখানে ইহা স্মরণীয়।

দীনেশচন্দ্র বলিয়াছেন, জীবনের উৎকৃষ্ট সময়—চৌদ্দ বৎসরকাল শিক্ষা ও বিদ্যাকেন্দ্র কলিকাতা হইতে বহু দূরে চট্টগ্রামে কাটাইয়াছেন, তবে এ সময়টিতে তিনি অধ্যাপনা ব্যতিরেকে গবেষণা কার্যেও নিরত ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম, আরাকান—এক কথায় সমগ্র পূর্ব-দক্ষিণবঙ্গের ইতিহাস উদ্ধারে প্রয়াসী হন। এই অঞ্চলের লোকজনের ভাষা, সাহিত্য, আচার-আচরণ, লোক-সংস্কৃতি প্রভৃতি উদ্ধারকালে মুদ্রিত, অমুদ্রিত, সরকারী বেসরকারী দলিলদস্তাবেজের নথিপত্র বই পুঁথি তন্ন তন্ন করিয়া ঘাঁটিয়াছেন। ঐ অঞ্চলের ইতিহাসের প্রচুর মালমশলা তাঁহার নিকট মজুত ছিল। কিন্তু আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য, একটার পর একটা আকস্মিক ঘটনার

আবির্ভাবহেতু তিনি তথ্যভিত্তিক এই অমূল্য ইতিহাস লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। চট্টগ্রাম হইতে তিনি হুগলী চলিয়া আসিলেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি একার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু 'পাকিস্থান' সংগঠিত হইবার পরে তাঁহার সে উৎসাহে ভাটা পড়িয়া যায়; উৎসাহী প্রকাশকের অভাবও গোড়ার দিকে যথেষ্ট প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। দীনেশচন্দ্রের মুখে এসব কথা শুনিয়াছি, তিনি কত অধ্যবসায়ী ও পরিশ্রমী তাঁহার কথায় বুঝিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। তাঁহার এই বিষয়ক এত পরিশ্রম ও অধ্যয়ন-গবেষণার ফল হইতে আমরা চিরতরে বঞ্চিত রহিয়া গেলাম। দীনেশবাবু যখন ঐসব কথা বলিতেন তখন তাঁহার মধ্যে অনুতাপ বা দুঃখের লেশমাত্রও দেখিতাম না—কাজ করিবার জন্যই যেন তাঁহার জন্ম; ফলাফলের ভাবনা তাঁহাকে পাইয়া বসিত না।

তিনি গবেষণায় কিরূপ আনন্দ পাইতেন, তাঁহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। সেযুগের প্রসিদ্ধ ডাঃ সূর্যকুমার গুডিব চক্রবর্তী সম্বন্ধে আমার কিছু লিখিবার বাসনা হয়। সূর্যকুমার কুমিল্লা স্কুলের ছাত্র ছিলেন; তাঁহার ছাত্রাবস্থায় এ বিদ্যালয়টির কর্তৃত্বভার সরকার গ্রহণ করেন নাই। কথা প্রসঙ্গে দীনেশ-বাবুকে সূর্যকুমারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তখন বোধ হয় চুঁচুড়ার বাসায় আমি উপস্থিত। তিনি একখানি বই বাহির করিয়া আমাকে দেখাইলেন। বইখানি কুমিল্লা জেলা স্কুলের শতবর্ষ-স্মারক গ্রন্থ। বইখানিতে আমার জিজ্ঞাসার হদিস মিলিল; উপরন্তু ইহা দেখিয়া আমার বিস্ময়েরও অবধি রহিল না। পুস্তকে প্রতিটি পৃষ্ঠায় দেখি দীনেশচন্দ্রের স্বহস্তে কৃত সংশোধন ও সংযোজন। আমি এরূপ করার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বতই কৌতূহলী হইলাম। দীনেশবাবু বলিলেন, 'কোন উদ্দেশ্যই নাই—এমনি করিয়াছি। পিতৃদেবের অসুখের সময় দুই মাসকাল কুমিল্লার বাড়িতে তাঁহার সেবাশুশ্রূষায় রত ছিলাম। সেই সময় এই বইখানি সদ্য (১৯৩৮) প্রকাশিত হইয়াছে। আমার তখন আর কোন কাজ ছিল না। সেবাশুশ্রূষার ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু সময় পাইতাম, স্কুলের নথিপত্র এবং আমার নিকটে যেসব তথ্যাদি ছিল তাহার সাহায্যে এইরূপ সংশোধন করিয়া ফেলি'। কি অহেতুকী গবেষণা-প্রীতি!

এইসঙ্গে তাঁহার পিতৃদেবের কথা একটু বলি। ইহাও দীনেশবাবুর মুখে শোনা। তাঁহার পিতার নাম কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম যুগের গ্রাজুয়েট। দীনেশবাবু বলিয়াছেন, পিতা চট্টগ্রাম জেলা স্কুলের হেড মাষ্টারের পদ হইতে একেবারে চট্টগ্রাম কলেজের প্রিন্সিপাল বা অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন। বাংলাদেশে এমন দৃষ্টান্ত এই প্রথম, দ্বিতীয় আর নাই, দীনেশচন্দ্রের শৈশব ও কৈশোর এই চট্টগ্রামেই কাটিয়াছিল, কর্মজীবনের এক উৎকৃষ্ট অংশ তো কাটিয়াছেই। পিতা কৈলাসচন্দ্র ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, উদার ও অমায়িক। তিনি তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার একখানি 'রোজনামচা' আছে—কয়েক খণ্ডে। দীনেশবাবু ইহা হইতে কতকাংশ আমাকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। পারিবারিক বিষয়বহুল হইলেও সমসাময়িক বাংলা ও বাঙালীর জীবনের উপর ইহা বিশেষ আলোকপাত করিবে বলিয়া তিনি অংশবিশেষ মুদ্রিত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুকালে কৈলাসচন্দ্র ছিলেন নোয়াখালি জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক; ব্রহ্মানন্দের মৃত্যুসংবাদে তিনি লিখিয়াছিলেন—ভারত-আকাশ হইতে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। 'রোজ নামচা' ইংরেজীতে লিখিত।

দীনেশচন্দ্রকে প্রথম দেখি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে। হুগলীতে আসিয়াই তিনি সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করেন। আচার্য যদুনাথ সরকার তখন পরিষদের সভাপতি। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বাঙ্গালীর দান, উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজসভায় বরেণ্য বাঙালী সভা-পণ্ডিতদের কথা—পুরাতন পুঁথিপত্র ও দলিলদস্তাবেজের নিরিখে লিখিত এই সকল বিষয়ে দীনেশচন্দ্র সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন পরিষদের মাসিক অধিবেশনগুলিতে। প্রবন্ধপাঠের পর সভাপতি যদুনাথের মন্তব্যাদিও বিশেষ উপাদেয় হইত। দীনেশচন্দ্রের অমূল্য গবেষণার ফলাফল তখনই আমরা কিছু কিছু পাইতে আরম্ভ করি। মধ্যযুগের বাংলা ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে বাঙালীর দানবিষয়ক তাঁহার বহু প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় ক্রমে প্রকাশিত হইতে থাকে। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, শনিবারের চিঠি, মাসিক বসুমতী, আনন্দবাজার পত্রিকা প্রভৃতিতেও তাঁহার বিস্তর গবেষণামূলক প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছিল। আর এই সকল বিষয়ে তিনি শিক্ষাভিমানী আধুনিক গবেষকদের দ্বারা অবজ্ঞাত সূত্রকেই আশ্রয় করিয়া লন।

দীনেশচন্দ্র ছিলেন সংস্কৃতবিদ্। তিনি আজীবন সংস্কৃত অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত বই-পুঁথির উপর তাঁহার আকর্ষণ ও প্রীতি

নিতান্তই স্বাভাবিক। এবিষয়ে একটু পরে বলিব। মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজের পরিচয় সাধারণভাবে এবং ব্রাহ্মণ শ্রেণীর পরিচয় বিশেষভাবে পাইতে হইলে ঘটকের কারিকা ও কুলপঞ্জীর আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর নাই। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা কেহ কেহ এই আকরকে নস্যাৎ করিয়া দিয়াছেন। দীনেশ-চন্দ্র অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে এগুলি ঘাঁটিয়াছেন এবং বিস্তর মূল্যবান তথ্য উদ্ধার ও পরিবেশন করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা আমাদের সামাজিক ইতিহাসের বহু জটিল প্রশ্নের উপর আলোকপাত করা সম্ভবপর হইয়াছে। আমরা মোগো বামুন, মোগো কায়েত, মোগো বদ্দি, মোগো সাহা—সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর কথা শুনিয়াছি, কিন্তু ইতিহাস জানিতাম না। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে মধ্যবঙ্গ ও নিম্নবঙ্গে মগের উপদ্রব বাড়িয়া চলে, মগেরা বহু নারীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, বা জোরপূর্বক বিবাহ করে। যে-সব পরিবারে এবম্বিধ ব্যাপার সংঘটিত হয় তাহারা সমাজে অপদস্থ ও অবজ্ঞাত হয়। এই শ্রেণীর লোকেরাই এক একটি সমাজ গঠন করে। দীনেশচন্দ্র কালিকা কুলপঞ্জী সাহায্যে ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মুসলমান আগমনে এদেশে যে রাষ্ট্রবিপর্যয় ঘটে তাহার ফলে এক অঞ্চলের লোক অন্য অঞ্চলে গিয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। নোয়াখালির সুর ও ভৌমিকগণ মিথিলা হইতে সেযুগে গঙ্গাবক্ষে নৌকা ভাসাইয়া ঐ স্থলে আসিয়াছিলেন। পুরাতন কুলপঞ্জী ঘাঁটিয়া দীনেশচন্দ্র ইহা উদ্ধার করিয়াছেন।

বঙ্গের পণ্ডিত সমাজের কুল পরিচয় ও কীর্তিসমূহ উদ্ধারকল্পে দীনেশচন্দ্রের একটি স্বাভাবিক অনুরক্তি ছিল। কারিকা ও কুলপঞ্জী ব্যতিরেকে আর একটি 'আকরে'রও তিনি সুযোগ লইয়াছিলেন। ইংরেজ আমলের প্রথম যুগে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রাক্কালে ভূমির স্বত্ব-স্বামিত্বের জোর অনুসন্ধান করা হয়। সরকারী নোটিশ বলে দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তরভোগী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-পরিবারদেরও নিজ নিজ ভূমির স্বত্ব-স্বামিত্বের প্রমাণস্বরূপ পুরনো দলিলপত্র জেলা কোর্টে দাখিল করিতে হয়। বিভিন্ন জেলা আদালতে এসব এখনও রক্ষিত আছে। দীনেশচন্দ্র এই সকলের তত্ত্ব লইতে বিভিন্ন জেলা শহরে গমন করেন এবং এ সমুদয় হইতে অনেক অজ্ঞাত তথ্য উদ্ধার করেন। বঙ্গের বিখ্যাত পণ্ডিতদের কুলপরিচয় ও কীর্তিকাহিনী এ সকল হইতে কত যে উদ্ধার হইতে পারে তাহার পথ দীনেশচন্দ্র দেখাইয়াছেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, বাঙালী গবেষকগণ অবিলম্বে যেন এই 'আকর'টির আশ্রয় গ্রহণ

করেন, নচেৎ নানা কারণে আমরা ইহার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতে পারি। উত্তরবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ ছেদ হওয়ায় সেসব অঞ্চলে কাজ করা তো আমাদের পক্ষে একরকম অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এইসব উদ্ধারে সরকারের কর্তব্য আছে। এ সকল দলিলপত্র—যাহা এখনও পাওয়া যায়, যোগ্য ব্যক্তি দ্বারা পরীক্ষান্তর মুদ্রিত ও প্রকাশিত করা আবশ্যক, যাহাতে উহা গবেষণা-কর্মীদের নিকট সুলভ হইতে পারে।

এখন, দীনেশচন্দ্রের সংস্কৃত-পুঁথি-প্রীতির কথা কিছু বলি। এ প্রসঙ্গ বলিতে গেলে অনেক ঘটনাই মনে আসে, বেশী কিছু বলা স্বল্প-পরিসরে সম্ভব নয়। তাঁহার পুঁথি অনুসন্ধান ও অন্বেষণ কার্যটি অতীব বিচিত্র। দীনেশচন্দ্রের ধারণা জন্মিয়াছিল এবং এ ধারণার মূলে সত্যও রহিয়াছে যথেষ্ট যে, বাংলার পূর্বাঞ্চল অপেক্ষা পশ্চিমাঞ্চলে রাঢ়দেশে পুঁথি সংরক্ষিত হইয়াছে ঢের বেশী। নৈসর্গিক কারণ রহিয়াছে ইহার মূলে। তিনি চট্টগ্রামে থাকাকালীন হাতে-লেখা পুঁথির অনুসন্ধান করিয়াছিলেন চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, কুমিল্লা, ঢাকা প্রভৃতি জেলাগুলিতে। এসব অঞ্চল হইতে তিনি তেমন সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কিন্তু হুগলী কলেজে আসিয়া রাঢ় অঞ্চলে এক বিরাট পুঁথি-সাহিত্য ভাণ্ডারের সন্ধান তিনি পাইলেন। ১৯৩৬ সন হইতে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত পুঁথির সন্ধানে তিনি রাঢ়দেশ যেন চষিয়া ফেলিয়াছেন। পুঁথি তো আর আধুনিক ফ্যাশানের গ্রন্থাগারের মতো এক স্থলে জড় হইয়া নাই। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কোন কোন স্থানীয় লাইব্রেরীতে পুঁথি সংরক্ষিত হইতেছে। কিন্তু রাঢ়দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের সংস্কৃত-বাংলা পুঁথি-সাহিত্যের বিরাট ভাণ্ডার যে এখনও ছড়াইয়া আছে তাহার খোঁজখবর ক'জন রাখেন ? অনন্যকর্মা, অক্লান্ত পরিশ্রমী কষ্টলেশজ্ঞানশূন্য দীনেশচন্দ্র তাহা জানিতেন। তিনি খ্যাত-অখ্যাত বহু বিদ্যাকেন্দ্রে, পল্লী-ভবনে, সাধারণ গৃহস্থবাটীতে গমন করিয়া এগুলি নিজে দেখিয়াছেন, পড়িয়াছেন। এবং যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি বহু স্থানে রকমারি অভিজ্ঞতার কথা আমাকে বলিতেন। একদিনের কথা বলি। বর্ধমানের এক পল্লীতে পুঁথির সন্ধান পাইয়াছিলেন। এই পল্লী ষ্টেশন হইতে পাঁচ-ছয় মাইল দূরে। ষ্টেশনে নামিয়া কাঠ-ফাটা দুপুর রোদে তিনি হাঁটিয়া গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হন। গৃহস্বামীর আদর আপ্যায়নের অভাব হয় নাই। রাতে যতটা পারিয়াছেন

পুঁথি দেখিয়াছেন, আর পরদিন ভোর ৫টা হইতে বেলা ১টা পর্যন্ত সমানে পুঁথি পড়িয়াছেন। গৃহস্বামীর অনুরোধ সত্ত্বেও মধ্যে এক ফোঁটা জলও তিনি গ্রহণ করেন নাই। কাজ শেষ হইলে মধ্যাহ্ন ক্রিয়াদি সমাপন করিয়া পুনরায় পূর্ব পথ হাঁটিয়া স্টেশনে পৌছিলেন। তাঁহার কষ্টের কথা কখনও বিশেষ বলিতেন না। ঐ দিনকার প্রচণ্ড রোদের কথা আমায় বলিয়াছিলেন। তাঁহার অনুসন্ধান-স্পৃহা ক্রমশ যেন বাড়িয়াই যাইতে ছিল। কিন্তু বার্ধক্যহেতু আশানুরূপ পরিশ্রম করিতে পারেন না বলিয়া কত দুঃখ করিতেন।

বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান : বঙ্গে "নব্যন্যায়চর্চা" তাঁহার পুঁথি সাহিত্য-আলোচনা-গবেষণার একটি অপূর্ব কীর্তি! কিন্তু এই পুস্তকে তিনি একটি বিষয় মাত্র দিতে পারিয়াছেন। এই রকম স্মৃতি, কাব্য, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ক প্রামাণিক গ্রন্থ রচনায়ও তিনি অগ্রণী হইয়াছিলেন। স্মৃতি বিষয়ে তিনি পরবর্তী গ্রন্থ রচনায় কথঞ্চিৎ ব্যাপৃত ছিলেন। কী অফুরন্ত ভাণ্ডারই না তিনি সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। নব্যন্যায়ের কথা লিখিয়া তিনি সরকার হইতে রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রাপ্ত হন। মিথিলার রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট মৈথিল ন্যায়দর্শন সম্পর্কে একখানি গ্রন্থ রচনার ভার দীনেশচন্দ্রের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। ইহার মাল-মশলা সংগ্রহের জন্য তিনি কাশী ও মিথিলায় প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মধ্যেও গিয়াছিলেন। গবেষণা অনুসন্ধানের জন্য বৃদ্ধ বয়সেও কোন কষ্টকেই তিনি কষ্ট বলিয়া গ্রাহ্য করিতেন না। ঐ দুই অঞ্চল পরিভ্রমণান্তে দীনেশচন্দ্র আমাকে বলিয়াছিলেন, "সর্বত্রই দেখিলাম দুইটি দল; একটি 'no-work' দল, আর একটি 'pro-work' দল। আশ্চর্যের বিষয়, এবং দুঃখেরও কথা, 'no-work' দলেরই সব জায়গায় প্রাধান্য।" এই কথা বলিয়া তিনি দু'একটি উদাহরণও দিলেন। দীনেশচন্দ্র মৈথিল-ন্যায় সম্পর্কে পুস্তক রচনা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। আমরা বাহির হইতেও বন্ধুরূপে তাগিদ দিয়াছি, কিন্তু তিনি সর্বদাই বলিতেন, 'এখনও খুঁটিনাটি তথ্যের অপেক্ষায় আছি।' কি কর্ম-তৎপরতা, অথচ কি প্রগাঢ় নিষ্ঠা!

ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর মূল উপকরণ যে সংস্কৃত-বাংলা পুঁথি, কারিকা ও কুলপঞ্জী, মুদ্রিত ও অমুদ্রিত সমসাময়িক দেশী-বিদেশী লিখিত বিবরণ, সরকারী দলিল দস্তাবেজ এবং সর্বশেষ ইংরেজী-বাংলা সংবাদ-পত্রের মধ্যে বিস্তর রহিয়াছে, গত পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর যাবৎ কয়েকজন বঙ্গ-মনীষীর অক্লান্ত গবেষণায় প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে দীনেশচন্দ্র এই বঙ্গমনীষীদের

শীর্ষস্থানে। বাংলা ও বাঙালী জীবনের ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ একজনের কর্ম নয়। একদল নিষ্ঠাবান্ অধ্যবসায়ী, শ্রমসহিষ্ণু শিক্ষিত যুবক কর্মীর একযোগে কার্যে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। বোম্বাই-মাদ্রাজের মত বাংলাদেশে একটি 'হিষ্টরিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট' এখনও গড়িয়া উঠিল না, অথচ ব্যক্তিগতভাবে এখানে যা কাজ হইয়াছে এমনটি অন্য কোথায়ও হয় নাই। এবিষয়ে যে সহযোগিতার মনোভাব প্রয়োজন তাহা দীনেশচন্দ্রের মধ্যে প্রচুর ছিল। তিনি শুধু নিজে গবেষণা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না, অন্যকেও নানাভাবে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেন। চুঁচুড়া থাকাকালীন ভূদেব লাইব্রেরী হইতে বহু অমূল্য এবং সুদুর্লভ পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা তিনি সতীর্থ গবেষক বন্ধুদের সরবরাহ করিতেন। গবেষক-বন্ধুদের'অর্ডার' তামিল করিতে পারিলে তাঁহার কতই না আনন্দ হইত। ভূদেব লাইব্রেরী ছিল আমারও একটি প্রধান আকর্ষণ। দীনেশচন্দ্রের মাধ্যমে এই লাইব্রেরীর কর্তৃস্থানীয়ের সঙ্গে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হই। দীনেশচন্দ্রের মত মনীষীর সঙ্গলাভ করিয়া ব্যক্তিগতভাবে আমি এবং সাধারণভাবে সমগ্র গবেষক-সমাজ ধন্য হইয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে বয়সের একযুগ তফাত হইলেও সতীর্থ বলিয়া আমাদের পরিচয় ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হয়। অমায়িক, নিরভিমান, উদার, অধ্যবসায়ী, দায়িত্ববোধসম্পন্ন মনীষী-প্রধানকে হারাইয়া আত্মীয়-বিয়োগব্যথা অনুভব করিয়াছিলাম।

যদুনাথ সরকার

আচার্য যদুনাথের কথা এত শীঘ্র লিখিতে হইবে কল্পনাও করি নাই। তিনি বয়সে প্রবীণ হইয়াও মনে এত নবীন ছিলেন যে, আমরা বয়ঃকনিষ্ঠরা তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া বিশেষ অনুপ্রাণনা লাভ করিতাম। তিনি শেষ-জীবনে দুইটি কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। উভয়ই ছিল বড়রকম অস্ত্রোপচার সাপেক্ষ। বার্দ্ধক্যহেতু চিকিৎসকগণ অস্ত্রোপচারের ঝুঁকি লইতে চাহেন নাই। তাঁহারা পথ্যানুগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শেষ সাক্ষাৎকারে আমি উপস্থিত থাকিতে থাকিতেই ঔষধস্বরূপ ঘোল গ্রহণের নির্দেশ আসিল। কিছুদিন হইতে যদুনাথ সম্বন্ধে মনের গোপন কোণে কেমন একটা শঙ্কা উদয় হইতেছিল। কিন্তু তাঁহার সান্নিধ্যে যাইতেই তাঁহার অটল ভাব দেখিয়া উহা কাটিয়া যাইত। তখন কে জানিত গোপন কোণের এই অস্ফুট আশঙ্কা অতি সত্য মৃত্যুরূপে এত শীঘ্র দেখা দিবে।

আচার্য যদুনাথকে দেখিয়াছি দূর ও নিকট হইতে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া। প্রথম সাক্ষাৎ বোধ হয় প্রবাসী কার্যালয়েই। তাঁহার প্রিয় শিষ্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুর সম্পাদকীয় বিভাগে যুক্ত ছিলেন। সম্পাদক রামানন্দবাবুর সঙ্গে আচার্য যদুনাথের পরিচয় দীর্ঘকালের। তাঁহার কত যুগান্তকারী রচনা ইতিপূর্বে এই দুইখানি পত্রিকায়, বিশেষ করিয়া মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পাদকীয় বিভাগে আসিবার পর তিনি পুনরায় পূর্ণোদ্যমে লিখিতে আরম্ভ করিলেন, এবারে বাংলা প্রবন্ধই দিতে লাগিলেন বেশী। ব্রজেন্দ্রনাথের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমি উক্ত পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে শিক্ষানবিশরূপে যোগ দেই। কাজেই প্রথম হইতেই 'ঐতিহাসিক' এবং 'মানুষ' যদুনাথকে নিকট হইতে দেখিবার সুযোগ ঘটিল। সেই অনাড়ম্বর দীর্ঘকায় তেজোদৃপ্ত মানুষটি—তিনি হাঁটেন না যেন দৌড়ান, সর্ব্বদাই কর্মব্যস্ত।

তখন রবিবাসর বেশ জাঁকালো রকমে সুরু হয়। পক্ষান্তে অধিবেশন; কলিকাতা হোটেলে প্রায়শঃই হইত। দুইটি অধিবেশনে যদুনাথের যোগ-

দানের কথা স্মরণ আছে। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের উত্তর-দিকে ক্যালকাটা হোটেল-ভবনের দ্বিতলের এক কোণের ঘরে সভা। একদিন শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে একটি বিশেষ আলোচনা-বৈঠক বসিল। প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) সভাপতি। আচার্য যদুনাথ সরকার, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আলোচনায় যোগ দেন, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। আচার্য যদুনাথের একটি উক্তি মনে আছে। ইংরেজী সাহিত্যে যেমন মেরী করেলি বাংলা সাহিত্যে তেমনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উভয়েই জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছেন খুব, কিন্তু কালের কষ্টিপাথরে ইহারা কতটুকু টিকিয়া থাকিবেন বলা কঠিন। যদুনাথের সাহিত্যবোধ ছিল তীক্ষ্ণ আর সাহসের সঙ্গে নিজ মতামত ব্যক্ত করিতেও কখনই পশ্চাৎপদ হইতেন না। সভায় উপস্থিত বিদগ্ধজন তাঁহার এই অভিমত কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এতদিন পরে তাহা সঠিক মনে নাই। তবে তাঁহার উক্তির সমর্থনও কেহ কেহ করিয়াছিলেন, এইটুকু মাত্র মনে আছে। আর একটি দিনের কথা। এদিনও রবিবাসরের অধিবেশন হইতেছিল ঐ পূর্বস্থানে। যদুনাথ এ দিনের বিশেষ বক্তা। তিনি "বাদশাহী বিচার পদ্ধতি" শীর্ষক একটি বক্তৃতা দিলেন। যতদূর মনে পড়ে তিনি এক ঘণ্টারও উপর বক্তৃতা দিয়াছিলেন। আমরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ ইহা শুনিলাম। আচার্য যদুনাথের বক্তৃতাটি এতই ভাল লাগিয়াছিল যে, স্মৃতি হইতে পর দিন উহা লিখিয়া ফেলি। সে সময় আমি কতকটা শ্রুতিধর ছিলাম। ছোট বড় কত বক্তৃতা শ্রবণান্তরে বাসস্থানে বসিয়া লিখিয়া ফেলিতাম। এই বক্তৃতাটি বোধ হয় ব্রজেন্দ্রনাথের পরামর্শে আচার্য যদুনাথের দৃষ্টি ও সংশোধনের জন্য পাঠাই। আমি তখনও তাঁহার নিকট প্রায় অপরিচিত। যদুনাথ কালক্ষেপ না করিয়া সংশোধনান্তর লেখাটি আমাকে ফেরত পাঠাইয়াছিলেন। কিছুকাল লেখাটি আমার নিকট পড়িয়া ছিল। পরে ইহা দেশ সাপ্তাহিকে (২৮শে বৈশাখ, ১৩৪২) উপরি উক্ত নামে মুদ্রিত হয়।

আমরা কিছুকাল রবিবাসরের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম; পরে সদলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যোগ দিলাম। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আমাদের নেতা। বাংলা সাহিত্যান্তর্গত বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণা-সৌকর্যার্থ পরিষদে যোগদানে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ তো শুধু গবেষক নন; গঠনকর্মীও বটে। সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া উহার দোষ-ত্রুটি স্খালন পূর্ব্বক উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে উদ্যোগ করিলেন।

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু (পরশুরাম) এবং আচার্য যদুনাথ সরকারকে তিনি পরিষদ সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহিত করিয়া তুলেন। সাহিত্য পরিষদের গত ত্রিশ বৎসরের ইতিহাসে এই ব্যাপারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইবে। পরিষদে আচার্য যদুনাথের আগমন নূতন নয়। তিনি পরিষদের প্রবীণ কর্মীদের প্রায় সকলের সঙ্গেই পূর্ব্বে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু পরিষদের এই সময়কার কর্মপদ্ধতিকে প্রবীণদের আপত্তি বা বিরোধিতা সত্বেও পূর্ণভাবে সমর্থন ও সহযোগিতা করিয়াছিলেন তিনি। অপেক্ষাকৃত নবীন কর্মীদের দ্বারা পরিষদের উন্নতিসাধন দ্রুত সম্ভব হইবে এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল। পরিশেষে প্রবীণেরাও নবীন কর্মীদের নিষ্ঠাপূর্ণ কর্মতৎপরতা দেখিয়া তাহাদের প্রশস্তি করেন, এবং তাহাদের সহায়তায় রত হন। সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতিত্ব কালে কিছুদিনের জন্য আচার্য যদুনাথ ৯নং বাদুড়বাগান রো'তে (বর্ত্তমান রামানন্দ চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট) বসবাস করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত প্রায়শঃই এই স্থানে যাইতাম। এই সময় সাহিত্য পরিষদ সম্পর্কে নানা আলোচনা হইত। পরিষদের উন্নতি সম্বন্ধে তাঁহার আকূতি আমাদিগকেও কাজে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিত।

আচার্য যদুনাথের পরিষদ-প্রীতির আর একটি পরিচয় নিজের অভিজ্ঞতা হইতে দিতেছি। আমি তখন মডার্ন রিভিয়ু ও প্রবাসী ছাড়িয়া আনন্দবাজার পত্রিকা পরিচালিত 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ লইয়াছি। বড় বড় সাহিত্যিকের নিকট হইতে লেখা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলাম। আচার্য যদুনাথও লেখা দিতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি যথানির্দিষ্ট দিনে আমাকে প্রবন্ধ দিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সম্পর্কে। বাঙালীর এই জাতীয় সম্পদের প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। পূর্ব্বে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর আমলে তিন-চার বৎসর পরিষৎ-পত্রিকা বাহির হইয়াছিল। ইংরেজী বাংলা কোন কোন পুস্তিকায় পরিষদের বিশেষ বিশেষ বিভাগের সংগ্রহ ও সজ্জা সম্বন্ধে আলোচনা থাকিত। কিন্তু সাধারণভাবে পত্রিকার মাধ্যমে পরিষদ সম্পর্কে আলোচনা এই বোধ হয় প্রথম। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'পরিষৎ-পরিচয়' সঙ্কলন করিয়া সাহিত্য পরিষদের পঞ্চাশ বৎসরের কার্যকলাপের একটি দফাওয়ারি বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। পূর্বোক্ত লেখাটির সঙ্গে আচার্য যদুনাথের একখানা ছবিও বাহির হয়। এখানিতে যদুনাথের রোগাপটকা চেহারা

প্রকাশ পাইয়াছিল। পত্রিকা-কর্তৃপক্ষের এই ছবিখানি কবেকার করা জানি না। আচার্য যদুনাথ আমাকে বলিয়াছিলেন ঐ পুরানো ছবি আর যেন ছাপা না হয়। তিনি ঐ ছবির কথা অনেকদিন ভুলিতে পারেন নাই, পরেও আমাকে উহা না ছাপার কথা বলিয়াছিলেন।

দেশ সাপ্তাহিকে কর্মকালে গবেষণা-কার্য প্রায় ছাড়িয়াই দিতে হয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে প্রতি সপ্তাহে লিখিতাম। এ বিষয়ে ধারাবাহিক আলোচনা যতদূর বলিতে পারি, এই সাপ্তাহিকেই সুরু হয়। অন্যান্য সাময়িক পত্রিকায় আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনা থাকিত বটে, কিন্তু তাহা ছিল নিতান্তই খাপছাড়া। দেশ সাপ্তাহিকের ইহা একটি মৌলিক কৃতি। যাহা হউক, এই সময় উক্ত বিষয় আলোচনা করিবার সময় যথেষ্ট খাটিতে হইত। এ বিষয়ক পড়াশুনায়ও তখন বিশেষভাবে লিপ্ত হইয়া পড়ি। আচার্য যদুনাথ এ বিষয়টি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। সাপ্তাহিকের কার্য মাসিকের চেয়ে গুরুতর। সময় করিয়া উঠিতে না পারায় শেষদিকে পরিষদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা আর সম্ভবপর হয় নাই।

চারি বৎসর দেশ সাপ্তাহিকে কার্য করার পর চোখে গ্লোকুমাহেতু অস্ত্রোপচার হয় এবং ডান চোখের সম্মুখের দৃষ্টি সম্পূর্ণ হারাই। দেশ সাপ্তাহিক হইতে বিদায় লইলাম। সাধারণ অর্থে তখন বেকার হইয়া পড়ি। বেকার কিন্তু ঠিক ছিলাম না। এই সময়ে দীর্ঘকালের প্রস্তুতি ও পরিশ্রমের ফলে আমার 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' রচনা ও প্রকাশ সম্ভবপর হইয়াছিল।

১৩ই আষাঢ় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মতিথি উদ্‌যাপনের দিন। সকালের দিকে আমরা শিয়ালদহ ষ্টেশনে সমবেত হইয়াছি। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখি আচার্য যদুনাথ আসিয়াছেন। তিনি আমার পাশেই বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িলেন; আমার কুশলবার্তা লইবার পর যখন শুনিলেন যে আমি আর আনন্দবাজার পত্রিকা পরিচালিত 'দেশে'র সঙ্গে যুক্ত নাই তখন তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু আমার দৃঢ়তায় ও উক্ত পুস্তক রচনার কথা জানিয়া কতকটা আশ্বস্ত হন। তখন তিনি আমার কার্যকলাপ সম্বন্ধেও সবিশেষ খোঁজ লইলেন। সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে পুনরায় যুক্ত হইলাম। এবারে আবার সভাপতি হইলেন আচার্য যদুনাথ।

পরিষদের কার্য-নির্বাহক সমিতির অধিবেশনে এবং ইহার সাধারণ সভা সমিতিতে যদুনাথের সংশ্রবে আসিলাম এবারে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে।

পরিষদের প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও বিশিষ্ট সদস্য সাংবাদিকশ্রেষ্ঠ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তখন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সময় রামানন্দবাবুকে মানপত্র দানের প্রস্তাব আসে—প্রস্তাব হইবামাত্র আচার্য যদুনাথ বিশেষ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। প্রস্তাবটি প্রথমে গোপন ভাবে তাঁহার নিকট হইতেই আসিয়াছিল কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার অত্যধিক আগ্রহ আমাদিগকে তখন চমৎকৃত করে। এই সময়ে রামানন্দবাবু বড় জামাতা ডক্টর কালিদাস নাগের বাড়ীতে বাস করিতেন। সকাল ৮টা কি ৯টায় মানপত্র দানের সময়; আমরা সকলে একে একে পূর্ব নির্দেশমত আচার্য যদুনাথের বাড়ীতে জড় হইলাম। যদুনাথ পূর্বে কলিকাতায় আসিয়া ভাড়াটিয়া বাড়ীতে উঠিতেন; শেষে তিনি এই নিজস্ব বাড়ীটি নির্মাণ করান। নূতন বাড়ীতে আমার, শুধু আমার কেন অনেকেরই, পদক্ষেপ এই প্রথম। পরে ষোল-সতের বৎসর যাবৎ এই বাড়ী আমাদের তীর্থস্থান হইয়া দাঁড়ায়। যাহা হউক এখান হইতে আমরা সকলে আচার্য যদুনাথকে পুরোভাগে রাখিয়া ডক্টর নাগের বাড়ীর দিকে রওনা হই। বাড়ী দূরে নয়, কটক দিয়া সকলেই দ্বিতলে উঠিলাম। রামানন্দবাবুর শয্যা ঘিরিয়া আমরা সকলেই দাঁড়াইলাম। আচার্য যদুনাথ স্বয়ং তাঁহার অননুকরণীয় ভঙ্গীতে মানপত্র পাঠ করিলেন। কি গম্ভীর পরিবেশ! দেখিলাম রামানন্দবাবুর সর্বশরীর রক্তাভ হইয়াছে। ডাক্তার নীলরতন সরকার প্রমুখ বড় বড় চিকিৎসকেরাও তাঁহার রোগের উপশম করাইতে পারেন নাই। তখন একনাগাড়ে কিছু বলার ক্ষমতা রামানন্দবাবুর ছিল না। তিনি সকলকে একে একে কাছে ডাকিলেন। প্রত্যেকের কুশলবার্তা লইলেন। আমি পুনরায় প্রবাসী ও মডার্ণরিভিয়ুতে যোগ দিয়াছিলাম। তিনি আমার সম্বন্ধেও দু'চারটি কথা বলিলেন। অনুষ্ঠান শেষে জলযোগের ব্যবস্থা। আমরা সকলে নিজ নিজ আবাসে চলিয়া আসিলাম। আচার্য যদুনাথ পূর্ণোদ্যমে এই পত্রিকা দুখানিতে লেখা দিতে সুরু করিলেন।

আচার্য যদুনাথের স্বজনবিয়োগ সুরু হয় দ্বিতীয় মহাসমরের শেষ দিক হইতে। জামাতা কর্ণেল এস. কে ঘোষ সিঙ্গাপুরে নিখোঁজ হন। অদ্যাবধি তাঁহার খোঁজ পাওয়া গেল না। ঔরঙ্গজেবের কীর্তি ও অপকীর্তির কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। সম্প্রদায়-সচেতন মুসলমান শিক্ষিত সাধারণ অনেকেই এ কারণ আচার্য যদুনাথের উপর মোটেই খুসী ছিলেন না। কিন্তু কে জানিত

তাহাদের এই রোষ ওরূপ নির্মমভাবে আচার্য যদুনাথের উপর নিপতিত হইবে ? ১৯৪৬ সনের আগষ্ট মাসে মুসলীম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হইতে উদ্ভূত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার জের প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্ট পর্যন্ত ছিল। যদুনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া একদিন মুসলমান আততায়ীদের ছোরার আঘাতে রাস্তায় অজ্ঞান হইয়া পড়েন। পরে হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু সত্যসন্ধানী যদুনাথ অচল অটল। পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া যদুনাথ-ভবনে আমি ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা গেলাম। প্রথম আবেগ কাটাইয়া উঠিয়া তিনি পুত্রের মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত কথা বলিয়া গেলেন। পুত্র ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পূর্বদিককার ছাপাখানা হইতে ফিরিতেছিলেন ; ঐ দিকে ট্রাম বাস বন্ধ থাকায় এসপ্লানেডে আসিয়া বাস কি ট্রাম ধরিবেন এই ইচ্ছা ছিল। তিনি কালা ছিলেন। মুসলমানদের হৈ-হল্লা শুনিতে পান নাই। ধর্মতলার গীর্জার নিকট পৌছিলে মুসলমান আততায়ীর ছোরার আঘাতে রাস্তায় অজ্ঞান হইয়া পড়েন। এক শ্বেতকায় পাদ্রী ইহা দেখিয়াই আগাইয়া আসেন এবং হাসপাতালে লইয়া যান। সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এই পাদ্রী তাঁহাকে পুত্রের খবর দিয়াছিলেন। এই কথা বলিতে বলিতে পাদ্রীর প্রতি যদুনাথের চিত্ত কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ তাঁহার সন্নিধানে থাকিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

গবেষণাকার্য নূতন ভাবে আরম্ভ করিয়াছিলাম। গত দশকে কয়েকজন মান্যগণ্য বাঙালী ও বাংলা-প্রবাসীর তথ্যভিত্তিক জীবনী প্রবন্ধাকারে বিভিন্ন পত্রিকায় পূর্বেই লিখিয়াছি। সেগুলি 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইল। আচার্য যদুনাথের আশীর্বাদপূত সমালোচনা পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে বিশেষ উৎসাহিত হইলাম। সে যুগের শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিষয় গবেষণা করিতে হইলে ইংরেজী-বাংলা পত্রপত্রিকার আশ্রয় লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজারভারের প্রায় সম্পূর্ণ ফাইল (১৮৩৪-১৮৬২) আচার্য যদুনাথের রাজসাহীর বাড়ীতে ছিল। তিনি ইহা আনাইয়া আমাকে সংবাদ দিলেন। অবজারভারের প্রথম দুই বৎসরের ফাইল রাজা রাধাকান্ত দেবের পারিবারিক গ্রন্থাগার হইতে পাইয়াছিলাম। আচার্য যদুনাথের নিকট হইতে কখনও একখানি কখনও দুইখানি কখনও নিজে কখন লোক মারফত আনাইয়া ভাল করিয়া দেখিবার

সুযোগ পাই। সেকালের শিক্ষা-ব্যাপারে মিশনরীদের কৃতিত্ব বিস্তর। এই মাসিকপত্রখানি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টান মিশনরীগণের একক মুখপত্র বলিয়া তাহাদের সমুদয় কৃতকর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ইহাতে থাকিত। বাংলা প্রবাদ, বাঙালীর জাতিগত বৈচিত্র্য প্রভৃতি সম্বন্ধেও আলোচনা এই পত্রিকা-খানিতে প্রথম দেখি। মুখ্যতঃ ধর্মপত্রিকা হইয়াও বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি, শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্যাদিও ইহাতে থাকিত। নীল-আন্দোলনকালে মিশনরীদের বাংলার নির্যাতীত প্রজাকুলের সপক্ষতা ও সাহায্যাদি বিষয়েও বিস্তর তথ্য আমি 'অবজারভার' হইতে পাই। এই পত্রিকাখানি আচার্য যদুনাথের নিকট হইতে পাইয়া আমার গবেষণা-কার্যে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। তিনি অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য অথচ বিশেষ প্রয়োজনীয় পুস্তক আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। শেষ দিকে তিনি গ্রীষ্মকাল হইতে অন্যূন চারি মাস পুণার নিকটবর্তী একটি স্থানে প্রতি বৎসর গিয়া বাস করিতেন। এ সময়ও তাঁহার গ্রন্থাগার হইতে পুস্তকাদি লইয়া পাঠ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। সত্যিকার গবেষক-ছাত্র যাহারা, তাহাদের প্রতি তাঁহার অসীম প্রীতি ছিল। নিজে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি; অন্য প্রমুখাৎও নানা গল্প শুনিতাম। দুই-একটি দৃষ্টান্ত পরে দিব।

স্বাধীনতার পরে। দেশ বিভাগ হইবার ফলে পূর্ববঙ্গবাসীরা পশ্চিমবঙ্গে আসিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইতিকর্তব্য নির্ধারণের নিমিত্ত কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে যে সভা হয় তাহাতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গবাসীদের স্বাগত করিলে ভারত রাষ্ট্রের জনবল বৃদ্ধি পাইবে, ইহাদের উদ্যম ও কর্মশক্তি দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রকার উন্নতিও সম্ভব হইবে। এই সভায় আমরা উপস্থিত ছিলাম না বটে, কিন্তু সংবাদপত্রে প্রকাশিত তদীয় বক্তৃতা তিনি সংশোধন করিয়া পাঠাইলে আমরা মডার্ণ রিভিয়ুতে তাহা প্রকাশিত করি। শিক্ষা, সমাজ, সৈন্যবল, অর্থনৈতিক সমস্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত সংবাদপত্রে এবং মডার্ণ রিভিয়ুতে বাহির হইতে থাকে। স্বাধীনতার পরিবেশে আমাদের আচার-আচরণ এবং দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালীর আশু সংস্কারের কথাও তিনি কোন কোন প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক যুগের প্রসিদ্ধ যুদ্ধ-গুলির প্রণালী, রীতি-প্রকৃতি ও ফলাফল সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাবে পত্রিকান্তরে তিনি প্রবন্ধ লেখেন। ইহার একটি নিগূঢ় উদ্দেশ্য হয়ত তাঁহার মনে ছিল,—

স্বদেশীয়দের যুদ্ধবিদ্যায় উদ্বুদ্ধ করা। তিনি সরকার প্রবর্তিত ন্যাশানাল ক্যাডেট কোর-এর বিশেষ সমর্থক ও অনুরাগী ছিলেন। ইহার কার্যকারিতা সম্বন্ধে আমাদের সজাগ করিবার জন্য তিনি লেখনীও ধারণ করেন। তিনি ঝান্সীর রাণী সম্বন্ধে এক প্রস্থ প্রবন্ধ লেখেন ইংরেজীতে। এ বিষয়ে তাঁহার নিকট উল্লেখ করিলে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন 'শৈশবেই ঝান্সীর রাণী সম্বন্ধে জানবার একটা স্বাভাবিক আগ্রহ আমার মনে উদয় হয়। আমি ঝান্সীর রাণী সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাষায় যত বই বেরিয়েছে সব সংগ্রহ করে পড়ে নিয়েছি। ঝান্সীর রাণীর উপরে লিখিত বিস্তর বই আমার গ্রন্থাগারে রয়েছে।' একদিন ঝান্সীর রাণী প্রবন্ধগুলির বাংলা অনুবাদ প্রকাশের কথা বলিয়াছিলাম। তিনি ইহাতে কতকটা রাজীও হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা আর কার্যকর হয় নাই। এই প্রবন্ধগুলি ইংরেজীতে যেমন আছে, পুস্তকাকারে গ্রথিত করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করি। তিনি বলিলেন, "এর প্রথম ও মধ্যে মধ্যে কিছু সংস্কার প্রয়োজন, আবার শেষে একটি চ্যাপ্টার নূতন করে লিখতে হবে এজন্যও কিছু কাগজপত্র দেখা দরকার।" কিন্তু কতকগুলি দুরারোগ্য ব্যাধি তাঁহাকে পাইয়া বসিল। তিনি তাঁহার বাসনা আর পূরণ করিতে পারেন নাই।

নীল আন্দোলন সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্বে বিভিন্ন পুস্তকে ও প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শিশির-কুমার ঘোষ নীলচাষীদের পক্ষ লইয়া 'হিন্দু পেট্রিয়টে ছদ্মনামে কতকগুলি পত্র লিখিয়াছিলেন। বিভিন্ন সূত্র হইতে আলোচনা দ্বারা যখন স্থিরনিশ্চয় হই যে, ছদ্মনামে প্রেরিত এই সকল পত্র শিশিরকুমারের তখন 'হিন্দু পেট্রিয়টের' ফাইল হইতে ঐগুলি উদ্ধার করি। পত্রসংখ্যা ১২ খানি। এই পত্রগুলি একখানি ছোট পুস্তকাকারে প্রকাশের ইচ্ছা ব্যক্ত করিলে আচার্য যদুনাথ ইহার একটি ভূমিকা দিতে সম্মত হইলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতৃদেবের নিকটে নীলকরদের দৌরাত্ম্য এবং কোন কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের নীলকরদের সাজা দিবার কৌতুককর কাহিনী শুনিয়াছেন। ইহার কিছু কিছু তিনি উহাতে সন্নিবেশিত করিয়া দিবেন। যথাসময়ে তাঁহার ভূমিকা পাইলাম এবং পুস্তকখানিতে ছাপাইলাম। একখণ্ড পুস্তক তাঁহাকে দিলাম। তিনি পুস্তকখানি পাইবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—উহা ছাপাইবার ব্যয় কে বহন করিয়াছেন? বেশির ভাগই আমাকে দিতে হইয়াছে শুনিয়া তিনি

বিশেষ অনুযোগ করিলেন। আর নিজের কষ্টার্জিত বা ন্যায্য পাওনা টাকার বিনিময়ে এরূপ 'ভেঞ্চার' যেন না করি। তিনি আমার সাংসারিক অবস্থা সম্বন্ধে নিয়ত খোঁজখবর লইতেন, তাই এই অনুযোগ। দেখিয়াছি, যদি কেহ নীল আন্দোলন সম্পর্কে গবেষণার জন্য উপদেশ লইতে তাঁহার নিকট যাইতেন তিনি সরাসরি আমার নিকট পাঠাইয়া দিতেন।

স্বাধীনতার পরের আর একটি ঘটনা। আচার্য যদুনাথের ভাগিনেয়—সতীশচন্দ্র সিংহ, ডঃ যোগীশচন্দ্র সিংহ ও ডঃ হরীশচন্দ্র সিংহ। তিন জনই কৃতী পুরুষ। সতীশচন্দ্র সিংহের একখানি ইংরেজী বইয়ের পরিশিষ্টে আচার্য যদুনাথের রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধীয় রচনাগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছিল। আমার জাতীয়তামূলক পুস্তকগুলি আচার্য যদুনাথের নিকট তখন ছিল না, কিন্তু একটি ব্যাপারে বুঝিলাম তিনি এ সব বইয়ের খোঁজখবর রাখিতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিনের স্বাধীনতা সংখ্যা প্রকাশিত হইবে, অধ্যক্ষ ডক্টর যোগীশচন্দ্র সিংহ স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাস লিখিবেন একটি প্রবন্ধে—আচার্য যদুনাথ আমাকে লিখিলেন, আমি যেন আমার জাতীয়তা-মূলক পুস্তকগুলি তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দি। কারণ যোগীশচন্দ্রের ইহা জরুরী প্রয়োজন। সংবাদ পাইবামাত্র আমি পুস্তকগুলি পাঠাইয়া দিলাম। যথাসময়ে ইহা ফেরতও আসিল। ম্যাগাজিন সম্পাদক স্বহস্তে আমাকে একখণ্ড দিয়া গেলেন। দেখিলাম অধ্যক্ষ যোগীশচন্দ্র যথোচিত উল্লেখপূর্বক আমার পুস্তকগুলির সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।

আচার্য যদুনাথের জীবনকথার আভাস তাঁহার কোন কোন বক্তৃতা ও রচনা হইতে আমরা পাইয়াছি। 'আমার জীবনের তত্ত্ব' শীর্ষক রেডিও বক্তৃতাটি আমি বেতার দপ্তর হইতে প্রবাসীতে প্রকাশার্থ তাঁহার নির্দেশমত নকল করিয়া আনি। যথাসময়ে প্রকাশিতও হইল। এইরূপ ইতিহাস-গবেষণার প্রবৃত্তি যে শৈশবে পিতৃদেবের নিকট হইতেই সঞ্জাত হয় ইহা পাঠে তাহা আমরা প্রথম অবগত হইলাম। তিনি এক ক্রমে চারি বৎসর প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন। তিনি এই সময়ে হিন্দু হোষ্টেলে থাকিতেন। এই চারি বৎসর তিনি অনন্যমনা হইয়া পুস্তক পাঠে মন দিয়াছিলেন। অধ্যাপক পার্সিভাল তাঁহার আদর্শশিক্ষক। এন. এন. ঘোষ সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান নেশন-এর' ইংরেজী ছিল তাঁহার রচনার আদর্শ। প্রেসিডেন্সী কলেজের সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা মিটাইতে অনেকটা সমর্থ হইয়াছিল। ইংরেজী সাহিত্য,

ইতিহাস, যুদ্ধ বিবরণ, নূতন নূতন আবিষ্কার ও এডভেঞ্চার তাঁহার প্রধান পঠনীয় বিষয় ছিল। নিয়ত অধ্যয়ন ও অনুধ্যানের ফলে সাহিত্যের সূক্ষ্ম রসানুভূতি তাঁহাতে অতিমাত্রায় লক্ষিত হইত। প্রাচীন হইলেই যে তাহা সত্য এবং গ্রহণযোগ্য এমন বিশ্বাস তাঁহার ছিল না। গত শতাব্দীর শেষে 'ইণ্ডিয়ান নেশন'-এ প্রকাশিত তাঁহার একটি প্রবন্ধের অনুকূল সমালোচনা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র 'ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার'-এ কয়েক বৎসর পূর্বে দেখিয়াছি। তাঁহার জীবনের আরও কোন কোন ঘটনা বিভিন্ন সময়ে তাঁহার মুখ হইতে শুনিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। তাহাই এখানে একটু বলি।

কেশবচন্দ্র সেন সম্বন্ধে কিছু চর্চা করিতেছি শুনিয়া আচার্য যদুনাথ বলিলেন, এলাহাবাদের জ্ঞানবাবু (জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) আমাকে গৌর-গোবিন্দ উপাধ্যায়ের বৃহৎ 'কেশব-জীবনী' দিয়েছেন। কেশব সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্যই ত এইখানিতে সন্নিবেশিত রয়েছে। যখন বলিলাম আরও নূতন কিছু তথ্য আমি পাইয়াছি তখন তিনি মোটেই বিস্মিত হইলেন না, বরং কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার নিজ অভিজ্ঞতা এবং নিজস্ব উচ্চ ধারণার কথা ব্যক্ত করিলেন। তিনি বলিলেন, 'আমি দুবছর কলকাতায় হেয়ার স্কুলে পড়ি। দাদা ও আমাকে পড়াশুনা করার জন্য একত্রে এখানে পাঠান হয়। সাত বছর বয়সে এসে ভর্তি হই, নয় বছর বয়সে দাদা রাজসাহীতে গেলে আমিও চলে যাই। এ দু'বছরে কেশব বাবুকে একেবারে সামনে থেকে দেখেছি। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে বেদীর একেবারে নিকটে ফরাস পাতা ছিল, সেটি শিশুদের বসবার জায়গা। তার পিছনে ও আশেপাশে বয়স্কদের জন্য স্থান করে দেওয়া হ'ত। আমি তখন শিশুর দলে ছিলাম। আমিও ফরাসের উপর একেবারে সামনে বসে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনেছি। তাঁর চেহারা আমার স্পষ্ট মনে আছে।' তিনি আরও বলেন যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-দিবসের কথাও তাঁহার স্মরণ আছে। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের ফুটপাথের উপর দিয়া অনেক-খানি জায়গায় বিভিন্নবর্ণের কাগজের ছোট ছোট পতাকা টাঙাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার উচ্চ ধারণার কথাও এই সঙ্গে দু'-একটা বলি। তিনি বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের ভার বিভিন্ন লোকের উপর অর্পণ করেন। তাঁহার লোক বাছাইয়ের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তিনি যোগ্য লোকের উপরই ভার দিয়াছিলেন। বিভিন্ন ধর্মাশ্রয়ীদের বুঝিবার পক্ষে এই

আলোচনা যে কত ফলপ্রসূ হইয়াছিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বাংলা সাহিত্যও ইহার দ্বারা সমৃদ্ধ ও প্রসারিত হইয়াছে। আচার্য যদুনাথ অতি দৃঢ়তার সহিত এই কথাগুলি আমায় বলিয়াছিলেন।

পূর্বে তাঁহার পিতৃদেব রাজকুমার সরকার সম্বন্ধে আমার জানা একটা তথ্যের কথা তাঁহাকে বলিয়াছিলাম। সে যুগের রাষ্ট্রীয় শাসনের আঁটুনি যখন বাড়িতেছিল সেই সময় কলিকাতায়, জেলা ও মহকুমা শহরে এমনকি বড় বড় গঞ্জে রাজনৈতিক সভা সমিতি স্থাপিত হয়। রাজসাহীতে এইরূপ রাজনৈতিক সমিতি—'রাজসাহী পিপলস এসোসিয়েশন'—প্রতিষ্ঠা করেন রাজকুমার সরকার। রাজকুমার তখন রাজসাহীতে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র পুরানো ফাইল হইতে এই তথ্য সংগ্রহ করি। আচার্য যদুনাথ শুনিলেন, কিন্তু সেদিন কিছু বলিলেন না। পিতৃদেব সম্বন্ধে 'আমার জীবনেরতন্ত্রে' যদুনাথ মুক্তকণ্ঠে অথচ সংক্ষিপ্তাকারে বলিয়াছেন। বহু পরে একটা অন্য প্রসঙ্গ উঠিলে তিনি পিতৃদেব সম্বন্ধে বলেন, 'পিতৃদেব খুব উদার-প্রকৃতির লোক ছিলেন। তখনকার প্রগতিশীল ব্যাপারগুলির সঙ্গে তাঁহার যোগ ছিল। তিনি রাজসাহী ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টি ছিলেন। তিনি ক্রমে শিশির ঘোষের সংস্রবে আসেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অনুরাগী হইয়া পড়েন।' আচার্য যদুনাথ শ্রীচৈতন্যদেবের একখানি ইংরেজী জীবনকথা লিখিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা মনে হয় তিনি পিতৃকৃত্যই করিয়াছেন।

যদুনাথের সঙ্গে আমার সংস্রবের কথা লিখিতে বসিয়া অন্যান্য প্রস্তাবের মত আমার নিজের কথা তথা অভিজ্ঞতার বিষয় আসিয়া পড়িতেছে। ইহা পাঠক-পাঠিকার ভাল লাগিবে কিনা জানি না। কিন্তু উপায়ান্তর ত দেখি না। সত্যকার যদুনাথকে জানিতে বুঝিতে হইলে এ সব বিষয়ের উল্লেখ যে প্রয়োজন হইয়া পড়ে। বেথুন কলেজের শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ আমি নিজে তাঁহাকেও একখণ্ড দিয়া আসি। কয়েকদিন পরে গিয়া দেখি তিনি উহা মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেছেন। গ্রন্থখানির অর্ধেকের উপর আমার লেখা। তিনি যে ইতিহাস অংশটি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছেন দুই-একটি কথায় তাহা বুঝিলাম। তিনি ইহার সমালোচনা কোন পত্রপত্রিকায় করেন নাই। তবে ইংরেজী ও বাংলায় এখানি সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত আমাকে লিখিয়া দিয়াছিলেন। পর পর আরও কতকগুলি কার্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়ি। ঠিকা কাজ কিন্তু বড়ই পরিশ্রম, অধ্যয়ন, অনুধ্যান সাপেক্ষ। একে একে

হিষ্ট্রি অব 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন', 'প্রমথনাথ বসু' (জীবনী) বাহির হইল। এই সময় আর একটি বিষয়ের জন্যও খুব খাটিয়াছিলাম, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রথম পঁচিশ বৎসরের ইতিহাস। এসোসিয়েশন শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে একখানা ইতিহাসগ্রন্থ প্রকাশের বাসনা করিয়াছিলেন এবং এক-একটি অংশের রচনার ভার এক এক জনের উপর দিয়াছিলেন। আমার উপর প্রথম পঁচিশ বৎসরের ইতিহাস রচনার ভার পড়ে। এই গ্রন্থ অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই। এই সকল আলোচনা-গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে আচার্য যদুনাথের নিকট যাইতাম এবং তিনি কোন কোন বিষয়ে উপদেশ দিতেন। প্রমথনাথ বসু সম্পর্কে তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয়ের জন্য পুস্তকে সন্নিবেশিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি বলেন, প্রমথনাথের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল না, তবে ভাইসচ্যান্সেলার থাকাকালে তিনি তাঁহাকে একবার বক্তৃতা দিতে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই সময় যা পরিচয়। আচার্য যদুনাথ এই দুইখানি পুস্তকের সমালোচনা করিয়াছিলেন মডার্ণ রিভিয়ুতে। প্রমথনাথ বসু বড় অক্ষরে ছাপা দেখিয়া তিনি বড়ই খুসী হন। তখন তিনি ছোট অক্ষর পড়া প্রায় ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন।

আচার্য যদুনাথের সাহিত্য-প্রীতি যেরূপ লক্ষ্য করিয়াছি সে সম্বন্ধে কিছু বলি; অধ্যয়ন, অনুধ্যান, অনুশীলন যে তাঁহার জীবন-ধর্ম-কর্ম। তিনি একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ 'টাইমস লিটারেরি সাপ্লিমেণ্ট' পড়িতেছেন এবং ইংরেজী সাহিত্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিষয়ক আলোচনাদি পাঠ করিতেছেন। ইংরেজী সাহিত্যে কবিতার চেহারা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। গদ্য কি পদ্য বুঝা কঠিন। কোন কোন সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাঠ পরিবর্ত্তন হওয়ার জন্য উহার কবিত্ব কতখানি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধও তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে লেখেন।

একদিন শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেনকে লইয়া আচার্য যদুনাথ ভবনে গিয়াছি, ডক্টর কালিকারঞ্জন কানুনগো উপস্থিত রহিয়াছেন। দুই-চার মিনিটের মধ্যেই একটি সাহিত্যিক পরিবেশের সৃষ্টি হইল। ডক্টর কানুনগো বলিলেন, তিনি চাটগাঁর লোক, চট্টল কবি নবীনচন্দ্র সেনের পলাশীর যুদ্ধ বইখানা প্রাইমারি ক্লাশে পড়িবার সময় পণ্ডিত মহাশয়ের আদেশে মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই সময় তিনি পলাশীর যুদ্ধ হইতে কতক অংশ আবৃত্তি করিলেন। কবি নবীনচন্দ্র দাসের বাড়ীও ছিল চট্টগ্রামে। প্রসঙ্গতঃ তাঁহার কথাও উঠিল।

আচার্য যদুনাথ আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, এমন প্রতিভাবান কবি সম্বন্ধে আজিকার দিনে বড় কেহ একটা জানেন না। "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায়" নবীনচন্দ্র দাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী বাহির হইয়াছে বলিলাম। নবীনচন্দ্র সংস্কৃত কাব্য হইতে বাংলা ছন্দে অনুবাদ করিয়াছিলেন। আবার ডক্টর কানুনগো নবীনসেনকৃত রঘুবংশের অনুবাদ হইতে মুখস্থ বলিতে লাগিলেন। রঘুবংশ হইতে ইহার মূল সংস্কৃত অংশগুলি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যদুনাথ আবৃত্তি করিলেন। উভয়ের মুখস্থ শক্তি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। ক্রমে ক্রমে বাংলার উপন্যাস-সাহিত্যের কথা উঠিল। তিনি এ বিষয়ে পূর্ব্বেও আমাকে দুই-এক বার বলিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে যে একটি সামগ্রিক সামঞ্জস্য বর্তমান, আধুনিক উপন্যাসে তাহা প্রায় দেখাই যায় না; যদুনাথ বলিলেন, হয়ত কোন একটি চিত্র বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে, কোন একটি অংশ অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু সমগ্রভাবে বিচার করিলে ইহা আদৌ নির্দিষ্ট মানদণ্ডে পৌঁছিতে পারে না। তিনি আরও বলেন, একটি ব্যাপারে বর্তমান বাংলা-উপন্যাস-সাহিত্যের দৈন্য বিশেষভাবে ধরা পড়িয়াছে। কোন কোন প্রকাশ্য সভায় বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে দৃঢ় মত প্রকাশ করায় তিনি অনেক আধুনিক সাহিত্যিকের বিরাগভাজনও হইয়াছিলেন। সাধারণ সম্মেলনাদিতে তাঁহার উক্তির প্রতিবাদও হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত তিনি কখনও পরিত্যাগ করেন নাই।

তবে সাহিত্যিক গুণপনা যাঁহাদের মধ্যে তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহাদের প্রশংসা করিতে তিনি কখনও ত্রুটি করিতেন না। তা তাঁরা নামজাদা হউক বা নাই হউক। শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার বর্ষীয়সী মহিলা, বাংলা সাহিত্যের সেবায় আজীবন রত আছেন। আমরা ছেলেবেলায় 'নিবেদিতা' পুস্তকখানি পাঠ করিয়া তাঁহার নামের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই। তাঁহার বহু গল্প, কবিতা ও স্মৃতিচিত্র বিষয়ক পুস্তক প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, এখনও তাঁহার লেখনী স্বতন্ত্র রহিয়াছে। তাঁহার রচনার সহজভঙ্গী, উচ্ছ্বাসবিহীন যথাযথ বর্ণনা এবং প্রসাদগুণে পাঠকমাত্রকেই মুগ্ধ করে। আমি একবার তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাই এবং প্রসঙ্গতঃ আচার্য যদুনাথ সরকারের কথা উঠে। তিনি বলিলেন, "আচার্য যদুনাথের পরিবারের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘকালের পরিচয়। তাঁহার স্ত্রী সরযূর সঙ্গে আমি সই পাতিয়েছিলাম। যদুনাথ আমার চেয়ে বয়সে বড়। ইউনিভার্সিটি

ইনষ্টিটিউটের একটি সভায় আমাকে বক্তৃতা দেবার জন্য যেতে হয়। যদুবাবু আমার হাত ধরে ডায়াসের উপরে নিয়ে গেলেন। আমার তো কত সঙ্কোচ, বয়সে বড় তিনি, আর আমাকে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সৌজন্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল।" সরলাবালার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কথা, এবং আচার্যদের সঙ্গে তাঁহার সশ্রদ্ধ উল্লেখের কথা সংক্ষেপে বলিলাম। যদুনাথ বলিলেন, "এক সময়ে আমার দাদার সঙ্গে সরলাবালার বিবাহের প্রস্তাব হয় ; এ সম্বন্ধ হয় নি। বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত না হলেও আমাদের উভয় পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বহু দিনের, ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল খুবই।" সরলাবালার সাহিত্যিক কৃতির কথা স্বতঃই উঠিল। বুঝিলাম সরলাবালার রচনায় তিনি বেশ পরিচিত। তিনি বলিলেন, "এর লেখা আমার খুব ভাল লাগে। বেশ সহজে মনের ভাব তিনি ব্যক্ত করে থাকেন।"

শ্রীযুক্তা সরকার প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা মনে পড়িল। তিনি পরমহংস শিষ্যবর্গ এবং বেলুড়মঠ সম্পর্কে দেশ সাপ্তাহিকে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন। পরে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। আচার্য যদুনাথ এই বইখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। পুস্তক প্রকাশের পূর্ব্বে আমি জানিতাম না। বইখানি বাহির হইয়াছে কিনা যদুনাথ আমার নিকট খোঁজ করিলেন। প্রসঙ্গতঃ রামকৃষ্ণ মিশনের কথা, বেলুড়মঠের কথা উঠিল। পূর্ব্বে এবং পরেও বেলুড়মঠ সম্পর্কে তিনি আমাকে দু'চার কথা বলিয়াছিলেন। ইহা হইতে মনে হইত যদুনাথ বেলুড়মঠের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। মৃত্যুর মাত্র অল্পকাল পূর্ব্বে কথাপ্রসঙ্গে অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের কথা উঠিলে তিনি বলেন যে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা সেবার কাজ বেশ ভাল করিয়াই করেন। শ্রীশ্রীমার (সারদামণি দেবী) জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশের তখন কথা হয়। প্রারম্ভিক আলোচনার জন্য বেলুড়মঠের পক্ষে কোন কোন স্বামীজী তাঁহার নিকটে যান। তিনি তাঁহাদিগকে ইতিকর্ত্তব্য নির্ণয়ের জন্য আমার নিকট প্রেরণ করেন। তাঁহারাও আসিয়াছিলেন এবং কথাবার্তাও কিছু হইয়াছিল। পরে অবশ্য তাঁহারা আর আসেন নাই।

যদুনাথ বার্দ্ধক্যে ছোট অক্ষরের বই বা পত্রপত্রিকা পড়া প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। যতদিন দৃষ্টিশক্তি প্রবল ছিল ততদিন পঠিতব্য কোন কিছু তাঁহার চোখ এড়াইত বলিয়া মনে হইত না। তিনি সমজদার রসবেত্তা। একখানি মাসিকপত্র সম্বন্ধে আমাকে একদিন বলেন···পত্রিকাখানা আমাকে

পাঠিয়েছেন আমি তা ফেরত দিয়েছি। "মাসিক পত্রিকা না পঞ্জিকা একেবারে অপাঠ্য।" সাহিত্য সম্পর্কে আচার্য যদুনাথ ছিলেন একষ্ট্রিমিষ্ট। কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি তিনি সহিতে পারিতেন না। তাঁহার নিকট গেলেই আগে আগে প্রবাসী, মডার্ণ রিভিয়ু সম্পর্কে অনেক কথা হইত। শেষ দিকে ছোট অক্ষরের জন্য তিনি আর বিশেষ পড়িতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন, "সর দেশাই (বিখ্যাত মারাঠা ঐতিহাসিক জি. এস. সর দেশাই) দুঃখ করে লিখছেন যে, তিনি আর মডার্ণ রিভিয়ু পড়তে পারেন না, এর হরফ বড় ছোট ছোট হচ্ছে।" ক্রমে দুইখানি কাগজেরই ছোট অক্ষর কতকটা বদলানো হইয়াছে। পরে দেখিলাম অচার্য যদুনাথ ইহাতে বেশ খুসী হইয়াছেন। যদুনাথ সিষ্টার নিবেদিতার বিশেষ গুণমুগ্ধ ছিলেন। নিবেদিতার জনৈক জীবনীকারের মুখে শুনি, তিনি ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিবেন। এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, বিজ্ঞাপন দেখিলাম। আচার্য যদুনাথ 'কমেমরেশান ভলুমে' তাঁহার বাংলা লেখাগুলি সঙ্কলনের ভার আমার উপর অর্পিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত নিপুণতা ও পরিশ্রমের সঙ্গে ১৯৫০ সন পর্যন্ত সাময়িক পত্রে প্রকাশিত সমগ্র প্রবন্ধের একটি তালিকা করিয়া যান। ইহার সামান্য কিছু কিছু সংশোধন করিয়া, বাকী ছয় সাত বৎসরের বাংলা রচনাগুলি ইহাতে সন্নিবেশিত করি। বড়ই দুঃখের বিষয় এই 'কমেমরেশান ভলুম' পুস্তকাকারে আচার্য যদুনাথ দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। যদুনাথের লিখিত ভূমিকাগুলির তালিকা ইহাতে দিতে হইবে। নিবেদিতা গ্রন্থখানির ভূমিকা তিনি লিখিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "না, এ বইয়ের ভূমিকা আমি লিখি নি।" এ যেন সিনেমার পর্দা তোলা আর নূতন নূতন ব্যাপার দেখা। জীবনী রচনার কি এই ধরন! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী তখন ধারাক্রমে পত্রিকান্তরে বাহির হইতেছিল। এ লেখা তিনি দেখিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন "হ্যাঁ, কিছু কিছু পড়েছি. এ এত ফেনিয়ে লেখা যে, খেই হারিয়ে যায়, আসল মানুষটিকে ত খুঁজে পাই না।"

এখন আমার একটু নিজের কথায় আসা যাক। "কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র" শীর্ষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস। অবশ্য ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদ হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত। পত্রিকান্তরে ছদ্মনামে বাহির হইতেছিল। কয়েকটি মাত্র তখন বাহির হইয়াছে। আচার্য

যত্নাথের নিকট গিয়া এ কথা বলি। পরে সবগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে মনস্থ করিলাম পুস্তকাকারে গ্রথিত করিব। যত্নাথের নিকট এ সঙ্কল্পের কথা বলিলাম। গ্রথিত করিয়া তাঁহার আশীর্বাদস্বরূপ একটি ভূমিকা লিখিয়া দিতে বলি। তিনি সানন্দে সম্মত হইলেন। তখন আমার কোন কোন রচনার ভিতরকার বিষয়াদি লইয়া সংশোধন, পরিবর্জন ও সংক্ষেপ করা সম্বন্ধে এরূপ ভাবে বলিতে লাগিলেন যাহাতে বুঝিলাম তিনি উক্ত প্রস্তাবগুলি কিছু কিছু অন্ততঃ পড়িয়াছেন। আমার স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক ইংরেজী বইখানি প্রায় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়া নূতনরূপে প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা হইল। আচার্য যত্নাথ এই পুস্তকখানি তাঁহার গ্রন্থাগারে সযত্নে রাখিয়াছিলেন। সেই চৌদ্দ-পনর বৎসর পূর্বে ইহা বাহির হইয়াছিল, তখন তাঁহাকে একখণ্ড দিই। তিনি শুনিবামাত্র তাঁহার গ্রন্থখানি আমাকে প্রেসকপি করিবার জন্য দিতে চাহিলেন। নিজের পুস্তক থাকায় উহা লইবার আবশ্যক হয় নাই। পুস্তকখানির ফর্মা কিছু কিছু ছাপা হয় আর তাঁহাকে পাঠাইয়া দি। এই ভাবে মূল পুস্তকের শেষ ফর্মা পর্যন্ত পাঠ করিয়া একটি সুন্দর ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। আচার্য যত্নাথকে কখনও পরের মুখে ঝাল খাইতে দেখি নাই, তিনি সব বিষয়টি নিজে পড়িয়া বুঝিয়া তবে লেখনী ধারণ করিতেন। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত আমার কতকগুলি ইংরেজী রচনা তিনি দেখিয়া দিয়াছিলেন। প্রথম প্রস্তাবেই তিনি বলিয়াছিলেন "তোমার লেখা, আমি আর কি দেখব?" আমি বলিলাম "ইংরেজীটা দেখে দিন। নানা শোক তাপের মধ্যেও তিনি আমার সবগুলি লেখা দেখিয়া দেন। শেষ-কিস্তী লেখা সম্বন্ধে তাঁহার কিছু বক্তব্য থাকিলে আমাকে অবসরমত একদিন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে বলেন। গিয়া দেখি তিনি প্রায় প্রতিটি রচনা সম্বন্ধে বিভিন্ন চিরকুটে নিজ-মন্তব্য লিখিয়া রাখিয়াছেন, একটি রচনা সম্পর্কে আলোচনাকালে তিনি গ্রন্থাগার হইতে অনেকগুলি বই আনিলেন এবং উহা আমি দেখিয়াছি কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি আমার বক্তব্য নিবেদন করিলে বুঝিলাম তিনি বেশ খুশী হইয়াছেন। একখানি পুরোনো বইয়ে লিখিত একটি তারিখ ভুল বলায় তিনি তৎক্ষণাৎ পেন্সিল আনিয়া উহা সংশোধন করিয়া লইলেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও তাহার কি সত্যানুসন্ধিৎসা। দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া পারি নাই। সম্প্রতি প্রকাশিত 'ভারতের মুক্তি-সন্ধানী' পরিবর্দ্ধিত সংস্করণের একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা আচার্য যত্নাথ লিখিয়া দেন। সংক্ষিপ্ত বটে কিন্তু কি জ্ঞানগর্ভ এবং

অভিজ্ঞতাপুষ্ট। প্রথম এই ভূমিকার কথা পাড়িলে তথাকথিত রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি তাঁহার বিরূপতার কথা প্রকাশ করিলেন। তিনি প্রথম জীবনে একনাগাড়ে বহু বৎসর কলিকাতায় ছিলেন, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা তিনি কখনও শুনেন নাই। আমি বলিলাম আমার পুস্তকের নাম হইতেই শুধু রাজনৈতিক মুক্তি প্রচেষ্টাই বুঝায় নাই। জাতীয় জীবনসংগঠনের উপযোগী বাধাবন্ধহীন সর্ববিধ মুক্তি-প্রয়াসের কথাই বিভিন্ন ব্যক্তিজীবনের মাধ্যমে বিবৃত করিয়াছি। ছাপা ফর্মাগুলির প্রায় সবটা পড়িয়া উক্ত সারগর্ভ ভূমিকাটি ডাকযোগে পাঠাইয়া দিলেন। প্রকাশিত হইবার পর পুস্তকখানি হাতে দিয়া আসি। তাঁহার কঠিন আধিব্যাধির কথা জানিতাম, কিন্তু এই দেখাই যে শেষ দেখা হইবে ইহা তখন ভাবিতে পারি নাই।

আচার্য যদুনাথ সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে সাধারণ ও ব্যক্তিগত নানা কথাই হইয়াছে। কিছু কিছু এখানে বলিলাম, কিন্তু সব ত বলা বা লেখা সম্ভব নয়। তবে আরও কয়েকটি কথা এখানে নিবেদন করিব। প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুর সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। যখনই গিয়াছি ইহার কথা তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এই কাগজ দুইখানির বর্তমান রূপ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করিতেন। এই পত্রিকা দুইখানির জন্য তিনি কিছু কিছু লেখা শেষ দিকেও দিয়াছিলেন। মডার্ণ রিভিয়ুর জানুয়ারী সংখ্যার (১৯৫৭) জন্য তাঁহার লেখা চাহিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় লিখিতে পারেন নাই। এবারে আবার তাঁহাকে বলিলাম। তাঁহার স্মরণ ছিল, বলিলেন, 'গতবারে অসুস্থ না হলে তখনই লিখতাম। প্রথম সংখ্যার লেখকদের মধ্যে আমরা দুজন মাত্র বেঁচে ছিলাম। ঝাভেরি (বোম্বাইয়ের কে, এম, ঝাভেরি) সে দিন মারা গেলেন।' পূর্ব বৎসর তিনি আমাকে মডার্ণ রিভিয়ুর পঞ্চাশ বৎসর পূর্তির কথা বলিয়াছিলেন। নিতান্ত শারীরিক অসুস্থতা না ঘটিলে কোন বাধা-বিঘ্ন আচার্য যদুনাথকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিত না। এবারে (জানুয়ারী—১৯৫৮) যে কত বিপদের মধ্যে তিনি মডার্ণ রিভিয়ুর লেখা লিখিয়াছিলেন তাহা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে খানিকটা বলিতে পারি। মডার্ণ রিভিয়ুতে এই তাঁর শেষ রচনা।

প্রবাসীতে তাঁহার আত্মকথা বা স্মৃতিকথা কিছু কিছু করিয়া লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। একদিন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, "বিধান

(ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়) আমার ছাত্র। তাঁর বাবা মা ধর্মপ্রাণ, আদর্শ মানুষ ছিলেন। মাকে আমি দেখি নি, বাবার সঙ্গে আলাপ ছিল। পরিবারের অনেক কথা আমি জানি।" এ সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রবাসীতে কিছু লিখিতে বলি। একটু সুস্থ হইলেই তিনি লিখিয়া পাঠাইয়া দিবেন বলেন। যথা সময়ে লোক পাঠাইয়াছিলাম। একটু চিরকুটে লিখিয়া পাঠান, "শরীর অসুস্থ, এজন্য সম্ভব হইল না।" তাই মনে হয় ভারতের মুক্তিসন্ধানীর ভূমিকাই তাঁহার শেষ বাংলা রচনা।

পশ্চিমবংগ সরকার নিযুক্ত "রবীন্দ্র-পুরস্কার" বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন আচার্য যদুনাথ। আট বৎসর যাবৎ তিনি অতি নিষ্ঠার সহিত এই কার্য করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহাকে নিন্দা-প্রশংসা ঢের সহ্য করিতে হইয়াছে। শেষ দিকে যেন সমালোচনার মাত্রা বাড়িয়াই গিয়াছিল। তিনি সর্বদাই একটি উচ্চ মান সম্মুখে রাখিয়া সাহিত্যিক উৎকর্ষ অপকর্ষের বিচার করিতেন। অন্যান্য বিচারকেরা তাঁহার মতামত প্রায়শঃ শ্রদ্ধা বা সমর্থন করিতেন বলিয়াই তিনি এই মান বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বাংলা সাহিত্যের, বিশেষ করিয়া রস-সাহিত্যের অপকর্ষ দেখিলে তিনি দুঃখবোধ করিতেন। তিনি কোন রকম 'ক্যানভাসিং' পছন্দ করিতেন না। একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নির্বাচন সম্পর্কে কোন একজন অতি পরিচিত ব্যক্তিকে লইয়া যাই। আমার আগমন-বার্তায় আনন্দ প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু যখন উদ্দেশ্যের কথা বলিলাম এবং আগন্তককে পরিচয় করাইয়া দিলাম, তখন তিনি বলিলেন "হ্যাঁ ওঁকে আমি জানি। এজন্য আমার কাছে আসতে হবে কেন? আর আমি এটা চাই না যে, পঞ্চাশ জন লোক আমার কাছে ভোট ভোট করুক।" আমরা সময়োচিত দুই-একটা কথা বলিয়া বিদায় লইলাম।

রবীন্দ্র-পুরস্কার সম্পর্কে যে ক্যানভাসিং হইত আভাসে তাহা বুঝিতাম। আচার্য যদুনাথ একদিন বলিলেন "···উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী বেশ মোটা মাইনে পান ত। একখানি চতুর্থ শ্রেণীর বই লিখে রবীন্দ্র-পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষাই বা কেন, আবার গরীব যোগ্য লেখকদের প্রাপ্যে ভাগ বসানরই বা চেষ্টা কেন?" তিনি এই ব্যাপারে এত চটিয়া গিয়াছিলেন যে, পরেও একাধিকবার এ কথা আমাকে বলিয়াছেন। কর্তৃপক্ষ কিন্তু তাঁহার বিচারে বরাবর সন্তুষ্টই ছিলেন। পরে একদিন তাঁহার মুখে শুনিলাম তিনি পদত্যাগ

করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে কথা উঠিলেই তিনি বলিতে লাগিলেন, "আট বৎসর পর্যন্ত আমি উচ্চ মান রক্ষা করে চলেছিলাম। যখন দেখলাম যাদের জন্য এই চেষ্টা তারাই অসন্তুষ্ট তখন আর আমি যুক্ত থাকা সমীচীন বোধ করি নি ; গত ডিসেম্বর মাসে (১৯৫৭) পদত্যাগ করেছি।...বলেছিল আমি যতদিন আছি ততদিন তারা নিশ্চিন্ত। এ সত্ত্বেও আমি রিজাইন করেছি। শরীরেও কুলায় না।" যত্নাথ আরও বলিলেন "...অত পণ্ডিত লোকে—গতবার এমনভাবে টেবিল চাপড়ে একখানি বইয়ের সমর্থন করতে লাগলেন যে, আমি ত অবাক।" ক্যানভাসিং সম্বন্ধে খানিকটা কৌতূহল প্রকাশ করায় যত্নাথ বলিয়াছিলেন, "খুব চলে, এবারও এই সেদিন একজন একখানা বই নিয়ে এসেছিলেন। আমি বলে দিয়েছি যে, আমি আর কমিটিতে নেই।"

আচার্য যত্নাথ কাহারো মধ্যে কিছু ভাল দেখিলে তাহাকে অন্তর দিয়া সমর্থন করিতেন। ডক্টর মেঘনাদ সাহার কথা তাঁহার মুখে পূর্বে দুই-একবার শুনিয়া থাকিব। যত্নাথের অসুস্থতার কথা শুনিয়া মধ্যে কিছুদিন দেখা করিতে যাই নাই। একদিন কাগজে দেখিলাম তিনি ডক্টর সাহার মৃত্যু-বার্ষিকী সভায় পৌরোহিত্য করিয়াছেন। আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়াই কুশলবার্তা গ্রহণের পর উক্ত সভায় পৌরোহিত্য করার কথা জিজ্ঞাসা করি। তিনি তখন বলিলেন "আমি একটু সুস্থ হয়েছি, মেঘনাদ মৃত্যুর দু তিন দিন পূর্বে যেদিন দিল্লী যায় সে দিন সন্ধ্যায় আমার সহিত দেখা করতে এসেছিল। সে কি বলে জান? আমরা স্বাধীনতা পেয়ে পূর্ববঙ্গ হারিয়েছি, বঙ্গ-বিহার মার্জার হলে পশ্চিমবংগের অস্তিত্বটুকুও লোপ পাবে। বড় খাঁটি কথা। আমি নিছক কর্তব্যবোধে সেদিন তার স্মৃতি-তর্পণ সভায় গিয়েছি।" এই প্রসংগে আর একটি কথা মনে হইতেছে। আচার্য যত্নাথ একদিন বলেন, "বসুধারা কাগজখানি বড় ভাল হয়েছে। এর সম্পাদক আমার বন্ধুপুত্র। নির্মলের (নির্মলকুমার বসু) পিতা পাটনার আই-এম-এস ডাক্তার ছিলেন। বংগ-বিহার মার্জার সম্বন্ধে নির্মলের লেখাটিতে প্রকাশিত মত আমারও মত, লেখাটি বড় ভাল হয়েছে।" তিনি এবারে এবং পরেও বহুবার এই পত্রিকার মুদ্রণ-পারিপাট্য, রূপসজ্জা এবং রচনাদির উৎকর্ষ সম্বন্ধে আমাকে বলিয়াছিলেন। 'বসুধারা' মাসিকপত্রখানি প্রায়ই বড় বড় অক্ষরে ভাল কাগজে ছাপা, তাঁহার পড়িবার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক ছিল। কথা প্রসংগে বলিয়াছিলেন, "প্রবাসী এবার বেশ ভাল হয়েছে। কয়েকটি ভাল ভাল

লেখাই তোমরা এবার দিয়েছ।" তখন পরবর্তী একটি সংখ্যায় লেখা দিবেন বলিয়াছিলেন। যদুনাথ 'পরশুরামে'র লেখার বেশ অনুরাগী ছিলেন। তিনি আমাকে বলেন, "রাজশেখর বোস ত এখনও বেশ লিখছেন। কোন কোন পত্রিকায় ত বার হচ্ছে, তোমরা তাঁর লেখা নেবার চেষ্টা করতে পার না?" আমি উপস্থিতমত আমার বক্তব্য বলিলাম।

আচার্য যদুনাথ স্বদেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি হউক ইহাই মনে প্রাণে কামনা করিতেন। তিনি তাঁহার পৌত্রদ্বয় এবং দৌহিত্রদের কাহাকে কাহাকেও সামরিক বিভাগে যোগদানে প্রবৃত্ত করান। শুনিয়াছি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকেও (যিনি দাঙ্গায় নিহত হন) তিনি যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার জন্য প্রথমে সৈন্য-বিভাগে দিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পৌত্রের আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া তাহার সহিত দেখা করিতে যাই। যদুনাথ দীর্ঘ জীবনে এ পর্যন্ত বহু মৃত্যু-শোক ও আঘাত পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে অবিচলিতই দেখিয়াছি বরাবর। তিনি দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা পুরুষসিংহ। কিন্তু এদিন পৌত্রের শোকে তাঁহাকে বেশ কিছুটা বিচলিত দেখিলাম। তিনি কথায় কথায় বলিলেন, "আমার সংসার এখন কে দেখবে? তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "দেশ যখন স্বাধীন হয়েছে, তখন প্রত্যেক পরিবার থেকেই সামরিক বিভাগে ছেলেদের পাঠানো দরকার। আমি এজন্য কয়েকটি নাতিকে এ বিভাগে দিয়েছি।" পৌত্র ও দৌহিত্রেরা কে কোথায় কি ভাবে লিপ্ত আছে একে একে বলিয়া গেলেন। একটি মাত্র দৌহিত্র তাঁহার সংগে আছে, বি-কম পড়ে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিতে আসিতে মনে হইল, আচার্য যদুনাথকে এরূপ বিচলিত হইতে ত কখন দেখি নাই। ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কতকটা শংকিত হইলাম। ওরূপ অসহায় উক্তি তাঁহার মুখ হইতে ইতিপূর্বে শুনি নাই। এ সত্ত্বেও তাঁহার সংযম ছিল অনন্যতুল্য। নিজের নিমিত্ত ছিলেন একেবারে নির্বিকার। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। একদিন দেখা করিতে যাই। তিনি বলিলেন, "তাঁহার Prostrated glands অপারেশনের কথা চলছে, বাড়ীতে ত ঘোর আপত্তি। স্ত্রী বলছেন, "অপারেশন হলে টেবিলেই মারা যাবে।" আমাকে কেউ কেউ আবার বলেছেন মোটেই ভয় নেই। একজন নব্বই বৎসরের বুড়ো মুসলমান অপারেশনের পর একেবারে ভাল হয়ে গেছে। আমার আবার আর একটি ব্যাপারও হয়েছে; কিডনিতে পাথর। ছবি নেওয়া হয়েছে। দেখলাম তাল মিছরীর বড় বড় টুকরোর

মত। যা হক, হাসপাতালে কয়েকদিন গিয়ে থাকতে হবে। চিকিৎসকেরা দেখে শুনে বলবেন, অপারেশন চলবে কি না।" তিনি এ সম্পর্কে লিটারেচার পড়িয়া লইয়াছেন। ঠিক শিক্ষক যেমন ছাত্রকে বোঝান আমাকে তেমনি বুঝাইতে লাগিলেন। মনে মনে তাঁহার নির্বিকারচিত্ততা দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া পারিলাম না। আরও কোন কোন বিষয়ে তাঁহার দৃঢ়তার পরিচয় পাইয়াছি, কিন্তু সব কথা হয়ত বলিবার সময় এখনও আসে নাই।

আচার্য যদুনাথের শিক্ষক ও ছাত্র গবেষকদের প্রতি প্রীতি-স্নেহ ছিল অসাধারণ। বহু ছাত্রের ডক্টরেট থিসিস সম্পর্কে তিনি নির্দেশ দিতেন, থিসিস সংশোধন ও পরীক্ষা করিতেন। রচনা সংশোধন করিতেন এবং যোগ্য গবেষকদের বুধমণ্ডলীর সংগে পরিচিত করাইয়া দিতে প্রয়াস পাইতেন। তাঁহার গ্রন্থাগারের সাহায্যে বাঙালী-অবাঙালী বহু কৃতী ছাত্র গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডক্টর কালিকারঞ্জন কানুনগো ছিলেন তাঁহার পুত্রতুল্য। ডঃ কানুনগোর একজন নিকট-আত্মীয়ের মুখে শুনিয়াছি প্রথম দিকে তাঁহার গবেষণা-প্রবণতা লক্ষ্য করিয়া যদুনাথ কতরূপে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ সাহিত্য-ইতিহাস গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি কিরূপ শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, বহু বৎসর যাবৎ নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ব্রজেন্দ্রনাথ আমাদিগকে বলিয়াছেন, তাঁহার জীবন-পঞ্জীতেও লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার প্রথম গ্রন্থ "বেগম সমরু" যদুনাথের দৃষ্টির জন্য পাঠাইলে তিনি লিখিয়াছিলেন, "ইহা উপন্যাস, ইতিহাস নহে।" ইহার পর আচার্য যদুনাথকেই গুরুবরণ করিয়া তাহারই নির্দেশ ও পরিচালনাধীন গবেষণা কার্য শুরু করেন ব্রজেন্দ্রনাথ। দ্বিতীয় পর্যায়ে, মোগল যুগের ইতিহাস ছাড়িয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক লইয়া ব্রজেন্দ্রনাথ যে ঐরূপ সার্থক গবেষণা কার্য করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার মূলে ছিল আচার্য যদুনাথের নিকট প্রাপ্ত ইতিহাস গবেষণায় শিক্ষা ও নির্দেশ। আমরা যাহারা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক, তাহাদিগকেও যদুনাথ বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। এবং আমাদের কার্যের বিশেষ খোঁজখবর লইতেন। তাঁহার সংগে আমার পরিচয়, সংস্রব ও ঘনিষ্ঠতার কথা এই প্রবন্ধে বহু স্থলে বলা হইয়াছে। একটি বিষয় মাত্র এখানে বলি। আমার দৃষ্টিশক্তি লোপের কথা জানিয়া তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। শেষদিকে যখনই তাঁহার নিকট গিয়াছি কাজ ও কথা সারিয়া

সত্বর ফিরিয়া যাইবার নির্দেশ দিতেন। আমি নব-বারাকপুরে নিজগৃহে বাস করিতেছি জানিয়া তাঁহার কতই না আনন্দ। আবার এই স্থানটির খোঁজ-খবরও তিনি রাখিতেন। এ বিষয় তাঁহার কথাবার্তা হইতে বুঝিতাম। একদিন আমার পুত্রকে লইয়া গেলে ফিরিবার সময় আমার অগোচরেই তাহাকে বলেন, পরে ইহা আমি শুনি, "দেখো তোমার বাবা চোখে কম দেখেন, ঠিকমত পথ দেখিয়ে-শুনিয়ে নিও।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবরূপায়ণে ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয় আচার্য যদুনাথ সরকার বহু পূর্বে মডার্ণ রিভিয়ুতে লিখিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার পদে তিনি নিযুক্ত হন ১৯২৬ সনে। তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন দুই বৎসর। এই সময় একটি দল হইতে তাঁহাকে ভীষণ বাধা পাইতে হয়। ইহার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁহার কোন সংস্রব ছিল না। স্বাধীনতার পর নূতন আইন বলে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম লাইফ-মেম্বার বা আজীবন সদস্য হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ-উৎসব প্রতিপালিত হইবে, এই উৎসবে একখানি শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থও প্রকাশিত হইবে স্থির হয়। একদিন আচার্য যদুনাথ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, এই শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ রচনা ও সংকলন ব্যাপারে আমাকে কোন অংশ দেওয়া হইয়াছে কিনা। উত্তর শুনিয়া তিনি বিশেষ খুশী হইলেন না। স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের পর একদিন তাঁহার সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হইল, তখন স্বভাবতঃই এ বিষয়ে কথা উঠিল। তিনি বলিলেন, "নিজেদের কথাই এতে বেশী ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে বলা হয়েছে, ইতিহাসের ধর্ম ত ও নয়।" শতবর্ষ স্মারক উৎসবে কয়েকজন গুণী-জ্ঞানীকে অনারারি ডক্টরেট উপাধি দেওয়া হইবে—বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্থির করিলেন। নিয়ম এই যে, যাঁহাকে এই সম্মানসূচক উপাধি দেওয়া হইবে তাঁহার সম্মতি পূর্বেই লইতে হয়। উপাধি-দান উৎসব হইয়া গেল। গুজব, আচার্য যদুনাথকেও এই সম্মান দিতে চাহিয়া কর্তৃপক্ষ পত্র দিয়াছিলেন। তিনি ইহার উত্তরে এক কড়া চিঠি লেখেন। বিশ্ববিদ্যালয়-মহলে ইহা লইয়া একটি জটলাও উপস্থিত হয়। আচার্য যদুনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। প্রসঙ্গত ঐ কথা উঠিল। তখন তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে অনারারি ডক্টরেট উপাধি দিবার জন্য আমার সম্মতি চান, আমি চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছি আমি ডক্টরেট চাই না।" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে অনারারি ডক্টরেট দিয়াছিলেন একুশ বৎসর পূর্বে ১৯৩৬ সনে, পাটনা

বিশ্ববিদ্যালয় দেন ১৯৪৪ সনে। তিনি দেশ-বিদেশের আরও বিস্তর বিদগ্ধ-মণ্ডলীর নিকট হইতে বিবিধ সম্মান লাভ করিয়াছেন। কিন্তু দীর্ঘকালের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি কোন সম্মানই প্রাপ্ত হন নাই। শতবর্ষ পূর্তি উৎসবে আরও দশজনের সঙ্গে তাঁহাকে উক্ত সম্মান প্রদানের প্রস্তাবে তাঁহার অভিমান হওয়া স্বাভাবিক, যখন আমরা দেখি তাঁহার একাধিক ছাত্র এবং ছাত্রকল্প-গুণীকে এই সঙ্গে উক্ত সম্মান দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সাক্ষাৎকারের সময়ই তিনি কথাচ্ছলে বলিলেন, "দেখ কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কয়েক বছর আগে কি একটা উৎসব উপলক্ষে একঝুড়ি-লোককে ডক্টরেট উপাধি দিয়েছিলেন। আমাকেও তাঁরা পত্র দেন এই উপাধি দেবার জন্য। তাঁদেরও লিখেছি, আমার ও সম্মানের প্রয়োজন নেই।··· আমি কালীঘাটের পাঁঠাবলি হতে চাই না।" ব্রিটিশ আমলের উপাধিদান-প্রথা রহিত করিয়া দিয়া স্বাধীন ভারতে পুনরায় অনুরূপ 'পেট্রনেজ' প্রবর্তিত হয় এটা আচার্য যদুনাথের পছন্দসই ছিল না। শুনিয়াছি ভারত সরকার তাঁহাকে 'পদ্ম বিভূষণ' উপাধি দিতে চাহিয়াছিলেন। উহা গ্রহণেও তিনি সম্মত হন নাই।

আমার একখানি বড় বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈয়ারী ছিল। ইহা প্রকাশের কিঞ্চিৎ সম্ভাবনা হইয়াছে জানিয়া তিনি খুশী হইলেন। কিন্তু প্রাপ্ত টাকার অঙ্ক শুনিয়া, কি একটা হিসাব করিয়া বলিলেন, "এতে ত তোমার কাগজটা শুধু কেনা চলবে।" ইহার পর তিনি বলিতে লাগিলেন, "সেই কাগজই বা পাবে কোথায়? আজকাল কাগজ পাওয়া বড় দুর্ঘট হয়েছে। গবর্ণমেন্টের লোক পেপার মিলে বসে আছে। তাদের দু'হাজার টন কাগজ জুগিয়ে তবে ছিটে-ফোটারও বেশীর ভাগ যাবে পাঠ্য পুস্তক বার করতে।" সরকারের এই হস্তক্ষেপকে তিনি মোটেই ভাল চক্ষে দেখেন নাই। তিনি বলিতেন, "যত সব বক্তৃতা বই করে ছাপান হচ্ছে। দিল্লীতে এগুলি স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে। এতে কোনই লাভ নেই। আসল ছেড়ে মেকির প্রচারে এই মাতামাতি আমাদের কত ক্ষতি করছে।"

আচার্য যদুনাথকে একবার মাত্র ক্ষণিকের জন্য বিচলিত হইতে দেখিয়াছি, পৌত্রের মৃত্যুতে। কিন্তু যতবার তাঁহার সান্নিধ্যে গিয়াছি দুঃখ-শোক তাঁহাকে যেন স্পর্শই করিতে পারিত না। কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, পত্রে সে কথা না জানাইয়া লিখিলেন, "একটু পারিবারিক অসুবিধার

মধ্যে আছি, শীঘ্রই তোমাকে জানাইব।" এই পুত্রটি বেশ কয়েক বৎসর কঠিন রোগে ভুগিতেছিলেন। শেষে একবার তাঁহাকে গোপালপুরে স্বাস্থ্য-নিবাসে পাঠানো হয়। সঙ্গে যাইবে ডক্টর কানুনগোর পুত্র। তিনি সব বিষয় খুঁটিনাটি তাহাকে বলিয়া দিলেন। এমনকি মৃত্যু হইলে কাহাকে জানাইতে হইবে, কোথায় দাহ করাইতে হইবে, তাঁহাকে কিরূপে জানাইবে—ইত্যাদি সব ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিয়া দিলেন। সে যাত্রা অবশ্য এরূপ বিপত্তি ঘটে নাই। কলিকাতায় ফিরিয়া আসার পর বোধ হয় ১৯৫৫'র শীতের প্রাক্কালে পুত্রটি মারা যান। উক্ত পত্র পাইয়া কিছুকাল পরে যখন যাই তখনও তিনি আমাকে পুত্রের মৃত্যুর কথা বলেন নাই; কাজের কথা যা কিছু বলিয়া গেলেন। পরে যখন এই বিষয় জানিলাম, তখন স্বতঃই গীতার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি মনে আসিল—"দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা।" তাঁহার সহধর্মিণী দ্বিতলে আছাড় খাইয়া পড়েন। এবং মেরুদণ্ডের হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। এ জন্য তিনি কয়েক বছরই শয্যাশায়ী ছিলেন। অল্পদিন পূর্বেও আচার্য যদুনাথ আমাকে বলিয়াছিলেন, "কোন রকমে ধরিয়া উঠাইতে হয়; বৃদ্ধবয়সে স্বাভাবিক শক্তির স্বল্পতা হেতু হাড় জোড়া লাগিবার সম্ভাবনা থাকে না। যদুনাথ গ্রীষ্মকালে বরাবর শৈলাবাসে থাকিতেন। বার্ধক্যহেতু হাই অলটি-চিউডে ওঠা যখন ডাক্তারের আদেশে নিষিদ্ধ হইল তখন হইতে তিনি দার্জিলিং-এ যাওয়া ছাড়িয়া দিলেন। শেষে প্রতি বৎসর তিনি পুণায় গিয়া এই সময় সরদেশাইয়ের সন্নিধানে কাটাইতেন, এ কথা পূর্বে বলিয়াছি। সহধর্মিণীর অসুস্থতাহেতু শেষ তিন-চার বৎসর আর পুণায় যাইতে পারেন নাই। তিনি গ্রীষ্মের সময় কিছুই লিখিতে বা পড়িতে পারেন না বলিয়া আমার নিকট কতবার আক্ষেপ করিয়াছেন। বিদ্যাচর্চায় তাঁহার কি আকূতি!

গবেষণায় যেখানে ঐকান্তিকতা বা নিষ্ঠার অভাব দেখিতেন সেখানেই তিনি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কম্প্রোমাইজ বা আপোষ রফা কাকে বলে জানিতেন না। এইজন্য অনেক গবেষকের গবেষণা-কার্যের উপর তাঁহার বিরাগ দেখিয়াছি, আবার যাহার মধ্যে ঐকান্তিকতা বা নিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়াছেন তাহাকে তিনি প্রাণ ঢালিয়া সকল প্রকারে সাহায্য করিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, দল করিয়া সাহিত্য রচনা বা ইতিহাস গবেষণা হয় না। ইহা নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং গভীর সাধনা-সাপেক্ষ।

সেবার নিখিল ভারত ইতিহাস সম্মেলন হইল কলিকাতায়। আচার্য যদুনাথের নামগন্ধ পাইলাম না। একদিন যদুনাথের নিকট যাই। ইতিহাস সম্মেলনের কথা উঠিল। ইহাতে তাঁহাকে অংশগ্রহণ করিতে না দেখিয়া কৌতূহলী হইয়া ইহার কারণ শুধাইলাম। তিনি বলিলেন—"হ্যাঁ, আমার কাছে এসেছিল, আমি যাব না বলে দিয়েছিলাম। এইরকম করে কি ইতিহাস গবেষণা হয় : না এর কোন সুযোগ করিয়ে দেওয়া যায়? এতে অর্থ নষ্ট, সময় নষ্ট, শক্তি ক্ষয়।" স্বাধীনতার ইতিহাস রচনার তোড়জোড় খুব। তিনি বলেন, "হ্যাঁ কংগ্রেসের লোক এখানে এসেছিল আমাকে এই ভার নিতে বলে, কিন্তু আমি এ ভার নি'ইনি। ওরা মোটা টাকা খরচও করবে বলেছে। দেখো, শ্রমের একটা মূল্য আছে, বিনি পয়সায় কিছু করো না।"

পশ্চিমবংগ সরকার স্বাধীনতার ইতিহাসের মালমসলা সংগ্রহের নিমিত্ত একটি নিয়ামক-কমিটি গঠন করেন; বর্তমান গ্রন্থকারও ইহার একজন সদস্য ছিলেন। কমিটির পক্ষে একদল কর্মী গবেষক উক্ত কার্যের জন্য সবেতনে নিযুক্ত হন। আচার্য যদুনাথের নিকট এসব কথা বলায় বুঝিলাম তিনি সকল খবর রাখেন। কিন্তু ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ আশা পোষণ করিতেন না। তাঁহার সন্দেহ শেষে কার্যে পরিণত হইল। স্বাধীনতার ইতিহাস রচনার যত উদ্যোগ কোথায় মিলাইয়া গেল! এইপ্রকার উদ্যোগ আয়োজন যে অনেক ক্ষেত্রেই ফলপ্রসূ হয় না, আচার্য যদুনাথ তাহার একটি দৃষ্টান্ত আমাকে দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহাসমরে ভারতবর্ষের সার্থক অংশ গ্রহণের কথা একখানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে ভারত সরকার কর্তৃক জনৈক ইংরেজ-ঐতিহাসিক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ইতিহাস রচনার কাজে অনেকটা অগ্রসর হন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারত সরকার এই ব্যক্তিকে যথাযথ খেসারত দিয়া বিদায় দিলেন। ইতিহাস রচনায় ভারতীয় ঐতিহাসিক নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার সহকারীও হইলেন অনেক। ব্যয়বরাদ্দ লক্ষ টাকার মত। কিন্তু কিছুকাল পরে সব আয়োজন কোথায় মিলাইয়া গেল! এইরকম স্বাধীনতার ইতিহাস রচনাও আর হইল না। তবে কোন কোন রাজ্য-সরকার উদ্যোগী হইয়া নিজ নিজ রাজ্যের স্বাধীনতার ইতিহাস সংগৃহীত মাল-মসলার ভিত্তিতে রচনা করাইয়াছেন। বিহার রাজ্যের স্বাধীনতার ইতিহাস তিন খণ্ডে লিখিয়াছেন ডক্টর কালীকিঙ্কর দত্ত। আচার্য যদুনাথ বলিলেন, "এই সেদিন কালীকিঙ্কর বিহার রাজ্যের

স্বাধীনতার ইতিহাস তিন খণ্ড আমাকে দিয়ে গেছে, সে বলেছে ডকুমেণ্ট সব এক জায়গায় করে দিয়েছি। অন্ততঃ এগুলো তো এই বইয়ে রক্ষিত হ'ল।" উদীয়মান ইতিহাস গবেষকদ্বয়ের একখানি বইয়ে আচার্য যদুনাথ, বিখ্যাত পেট্রিয়ট সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে নিজ অভিজ্ঞতা ও ধারণার কথা একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এ বিষয়ে কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, "...এর কথা তো অনেকে লেখে, দেশে ধার্মিকের তো অভাব নেই, বামাক্ষ্যাপাও ধার্মিক, কিন্তু সত্যকার ত্যাগী ও সেবাপরায়ণ সতীশ মুখুজ্জের কথা ক'জনে জানে? তাঁকে আমি খুব বেশি দেখি নি; কিন্তু যতটুকু দেখেছি তাতেই তাঁর সম্বন্ধে উঁচু ধারণা আমার জন্মেছিল।"

দুইটি পত্রিকার প্রতি আচার্য যদুনাথের একটি স্বাভাবিক মমতা ছিল। তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় কথাবার্তায় ইহা বহুবার প্রকাশ পাইয়াছে। কুমার বিমলচন্দ্র সিংহের বাড়ীতে একটি সাহিত্যিক সম্বর্ধনা সভা হইয়াছিল। সভার সভাপতি আচার্য যদুনাথ। সভান্তে একটি প্রকোষ্ঠে তিনি জলযোগে রত ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতেই দুই-একটা কথার পর তিনি বলিলেন, "নরেন্দ্রবাবুর (কবি নরেন্দ্র দেব) একটি সুন্দর লেখা আছে শরৎচন্দ্রের উপর। এই লেখায় তিনি শরৎ-সাহিত্যের ভাল এষ্টিমেট করেছেন। লেখাটি নিয়ে তোমরা ছাপাতে পার না? হিন্দু হোষ্টেলের সভায় তিনি এটি পড়েছিলেন।"

সুরেশচন্দ্র মজুমদার পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুকালে আচার্য যদুনাথ কলিকাতার বাহিরে ছিলেন। ফিরিয়া আসিলে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। তাঁহার সঙ্গে সেদিন প্রথমেই কথা হইল সুরেশবাবু সম্পর্কে। যদুনাথ তাঁহার মৃত্যুতে কত দুঃখিত। আনন্দবাজার পত্রিকার অবস্থাদি সম্বন্ধে জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আমি তাঁহার সব কথার জবাব দিতে পারিলাম না। তিনি কতকগুলি বিষয়ে খোঁজ-খবর লইয়া তাঁহাকে জানাইতে বলেন। এমন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত দেশীয় প্রতিষ্ঠান —এখন বাঙালীর দুর্দিন উপস্থিত—এটি বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করিবে। ইহার যাহাতে কোনরূপ ক্ষতি না হইতে পারে সে বিষয়ে সেদিন আচার্য যদুনাথের কতই না ঔৎসুক্য দেখিয়াছি। ইহার পরেও 'প্রবাসী' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা' এই দুইখানি প্রথম শ্রেণীর কাগজ সম্বন্ধে তিনি নানা প্রশ্ন করিয়া মূল অবস্থা জানিতে চাহিতেন।

গত ত্রিশ বৎসরে আচার্য যদুনাথকে দূর ও নিকট হইতে নানাভাবে দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। তিনি কত বিষয়ে কত কথা বলিয়াছেন। এখন যাহা কিছু মনে পড়িল তাহাই কথায় বিধৃত করিতে চেষ্টা পাইলাম। ঊনবিংশ শতাব্দীর টিপিকাল বাঙালী ছিলেন তিনি। তাঁহার জিজ্ঞাসু মন গত শতকের মহামনা ব্যক্তিদের মত সর্বদাই উন্মুক্ত ছিল। এই জিজ্ঞাসু মন বিংশ শতাব্দীরও একটি পরম সম্পদ। তিনি দুই শতাব্দীর সেতু স্বরূপ হইয়া জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া গিয়াছেন, তিনি আমাদের নমস্য।

অনেক কথাই অ-বলা রহিল। শেষ সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। হাসপাতালে তাঁহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। অস্ত্রোপচার করিবেন না, চিকিৎসকমণ্ডলী স্থির করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "তাঁরা আমাকে খাদ্যাখাদ্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন; আমার চিকিৎসা এখন পথ্যকে ভিত্তি করে। মাংস খাওয়া একেবারে নিষেধ, মাছও ত্যাগ করেছি।" অতঃপর নানা বিষয়ে কথা উঠিল। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁহার আগ্রহ আমি জানিতাম। প্রেসিডেন্সী কলেজের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে তিনি জাতির প্রয়োজন-উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য চিন্তাশীল ও কর্তৃস্থানীয়দের নিকট আবেদন জানাইয়াছিলেন।

শিক্ষার কথা পাড়ায় তিনি বলিলেন, "আমি দু'বছর ভাইসচ্যান্সেলার ছিলাম। এডমিনিষ্ট্রেশানের দিকে কিছু কিছু সংস্কার করতে পেরেছি। শিক্ষার সংস্কার কিছুই করতে পারি নি। তখন আমার কাজে খুব বাধা পেয়েছি।..." ইহার পর তিনি বলিলেন, "আমি যখন সরকারী চাকুরী থেকে অবসর নি, তখন দু'বছরের জন্য নূতন একটি সরকারী কাজের প্রস্তাব আসে। আমি তা গ্রহণ না করে কিছু ভাল কাজ করতে পারব বলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ গ্রহণ করি। ঐ সরকারী পদের বেতন ছিল মাসে বার-তের শ' টাকা। এই দু'বছরে আমি ৩০ হাজার টাকার ক্ষতি স্বীকার করেছি। তবে কি জান, দেশের কাজ কিছু করতে হলে ত্যাগ স্বীকার চাই। এই মনোবৃত্তি আমাদের ভেতর বাড়াতে হবে।'

শেষ সাক্ষাৎকারের এই কথাগুলি এখনও যেন কানে অনুরণিত হইতেছে।

হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

একদিন সিটি কলেজের বারান্দায় এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখিলাম, তাঁহার সঙ্গে মনে হয় কোন অধ্যাপক কথা বলিতেছিলেন। অনুসন্ধানে জানিলাম, তিনি ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়। সিটি কলেজে বহুদিন অধ্যাপকতা করিয়াছেন, তখন তিনি ইউনিভার্সিটির কলেজ ইনস্পেক্টর। ইহার পর বেশ কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। সংবাদপত্রে হরেন্দ্রকুমারের দানের কথা পড়ি আর বিস্ময়াপন্ন হই। অনুন্নত দুঃস্থ প্রোটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টানদের স্কুল-কলেজের শিক্ষার সুবিধা নিমিত্ত তিনি এই দান করিতেছিলেন। কিস্তিতে কিস্তিতে যে-সব দান করিয়াছিলেন, এক সময়ে তাহার হিসাব বাহির হইল আট লক্ষ টাকা। শিক্ষাব্রতী হরেন্দ্রকুমার এত দান কেমন করিয়া করিতেছেন তাহা জনসাধারণের নিকট রহস্যের বিষয়ই বটে। কিন্তু তিনি সত্যিই এইরূপ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে মিশিয়া ক্রমশঃ ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য জানিতে পারিলাম।

দীর্ঘকাল কলেজ ইনস্পেক্টরি করিয়া পুনরায় তিনি শিক্ষাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকপদে তখন তিনি নিযুক্ত। তাঁহার তথ্যমূলক জাতীয়তাভিত্তিক প্রবন্ধসমূহ 'মডার্ন রিভিয়ু'তে একাদিক্রমে বাহির হয়। হরেন্দ্রবাবু দেশীয় খ্রীষ্টান, কিন্তু জাতীয়তাবাদের আদর্শে একান্ত উদ্বুদ্ধ। ১৯৩৫ সনের ভারত-শাসন আইনবলে বঙ্গে যে নূতন আইন-পরিষদ গঠিত হয় তাহাতে তিনি দেশীয় খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় আইন-পরিষদে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতাগুলি লীগপন্থীদের এবং ইংরেজ 'ডাইহার্ড'দিগের মোটেই পছন্দসই ছিল না। তিনি পরিষদে সব সময় জাতীয়পন্থীদের সঙ্গে হাত মিলাইয়া চলিতেন। এ কারণ তিনি জাতীয়পন্থী মাত্রেরই বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠেন। আমরাও তাঁহার গুণমুগ্ধ হইয়া পড়িলাম।

ষোল কি সতের বৎসর পূর্বের কথা। তখন মহাসমর পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল। হরেন্দ্রবাবু মধুপুরের বাড়ীতে থাকিতেন। ডিহি শ্রীরামপুরের

বাড়ী তখন অন্যদের বাসের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আমার ইংরেজী স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক পুস্তকখানি তাঁহাকে উপহার দিতে চাই—জানাইয়া পত্র দিলাম। তিনি কলিকাতায় কবে নাগাদ আসিবেন, কোথায় উঠিবেন ইত্যাদি লিখিয়া আমাকে উত্তর দিলেন। নির্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যার সময় ইন্টালী অঞ্চলের একটি গির্জায় গেলাম। হরেন্দ্রবাবু অল্পক্ষণ পরেই ইউনির্ভাসিটির কি একটা মিটিং সারিয়া ওখানে ফিরিলেন। তাঁহার হুঁকা আসিল। তামাকু খাইতে খাইতে অনেকক্ষণ আলাপ করিলেন। আমার বইখানি তাঁহাকে দিলাম, তিনি সাদরে গ্রহণ করিলেন। যেন কত কালের পরিচয়! বইখানির পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিলেন যে, বিদেশী খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ এদেশীয়দিগকে ধর্ম শিখাইতে গিয়াই ভীষণ ভুল করিয়া বসিয়াছেন। ভারতবাসীদের বাহিরের লোকে কি ধর্ম শিখাইবে! খ্রীষ্টানধর্মে তিনি বিশ্বাসী, কিন্তু খ্রীষ্টান এদেশীয়দিগকে নানা ভাবে একেবারে 'বিজাতীয়' করিয়া তোলায় যত অনর্থ ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। তাঁহাদের শিক্ষা প্রচেষ্টাদির দ্বারা দেশ আরও বেশী উপকৃত হইত, যদি খ্রীষ্টীয়করণ ইহার অঙ্গীভূত না হইত। এই প্রথম দিনেই তিনি বিভিন্ন বিষয়ে যে কত উদার মত পোষণ করেন, তাহা জানিতে পারিলাম।

ইহার পর বহুবার বিভিন্ন স্থলে তাঁহার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছে। তিনি কলিকাতায় পুনরায় স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করিবার পর তাঁহার ডিহি শ্রীরামপুর ভবনেও কয়েক বার গিয়াছি। কোন কোন দিন দু'ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা পর্যন্ত নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হইত। তিনি খুব গল্প বলিতে, অর্থাৎ সত্য ঘটনা গল্পের মত করিয়া বলিতে পারিতেন। তিনি ছিলেন সত্যিকার শিক্ষাব্রতী। মানব-মনের কোন তন্ত্রীতে ছোঁয়া লাগিলে কিরূপ সাড়া দেয় তাহা তিনি বেশ জানিতেন। তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তায় সাধারণ জ্ঞাতব্য বহু বিষয়ও জানিবার সুযোগ হইয়াছিল। আমি দিনলিপি রাখি না, নহিলে দিন-তারিখ মিলাইয়া তাঁহার কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করিতে পারিতাম। যাহা হউক, স্মৃতি হইতেই এ সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিতে পারি।

প্রথম সাক্ষাৎ বা দ্বিতীয় সাক্ষাতের দিন আমার বাড়ী বরিশাল জানিয়া বরিশালের সঙ্গে তাঁহার প্রথম জীবনের যোগাযোগের কথা উত্থাপন করিলেন। বরিশালে তখন দুইটি কলেজ ছিল—একটি ব্রজমোহন কলেজ, অপরটি রাজচন্দ্র কলেজ। এম-এ পাস করিবার পর হরেন্দ্রবাবু

রাজচন্দ্র কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক হইয়া যান। কিছুকাল থাকিয়া সিটি কলেজে চাকুরী লইয়া আসেন। বরিশালে থাকিতেই তিনি স্থানীয় এক খ্রীষ্টান দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহে তাঁহার একটি পুত্রসন্তান জন্মে। তাঁহার প্রথমা পত্নী গত হইলে তিনি শ্রীযুক্তা বঙ্গবালাকে বিবাহ করেন। এই দিন কি অন্য দিন বলিতে পারি না, এ পুত্রের কথা উঠিতেই তিনি অনেক কথা বলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার পুত্র তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে দুরারোগ্য টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হইয়া মারা যায়। তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমি কি ভাগ্যবান, কলিকাতায় এমন নামী লোক খুব কমই ছিলেন, যিনি পুত্রের অসুখের সময় এই জীর্ণ কুটীরে পদার্পণ করেন নি। সার্ আশুতোষ প্রত্যহ সন্ধ্যায় ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরার পথে আমার ছেলেকে দেখে যেতেন। সার্ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী আসতেন। ডাক্তার নীলরতন সরকার ত তাকে চিকিৎসাই করেন, যমে-মানুষে টানাটানি চলল কত দিন, পরে আমার একমাত্র পুত্র মারা গেল।" এই যে কথাগুলি আমায় বলিয়া গেলেন, এসময় তাঁহার মুখে কোন ভাবান্তর দেখি নাই। হরেন্দ্রকুমার ছিলেন ধীরস্থির।

নিখিল-ভারত খ্রীষ্টান সম্মেলনের কর্ণাধাররূপে তিনি দেশীয় খ্রীষ্টানমহলে সর্বত্র পরিচিত হইলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী এবং স্বাধীনতা-পন্থী। তিনি অধিকাংশেরই শ্রদ্ধাপ্রীতি অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন নির্লোভ, পদের মোহ তাঁহাকে কখনও তাঁহাকে পাইয়া বসে নাই। যখন গোলটেবিল-বৈঠকে দেশীয় খ্রীষ্টানদের প্রতিনিধি প্রেরণের প্রস্তাব হয়, তখন তিনি উদারনৈতিক খ্রীষ্টান নেতা সার্ মহারাজ সিং-য়ের অনুকূলে নিজের দাবী প্রত্যাহার করেন। এই কথাপ্রসঙ্গে হরেন্দ্রবাবু একদিন আমাকে বলেন, "যোগেশবাবু, আপনাদের এত খাতির করি কেন জানেন? তবে বলি শুনুন। একবার দক্ষিণে ত্রিবাঙ্কুরে গিয়েছি। ও অঞ্চলে দেশীয় খ্রীষ্টান বিস্তর। একটি সভায় আমাকে বক্তৃতা দিতে হবে। সভা লোকে লোকারণ্য। এর মধ্যে সভার প্রধান উদ্যোক্তা আমাকে এই বলে introduce করে দিলেন যে, সুবিখ্যাত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'মডার্ণ রিভিয়ু'র আমি নিয়মিত লেখক। আমার অন্য পরিচয় আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক একথা হ'ল গৌণ, আমি যে 'মডার্ণ রিভিয়ু'র নিয়মিত প্রবন্ধ লেখক এটিই তাঁদের নিকট আমার

সর্বপ্রধান পরিচয়। একজন বাঙালী সম্পাদক এবং একটি বাঙালী পত্রিকার এহেন আভিজাত্য দেখে আমার বুক আনন্দে দেড় হাত চওড়া হয়ে গেল যেন!"

'মডার্ণ রিভিয়ু'তে এই সময় মাদকদ্রব্য সম্বন্ধে পরিসংখ্যানমূলক কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন হরেন্দ্রবাবু। ইহার ভিতরে দেশ-বিদেশের মাদকদ্রব্য ব্যবহারের তুলনামূলক আলোচনা এবং আমাদের দেশে বিদেশী শাসনে ইহার ব্যবহার-প্রাচুর্য আর ইহার ফলে জাতীয় উন্নতির বাধা-বিঘ্নগুলির উল্লেখ করিতেও তিনি ছাড়েন নাই। তিনি মহাত্মা গান্ধীর মাদকদ্রব্য বর্জন আন্দোলনের পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, সাহিত্যের অধ্যাপক হইয়া এ বিষয়ে এত তথ্য সংগ্রহ করলেন কিরূপে। তিনি বলিলেন, "যোগেশবাবু, এই সব লিখে আমি কর্তব্য করছি বটে, সঙ্গে সঙ্গে পিতৃঋণও শোধ করছি।" এ কথা আমার বিস্ময়ের উদ্রেক করিলে, পিতৃঋণের বিষয় আরও খুলিয়া বলিলেন। তাঁহারা তিন পুরুষের খ্রীষ্টান, কিন্তু সুরাপানে তাঁহার পিতা কি পিতামহ আসক্ত ছিলেন না। তাঁহার দুই দাদা সুরাপানে আসক্তি হেতু অকালে মারা যান। হরেন্দ্রবাবুকে দিয়া তাঁহার পিতা প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন যে, তিনি কখনও মদ ছুঁইবেন না। এই প্রতিজ্ঞা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেছেন। সুরা তথা মাদক-দ্রব্যের ব্যবহারে যে কত জীবন নষ্ট হইতেছে, কত পরিবার ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে তাহার ঠিকঠিকানা নাই। এই প্রসঙ্গে আর এক দিনের কথাও বলিয়া লই। তখন হরেন্দ্রবাবু রাজ্যপাল। কলিকাতায় আগত একখানি যুদ্ধজাহাজে নিমন্ত্রিত হইয়া সস্ত্রীক গিয়াছেন। ভোজের আয়োজন হইয়াছে, গ্লাসে সুরা জলবৎ দেখাইতেছিল। সহধর্মিণী বঙ্গবালা জলভ্রমে গ্লাসে হাত দিয়াছেন। হরেন্দ্রকুমার দূরে ছিলেন। চেঁচাইয়া বলিলেন, "ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না।" তিনি বুঝিতে পারিয়া গ্লাস রাখিয়া দিলেন।

বঙ্গবালাও পতির অনুগামিনী ও সকল কাজে সহায় ছিলেন। ডিহি-শ্রীরামপুর ভবনে তাঁহার ঘরকন্না কিছু কিছু প্রত্যক্ষও করিয়াছি। হরেন্দ্র-বাবুর যেমন পোশাক-পরিচ্ছদ তেমনি খাওয়া-দাওয়া খুবই সাধারণ। একটি হাফহাতা কোর্তা গায়ে তিনি সারা কলিকাতা টহল দিয়াছেন, ইহাও কখন কখনও দেখিয়াছি। একদিন আমাকে বলিলেন, "যোগেশবাবু, চাকর-বাকর রাখতে পারি না। বুড়ীর কি খাটুনি! বাটনা বাটা, কুটনো কোটা, জল

তোলা, ঘর মোছা, রান্নাবাড়া সব তাঁকে নিজ হাতে করতে হয়। চাকরের কাজ পছন্দ হয় না। আর কি জানেন? অত টাকাই বা পাব কোথায়?" কথা শুনিয়া মনে মনে হাসিয়াছি বটে, কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার সহধর্মিণীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা চতুর্গুণ বাড়িয়াই গেল। এরূপ মিতাচারী না হইলে তিনি কি অত লক্ষ টাকা দান করিতে পারিতেন! হরেন্দ্রবাবু নিজে বাজার করিতেন। মধুপুরে হরেন্দ্রবাবুর একখানি বাড়ী ছিল। জনৈক বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, তিনি মধুপুরে সস্ত্রীক নিজে বাজার করিতেন। দেখিয়া শুনিয়া, দরদস্তুর করিয়া প্রায়শঃই সবকিছু কিনিতেন। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"— উপনিষদের এই বাণী তাঁহাতে যেন সুন্দর রূপ পাইয়াছিল।

হরেন্দ্রবাবু আমাকে প্রায়ই বলিতেন, "ধর্মে আমি খ্রীষ্টান কিন্তু তাই বলে জাতীয় শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ ছাড়ব কেন?" বাস্তবিক তাঁহার এই জাতীয়তা-প্রীতির বহু প্রমাণ পাইয়াছি। তিনি তখন রাজ্যপাল। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের নূতন ভবনের দ্বার-উন্মোচন উৎসব। হরেন্দ্রবাবু সভাপতি। বক্তৃতার প্রথমেই তিনি বলিলেন, কেহ যেন মনে না করেন বিধর্মী হরেন্দ্রকুমার বিজাতীয়ও বটে। তিনি বলেন, "আমি ত্রিবেণীর পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের দৌহিত্রের বংশধর। আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি, সংস্কৃত সাহিত্যের যথাযথ অনুশীলনে তৎপর না হলে জাতির দুর্গতির অন্ত থাকবে না।" হরেন্দ্রবাবু বাংলা লিখিতেন কিনা জানি না। তাঁহার যে কয়েকটি বাংলা রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, যত দূর জানি তাহা অন্য কর্তৃক তাঁহার ইংরেজী লেখা হইতে অনূদিত। তিনি আমাকে কয় বৎসরের মধ্যে যে সব পত্র লিখিয়াছিলেন, সবগুলিই ছিল ইংরেজিতে লিখিত। পোষ্টকার্ডের চিঠি; এত ছোট হরফে আষ্টেপৃষ্ঠে লিখিতেন যে, এক-একখানি চিঠি ছাপিলে এ বইয়ের দেড় পৃষ্ঠারও উপর হইবে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার দরদ বা মমতা ছিল অসাধারণ। সাহিত্যিকদের তিনি নানা ভাবে উৎসাহ দিতেন। আমার বই একখানি বাদে তখন সবই বাংলায় লেখা। তিনি সাগ্রহে পড়িতেন, পড়িতে আনন্দ পাইতেন। 'ক্যালকাটা রিভিয়্যু'তে আমার কয়েকখানি পুস্তকেরই সমালোচনা করিয়াছিলেন। একখানি বইয়ের সমালোচনা লিখিতে তাঁহার অনেক বিলম্ব হয়। আমার দিক হইতে কোন তাগিদ যায় নাই। বৎসর দুই পরে তাঁহার একখানি পোষ্টকার্ড পাইলাম। পূর্বের মত অনেক ছোট অক্ষর,

এপিঠ-ওপিঠ একেবারে ঠাসা লেখা। তিনি লেখেন, বড় বলিয়া "মুক্তির সন্ধানে ভারত" তিনি এতদিন ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু এবারে পড়িতে আরম্ভ করিয়া অতি দ্রুত শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন। পত্রে বইখানির বিস্তর প্রশংসাবাদ ছিল, আবার সঙ্গে সঙ্গে একথাও লিখিলেন যে, এত দিন দেরী করিয়া তিনি সত্যই অপরাধী হইয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। হরেন্দ্রকুমারের বিনয়ের অন্ত ছিল না; ইহা সত্য সত্যই ছিল আন্তরিক। আমি জবাবে কি লিখিয়াছিলাম মনে নাই। যথাসময়ে 'ক্যালকাটা রিভিয়ু'তে তৎকৃত সমালোচনা বাহির হইল। বাংলাভাষায় এরূপ বই তিনি প্রথম পড়িলেন বলিয়া সমালোচনায় উল্লেখ ছিল।

দেশ স্বাধীন হইবার পূর্বেই কনষ্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলী বা গণপরিষদ গঠিত হইয়াছিল। স্বাধীনতা লাভের পর উহার কাজ হইল দুইটি—আইন প্রণয়ন এবং সংবিধান রচনা। নূতন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত গণপরিষদের এই কাজ ছিল। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ গণপরিষদের সভাপতি, ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় সহকারী সভাপতি। সংবিধান রচনাকালে রাজেন্দ্রপ্রসাদ দীর্ঘকাল অসুস্থ ছিলেন, এই সময় ডক্টর হরেন্দ্রকুমার অতি দক্ষতার সহিত সভাপতির কার্য নিষ্পন্ন করেন। কলিকাতায় আসিলে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতাম। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "আমি পাক্কা আইনজ্ঞ হয়েছি। তবে কি জানেন, দু'পক্ষের ভাল উকীলের জেরা, সওয়াল জবাব শুনে রায় দেওয়া বেশ সোজা। আমি সস্তায় বাজিমাৎ করছি।" নূতন সংবিধান রচনাকার্য চলিতেছে; হরেন্দ্রকুমার দিল্লীতে। সংবিধান শেষ হইবার পূর্বেই বিভিন্ন প্রদেশে দেশী গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন। হরেন্দ্রকুমার বলিলেন, "একদিন রাজকুমারী অমৃত কাউর আমার বাসস্থানে এসেছেন; একথা-সেকথার পর একবার আমায় বললেন, আপনি একবার প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করুন না? এর ইঙ্গিত বুঝতে আমার সময় লাগল না। সরাসরি বললাম, কোন প্রয়োজন ত দেখি না। অমৃত কাউর চলে গেলেন।" ইহার পর তিনি আমাকে বলিলেন, "যোগেশবাবু, বল্লভভাইর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্য কি বুঝেছেন ত? কোন প্রদেশের গবর্ণরি যাতে পাই তার জন্য খোশামুদি। আমি ত এ পদের জন্য লালায়িত নই। আমাকে গণপরিষদের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট করেছেন, সেও কি সাধ করে: আমি একটি সামান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। সংখ্যালঘুদেরও কিরূপ কদর

করা হয় তা দেখাবার জন্য ; আবার আমি ন্যাশনালিষ্ট. আমার অতীত ও বর্তমান জানা। আমাকে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট করে নিরাপদে কর্তব্য সম্পাদন করায় ত লাভ অনেক।" হরেন্দ্রবাবু আমাকে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা প্রায় তাঁহার কথায়ই দিতে চেষ্টা করিলাম। হরেন্দ্রবাবু শুধু নিরীহ 'মাষ্টারমশাই' নন, তাঁহার যে গূঢ় রাজনৈতিক বুদ্ধিও আছে, তাহার পরিচয় এই দিন পাইলাম। অবশ্য নূতন সংবিধান চালু হইবার পর একটি অলিখিত নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কর্তাব্যক্তিরা তাঁহাকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালপদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহাও যে রাজনৈতিক কারণে তাহা পরেই বলিতেছি।

স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর বাংলার অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিল, বিভক্ত বাংলার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ভারতরাষ্ট্রের ভাগে পড়ে। পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ হইতে অগণিত জনসমষ্টি পশ্চিমবঙ্গে আসিতে লাগিল। বোঝার উপর শাকের আঁটির মত আসিল ১৯৫০ সনের দাঙ্গা-হাঙ্গামা। পূর্ববঙ্গ হইতে এবারে যে লোক আসিতে লাগিল, আগেকার সঙ্গে তাহার তুলনাই হয় না। উদ্বাস্তু-সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর হইয়া পড়িল। রাষ্ট্রের অধিকর্তাদের ভাবগতিকে অসন্তুষ্ট হইয়া ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভারতরাষ্ট্রের মন্ত্রিত্ব ছাড়িয়া দিলেন। বাঙালীর মনে ঘোর অসন্তোষ। স্বাধীন ভারতে বাংলার প্রথম গবর্ণর হইয়া আসেন শ্রীরাজাগোপাল আচারী। তাঁহার উপর বাঙালীর বিরাগ বহুদিনের। তিনিই প্রথম বাংলা ও পাঞ্জাব দ্বিখণ্ডিত করিয়া লীগ-তোষণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। শ্রীরাজাগোপাল আচারীর পর ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু গবর্ণরের মসনদে বসিলেন। তাঁহার উপরে বাঙালীর বিরাগের কোন হেতু ছিল না, কিন্তু বাঙালী চিত্তের ধূমায়িত অসন্তোষ ডঃ মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগে একটা বিদ্বিষ্ট ভাবের সৃষ্টি করিতেছিল। সুতরাং দিল্লীর কর্তারা বাংলার একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিকে গবর্ণর পদে নিয়োগের চেষ্টা দেখিতেছিলেন। সংবিধান রচনার কাজ তখন শেষ হইয়াছে। অবশেষে একজন বাঙালীকেই গবর্ণরপদে নিয়োগের ব্যবস্থা হইল। আর ইহার জন্য নির্দিষ্ট হইলেন ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়।

হরেন্দ্রকুমারের গবর্ণরপদে নিয়োগের সংবাদ পাইয়া একদিন তাঁহার ডিহি-শ্রীরামপুরস্থ বাড়ীতে গেলাম। ইহার পূর্বে একটি সভায় তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও যৎসামান্য কথা-বার্তা হইয়াছিল, কিন্তু এ বিষয়ে বিন্দুবিসর্গও জানিতাম না। গবর্ণর-নিয়োগে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া যখন এ সম্বন্ধে

জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন তিনি বলিলেন, দুই-তিন দিন পূর্বে তাঁহার মত লইবার জন্য দূত আসে, ইহার পূর্ব পর্যন্ত তিনি কিছুই জানিতেন না। ডাঃ রায়ের গৃহ হইতে রাত্রি আটটায় দূতের আসা, সময় দিবার জন্য অনুরোধপত্র লইয়া তাঁহার বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া, আবার ডাঃ রায়ের সনির্বন্ধ অনুরোধ-সহ হরেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার অনুকূল মত লওয়া ইত্যাদি ব্যাপার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঘটিয়া গেল। ইহার পরদিনই তাঁহার বাড়ীতে টেলিফোন লাইন বসান হইল ও তিনি নির্দিষ্ট দিনে গবর্ণরের কার্যভার বুঝিয়া লইলেন। ঐ দিন সাক্ষাৎকারের সময় তিনি আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, মোটামুটি তাহার মর্মকথাই এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। তিনি ইহার মধ্যেই বলিলেন, "যোগেশবাবু, আমার মত একজন স্কুল-মাষ্টারকে গবর্ণরি দেওয়া কি সহজে হয়েছে? বড়কর্তারা ফাঁপড়ে পড়েই রীতিবিরুদ্ধ হলেও বাঙালী আমাকে বাংলাদেশেই গবর্ণর নিযুক্ত করলেন।" বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি, ডক্টর হরেন্দ্রকুমার নিজস্ব মত কখনও পরিহার করেন নাই, আর ইহা ব্যক্ত করিতেও কোন দ্বিধা বোধ করিতেন না। বড়কর্তাদের কথায় তিনি সর্বদা 'ডিটো' বা সায় দিয়া চলিতেন না, তাহার প্রমাণ আছে।

গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে (তখন আর্ট কলেজ বা কলা মহাবিদ্যালয় নামকরণ সবেমাত্র হইয়াছে) এই স্কুল সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহে একদিন যাই। অধ্যক্ষ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মুখে শুনিলাম সেদিন গবর্ণর হরেন্দ্রবাবু আসিবেন এবং বার্ষিক আর্ট-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিবেন। আমি অনিমন্ত্রিত, কাজেই এ অনুষ্ঠানে যোগদান করা সমীচীন মনে করিলাম না; শিল্প-প্রদর্শনী দেখিব ভাবিয়া অন্যত্র শিল্পী-বন্ধুদের সঙ্গে আলাপনে রত রহিলাম। এক সময়ে দেখিলাম এক-একটি ঘরে হরেন্দ্রবাবু পত্নী বঙ্গবালাসহ ঢুকিতেছেন, আর ছবি দেখিয়া বাহির হইতেছেন। আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতেই খুব আনন্দিত হইলেন; একান্ত অপরিচিতের মধ্যে পরিচিত কাহাকেও পাইলে যেমন মনের ভাব হয়, তাঁহার যেন সেই ভাবই হইল। বলিলেন, "আমি এখন বাংলার লাটসাহেব, সব বিষয়েই ওস্তাদ হয়েছি।" রাজভবনে তাঁহাকে দেখিবার বাসনা প্রকাশ করিলে হরেন্দ্রবাবু পত্র লিখিতে বলিলেন। কারণ প্রাইভেট সেক্রেটারীকে বলিয়া রাখিবেন।

'রাজ্যপাল' কথাটি তখনও চালু হয় নাই। নির্দিষ্ট দিনে রাজভবনে উপস্থিত হইলাম। হরেন্দ্রবাবু আমায় এক ঘণ্টা সময় দিয়াছিলেন। ট্রাম

বন্ধ হেতু কয়েক মিনিট হারাইলাম। তথাপি পৌনে এক ঘণ্টার উপর নানা বিষয়ে কথা হইল। তখন বেথুন কলেজের শতবর্ষপূর্তি স্মারকগ্রন্থ সন্ত বাহির হইয়াছে। আমি নিজের হাতে একখানি তাঁহাকে উপহার দিলাম। তিনিও সানন্দে গ্রহণ করিলেন।

হরেন্দ্রবাবু ইহার কিছুদিন পূর্বে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। সেখানকার বাঙালী সমিতি এই সুযোগে তাঁহাকে একখানি অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। ডক্টর হরেন্দ্রকুমার বিভিন্ন প্রদেশের বাঙালীদের অপদস্থ হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। ইহাতে প্রবাসী বাঙালীদের দোষের কথাও তিনি বলিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণর হরেন্দ্রকুমার প্রকাশ্য জনসভায় এইরূপ একটি বক্তৃতা করিয়াছেন, ইহাতে দিল্লীর উচ্চ রাজনৈতিক মহলে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। হরেন্দ্রবাবু এ বিষয়টি পূর্বে জানিতেন না। জেনারাল কারিয়াপ্পা হরেন্দ্রকুমারের অতিথি হইয়া আসিলেন উহার কয়েক দিন পরে। তাঁহার প্রমুখাৎ হরেন্দ্রবাবু সব কথা শুনেন। এই কথা বলিতে বলিতে তিনি আমাকে বলিলেন, "যোগেশবাবু, আমি কারিয়াপ্পাকে কি বলেছি জানেন? উচ্চ মহল আমাকে চান না জানতে পেলেই চলে যাব। আমি দুটি ট্রাঙ্ক নিয়ে এই বিরাট ভবনে ঢুকেছি, আবার সেই ট্রাঙ্ক দুটি মাত্র নিয়েই এখান থেকে বিদায় নেব।" কি দৃঢ় বিশ্বাস! আরও অনেক কথা হইল। তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন, "লেখা-পড়ার চর্চা প্রায় ছেড়েই দিতে হয়েছে। রাজভবনে অনবরত দেশী-বিদেশী পদস্থ অতিথিরা আসছেন; তাঁদের সঙ্গে আহার করতে হয় অনেক সময়। আদর-আপ্যায়নে অনেক সময় কেটে যায়।" পরে বলিলেন, যত বাধাবিপত্তিই আসুক, মডার্ন রিভিয়ুর জন্য লিখিবেন। তাঁহার এই সংকল্প প্রায় শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়বার রাজ্যপাল (তখন 'গবর্ণর'-এর বদলে এই কথাটি চালু হইয়াছে) হইয়া হরেন্দ্রবাবু যেন একেবারে কর্ম-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। আধি-ব্যাধি বা বার্ধক্য কিছুতেই তাঁহাকে হটাইতে পারিল না। ইহার সূচনা কিন্তু পূর্বেই হইয়াছিল। দৃঢ়চেতা হরেন্দ্রকুমার যাহা ধরিতেন তাহাকেই সাফল্যমণ্ডিত করিতে প্রাণপণে প্রয়াস পাইতেন। তিনি দার্জিলিং-এ দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার্থে যে গৃহে দেশবন্ধু শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন, সেই গৃহটিকে প্রসূতি-সদনে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর হন এবং প্রচুর টাকা তুলিয়া শীঘ্রই এই

সংকল্প কার্যে পরিণত করেন। তিনি ভারত-সভার হীরক-জয়ন্তী উৎসবে সভাপতির অভিভাষণে টাকা তুলিবার টেকনিক বা কৌশলের আভাস দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার 'ট্রেড সিক্রেট' ফাঁস করিতে চান না—একথাও তখন বলেন।

বাংলাদেশে যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী। শহর ও শিল্পাঞ্চলের ত কথাই নাই, পল্লী-অঞ্চলেও ইহা ছড়াইয়া পড়িতেছে। যক্ষ্মারোগীর অসুখ সারিলেও দীর্ঘকাল তাহাকে সাবধানে থাকিতে হয়। কিন্তু সামান্য আয় গৃহস্থের পক্ষে এইরূপ সাবধানে রাখা কতটা সম্ভব? হরেন্দ্রকুমার তাঁহার কর্মক্ষেত্র বাছিয়া লইলেন। রোগমুক্ত যক্ষ্মারোগীদের নিমিত্ত একটি বিশ্রাম-আবাস নির্মাণের জন্য তিনি যত্নপর হইলেন। এখানে তাহারা স্বাস্থ্য ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গে হরেক রকমের হালকা কাজও করিতে পারিবে। শহর ও জনপদ হইতে দূরে বিস্তৃত জমির উপর মুক্ত আবহাওয়ায় এই আবাস নির্মিত হইবে, এইরূপ পরিকল্পনা তাঁহার ছিল। এই নিমিত্ত অর্থসংগ্রহের একটি সার্থক টেকনিক বা কৌশল তিনি অবলম্বন করেন। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যরক্ষা ক্লাব, সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠান বিবাহ-উৎসব প্রভৃতি নানা স্থান হইতে তাঁহার নিমন্ত্রণ আসিত। তিনি সঙ্গতি বুঝিয়া এক-একটি প্রতিষ্ঠানের উপর তাঁহার যোগদানের নিমিত্ত এক-একটি ফি ধার্য করিতেন। আমি একাধিক প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া এইরূপ ফি আদায় প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই উপায়ে তিনি বিস্তর অর্থ তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি যে উৎসব বা সভায়ই যাইতেন, যক্ষ্মারোগীদের দুঃখের কথা, তাহাদের দুঃখ দূরীকরণের উপায়ের কথা উত্থাপন করিতেন। তাঁহার সহৃদয় ভাষণে শ্রোতাদের হৃদয় গলিয়া যাইত। বার্ধক্যে স্বভাবতঃই দেহ জীর্ণ ও অপটু হইয়া যায়, হরেন্দ্রবাবু সাধারণতঃ স্বাস্থ্যবান হইলেও শেষ দিকে বাতরোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু যক্ষ্মারোগীদের বিশ্রাম-নিবাস স্থাপনকল্পে তাঁহার কর্মোদ্যম শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ছিল। তিনি কাজের মধ্যেই ডুবিয়া ছিলেন, কাজ করিতে করিতেই চলিয়া গেলেন। যক্ষ্মারোগীদের জন্য তাঁহার আকূতি আবালবৃদ্ধ সকলকে বিস্ময়াপন্ন করিয়া তুলিত। তাঁহাকে যথোপযুক্ত সাহায্য-দানেও তাহারা আগাইয়া আসিত।

হরেন্দ্রকুমার চার-পাঁচ বৎসর একাদিক্রমে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার মধ্যে একবার মাত্র রাজভবনে গিয়া তাঁহার সঙ্গে

দেখা করি। এই কয় বৎসরে, কি রাজভবনে কি অন্যত্র, কি শহরে কি পল্লীতে—এমন কতকগুলি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয়, যেখানে রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার হয় সভাপতি, না হয় মাননীয় অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। একটি বিবাহ-অনুষ্ঠানে গিয়াছি। হরেন্দ্রকুমারের সন্নিকটবর্তী হওয়ায় এক ভদ্রলোক তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিতেছিলেন, কিন্তু দুই-তিনটি কথায় তাঁহার সহিত আমার পূর্ব পরিচিতি প্রকাশ পাওয়ায় মনে হইল তিনি অবাক হইয়া গেলেন। আর একদিন কলিকাতার খানিকটা দূরে পল্লীর এক সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছি। সেখানেও সভাপতি ডক্টর হরেন্দ্রকুমার। তাঁহার ও তাঁহার সহধর্মিণীর সঙ্গে পূর্ব-পরিচয় হেতু সহজ আলাপনে রত হইলাম। শেষে বুঝিলাম, একারণ সভার প্রধানতম উদ্যোক্তা বেশ রুষ্ট হইয়াছেন। ডক্টর হরেন্দ্রকুমারের সঙ্গে আমার পূর্ব-পরিচিতি অনেকের বিস্ময় ও রোষের কারণ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, হরেন্দ্রকুমার ছিলেন দরিদ্রেরও বন্ধু, অনাথেরও সহায়, দুর্গত ব্যক্তিরা তাঁহার নিকট হইতে যেরূপ সহানুভূতি লাভ করিত, এরূপ ক্বচিৎ কাহারও নিকট হইতে পাওয়া যায়। তিনি নিজে যক্ষ্মারোগীদের বিশ্রাম-নিবাস নিমিত্ত টাকা তুলিতে ব্যস্ত। পল্লীর যে সভার কথা বলিলাম সেখানেও তিনি দুর্গত যক্ষ্মারোগীদের দুরবস্থার কথা বলিতে ভুলেন নাই। এই সময় তিনি স্থানীয় বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ে কিঞ্চিৎ অর্থদান করিলেন, যাহাতে দুঃস্থ বালক-বালিকাদের সাহায্যের জন্য একটি দরিদ্র-ভাণ্ডারের স্থাপনা হইতে পারে। এটি ছিল স্বাবলম্বী উদ্বাস্তু-উপনিবেশ। এই স্থানটির দ্রুত উন্নতির কথা জানিয়া তিনি বিশেষ সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন। পূর্বাঞ্চল হইতে আগত ছিন্নমূল মানব-গোষ্ঠীর দুঃখ দুর্দশা দেখিয়া কোমলপ্রাণ হরেন্দ্রকুমার অতিশয় বিচলিত হইয়াছিলেন। তাহাদের দুর্গতির অবসান কিরূপে হইতে পারে সে বিষয়েও তিনি ভাবিতেন, তাহাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা আমাকেও একবার বলিয়াছিলেন মনে পড়িতেছে। তিনি গবর্ণর হইয়া প্রথম দিকে তাহাদের দুঃখ-দুর্দশা মোচনে কতকটা অগ্রসরও হইয়াছিলেন।

হরেন্দ্রকুমার জীবনভোর যাহা আয় করিয়াছেন, দুই হাতে তাহা বিলাইয়া দিয়াছেন। ডিহি-শ্রীরামপুর অঞ্চলে তাঁহার পৈতৃক জমিজমা মন্দ ছিল না। ঐ অঞ্চল সম্প্রতি বিশেষ উন্নত হইয়াছে। এই অঞ্চলের উন্নয়ন-কার্যে তাঁহার

সহযোগিতা লক্ষণীয়। তিনি বহু জমি জমাবিলি করিয়া দিয়াছিলেন, কিছু কিছু বিক্রয়ও করিয়াছিলেন। এ দরুণ তাঁহার সামান্য অর্থাগম হয় নাই। এই অর্থ তিনি নিজের ভোগে লাগান নাই। তাঁহার দান ইহা দ্বারাও পুষ্ট হইয়াছে। রাজ্যপালের মাসিক বেতন সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা; তিনি নিজের জন্য পাঁচ শত টাকা মাত্র রাখিয়া অবশিষ্ট সর্বস্বই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ছাত্রদের বিবিধ বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা করিয়া দিবার নিমিত্ত দান করিয়া গিয়াছেন। গুজব রটিয়াছিল, দিল্লীর বড়কর্তারা নাকি ইহাতে অসন্তুষ্ট। কিন্তু তিনি বড়কর্তাদের ভ্রূকুটি সর্বদা উপেক্ষা করিয়াই চলিতেন। তাঁহাকে একবার উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল করিয়া পাঠাইবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। তিনি বাঙালী, ভারতবাসীও বটেন। কিন্তু জন্মভূমি বাংলা ও স্বজাতি বাঙালীকে বড় ভালবাসিতেন। যতদিন রাজ্যপাল থাকিবেন, বাঙালীরই সেবা করিয়া যাইবেন এই ছিল তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়। বাঙালীর দুর্গতির অন্ত নাই; দুর্গত বাঙালীর সেবাই ত সত্যিকার ভারত-সেবা। হরেন্দ্রকুমার, দুর্গতদের বন্ধু, অনাথের সহায়, ধুতি-চাদর-কোর্তা পরা বাঙালী হরেন্দ্রকুমার প্রতিটি মানুষের চিত্তে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। ত্যাগ-দৃপ্ত কর্মীপ্রধান হরেন্দ্রকুমারের স্নেহ-প্রীতি লাভ করিয়া আমাদেরও জীবন ধন্য হইয়াছে।

রামনাথ বিশ্বাস

ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসকে আজ স্মরণ করি। তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় কমপক্ষে পঁচিশ বৎসরের। শেষ বারো বৎসর উত্তর কলিকাতার এক বিরাট ভবনে বাসিন্দারূপে এক সঙ্গেই কাটাইয়াছিলাম। তখন অতি নিকট হইতেই তাঁহাকে দেখিবার বুঝিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। "Familiarity breeds contempt"—এই ইংরেজী কথাটির তিনি ছিলেন যেন মূর্তিমান্ প্রতিবাদ। অতিপরিচয় হেতু তাঁহার উপর তো মনে কখন বিরক্তির ভাব উদয় হয় নাই। রামনাথ ছিলেন অতি সাধারণ মানুষ, কিন্তু অতি মহৎ। তাঁহাকে বার বার নমস্কার করি।

প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বের কথা। সাইকেলে চড়া ভূপর্যটক রামনাথের ছবি বিবরণ সহ পত্রিকায় ছাপান হইয়াছিল। সে বিবরণ হয়ত তখন পড়িয়া থাকিব। 'দেশ' সাপ্তাহিকের সঙ্গে যুক্ত হইবার পরই তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ ঘটে। লেখার ভিতর দিয়া তাঁহার পর্যটনের পরিচয় ইতিমধ্যেই পাইতে ছিলাম। এবারে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিলাম। ঠিক আঁটসাট দোহারা চেহারা, দীর্ঘাকৃতি বলা চলে না, তবে খর্বাকারও নয়। খুব চটপটে, আপিসে আসিয়াছেন, কিন্তু স্থির হইয়া বসিতে পারিতেছেন না; কোন অজানা দেশের ডাক যেন তাঁহার কানে পৌছিয়া গেছে। ফিটফাট তিনি কখনও ছিলেন না, তবে অগোছালোও নন। প্রথম সাক্ষাতেই এই কৃতিময় বঙ্গ-সন্তান সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা হইয়া গেল।

ইহার পর বহু বৎসর তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই। কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ লেখার মাধ্যমে তাঁহার আশ্চর্য পর্যটন-কাহিনীর পরিচয় পাইতাম। যে অর্থে বর্তমান যুগে "লেখক" বলা হয় তাহা তিনি ছিলেন না। শেষ জীবনে অবশ্য রচনা কতকটা সহজ হইয়া আসিয়াছিল। আমি যখনকার কথা বলিতেছি তখন তিনি সবে লেখায় হাত দিয়াছেন। তাঁহার তখনকার রচনা পড়িয়া মনে হইত তিনি দেশ বিদেশের যে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন তাহা প্রকাশ পাইবার নিমিত্ত তাঁহার লেখনীমুখে হুড়মুড় করিয়া

আসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু রচনা পারিপাট্যের অভাব হেতু তাহা প্রকাশের পথ পাইতেছে না। যেটুকু লেখায় মূর্ত হইতেছে তাহাও যেন অস্পষ্ট ধোঁয়াটে হইয়া উঠিতেছে। ইহা যে লেখক ও পাঠক উভয়ের পক্ষে কত ক্লেশদায়ক, মূল পাণ্ডুলিপি যিনি পাঠ না করিয়াছেন তিনি উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। প্রবন্ধ নির্বাচন ও সংশোধনের ভার প্রথম হইতেই আমার উপর পড়ে। সুতরাং প্রতি সপ্তাহেই ভূপর্যটক রামনাথকে 'সাহিত্যিক' রূপেও দেখিবার সুবিধা হইতেছিল।

রামনাথ বিশ্বাস ভূপর্যটক ঠিকই, কিন্তু তাঁহার পক্ষে লেখনী ধারণ বাতুলতা মাত্র—এইরূপ একটি মত তখন কিরূপে সাহিত্যিক মহলে চালু হয়। এক সুপণ্ডিত ব্যক্তিকে তাঁহার রচনা সম্বন্ধে অতি তাচ্ছিল্যপূর্ণ উক্তি করিতে শুনিয়াছি। কিন্তু রামনাথ বিশ্বাস তথাকথিত লেখক বা সাহিত্যিক ছিলেন না; সাহাত্যিকের দায়িত্ব তিনি বহন করেন নাই। তিনি সাহিত্যিক নন। লেখাপড়া শেখেন নাই, বিদ্যা অতি সামান্য—এ ধরনের কথা তিনি বহুবার কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলিয়াছেন। কৃতী সাহিত্যিক বা লেখক না হইলে কি হয়, তিনি জীবন দ্বারা বাংলার তরুণ-সমাজের সম্মুখে যে আদর্শ ধরিয়া দিয়াছিলেন তাহার তুলনা মেলা ভার। আর এইখানেই তাঁহার কৃতিত্ব। স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্ব বিশ বৎসর বাংলার তরুণ-সমাজ দেশমাতাকে শৃঙ্খলমুক্ত করিবার জন্য প্রাণ পণ করিয়াছিল। স্বাধীনতার সত্যকার ইতিহাস কোনদিন রচিত হইলে এ বিষয়টি তাহাতে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটী ভীষণ দোষ বা ত্রুটিও আমাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, ইহা হইল আমাদের "ঘরকুণো" মনোবৃত্তি। সে যুগের বাঙালী এই মনোবৃত্তি ছাপাইয়া উঠিয়াই 'বড়' হইয়াছিল। গত পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এই দূষিত মনোবৃত্তি যেন আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। উত্তর-স্বাধীনতা যুগে ইহার কুফল আমরা মর্মে মর্মে পাইতেছি। কিন্তু রামনাথ বিশ্বাস ছিলেন এই মনোবৃত্তির একটি জীবন্ত প্রতিবাদ। সেই যুগে যখন আমরা রাজনৈতিক কারণে একান্ত ঘরমুখো হইয়া পড়িতেছিলাম, তখন তিনি আমাদের বাহিরের গীতিও শুনাইয়াছেন। 'মোহনের' দিগ্বিজয়ী অভিযান কাল্পনিক নিশ্চয়ই, কিন্তু রামনাথের ভূপর্যটন ছিল নিতান্তই বাস্তব। তাঁহার অস্পষ্ট লেখনী-মুখে এই বিষয়টিই তখন আমি বারবার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলাম।

রামনাথের সঙ্গে 'দেশ'-কর্তৃপক্ষ তাঁহার পর্যটন বৃত্তান্ত প্রকাশ সম্বন্ধে

নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রতিসপ্তাহে তাঁহার লেখা আসিত এবং আমাকে ঐসব সংশোধনান্তর প্রকাশযোগ্য করিয়া তুলিতে হইত। তখনই রামনাথ বহু দেশভ্রমণ করিয়াছেন, তিনি বেশীরভাগ সাইকেলে এবং কখনো কখনো পদব্রজে ভ্রমণ করিতেন। ভারতবর্ষের পর্যটন-কাহিনী আমরা ছাপি নাই। বিদেশ ভ্রমণের কথাই আমরা প্রকাশ করিতাম। দক্ষিণ আফ্রিকার কথা তখন আমরা ছাপিতে আরম্ভ করি। ঐ অঞ্চলে বন জঙ্গল, জীবজন্তু, লোকজন যেখানে যেমনটি দেখিয়াছেন তেমনটি, তেমনিভাবেই বিবৃত করিতেন। সংশোধনান্তর যখন প্রকাশিত হইত তখন তাহা শুধু পাঠযোগ্যই নয়, পাঠক-পাঠিকার নিরতিশয় হৃদয়গ্রাহ্যও হইত। মূল লিপি ও প্রকাশিত লেখার মধ্যে ভাষাগত মিল খুব কমই থাকিত। বিষয়বস্তুটির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া ভাষা সংশোধন করিতাম। সম্পাদনার ইহাই রীতি। একটি লেখার পাণ্ডুলিপি আসিল। তাহার মধ্যে এক স্থলে দেখি, তিনি লিখিয়াছেন, "আমি Suited booted হয়ে সেখানে গেলাম!" আফগানিস্থান ভ্রমণের কাহিনীগুলি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতে লাগিল; কোন কোন লেখার একেবারে "খোল নলিচা" পর্যন্ত বদল করিতে হইত। লেখার এক একটি পৃষ্ঠায় লাল কালি দিয়া সংশোধন করিতে করিতে মনে হইত, ইহা যেন বিচিত্রবর্ণ ছবির আকার ধারণ করিয়াছে। তুরস্ক ভ্রমণ, চীন ভ্রমণ—এসকলও ক্রমে ক্রমে ছাপা হইল। আমি যতদিন 'দেশ' সাপ্তাহিকের সহিত যুক্ত ছিলাম, সেই সময়ের মধ্যে রামনাথের বিস্তর লেখা প্রকাশিত হয়। এই সব লেখা লইয়া তিনি পরে, অনুমান হয়, ছয়সাতখানি বই বাহির করিয়াছিলেন।

রামনাথের সঙ্গে একই ভবনে বাস করিতে শুরু করি ইহার কয়েক বৎসর পরে। তখন দ্বিতীয় মহাসমর শেষ হয়। যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই রামনাথের ভূপর্যটন বন্ধ হয়। তিনি দশ বার বৎসর যাবৎ পশ্চিম ভূখণ্ডের বহু স্বাধীন, পরাধীন, অর্দ্ধস্বাধীন দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন। পূর্ব্ব ভূখণ্ড ব্রহ্মদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া মালয়, শ্যাম, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলীদ্বীপ, চীন, কোরিয়া এবং জাপানে সাইকেলে ও পদব্রজে পরিভ্রমণ করেন। আবার পশ্চিম এশিয়ার আফগানিস্থান, ইরান, ইরাক, এশিয়া-মাইনর, আরব পর্যন্ত যান। উত্তর ও দক্ষিণ আফ্রিকারও কয়েকটি রাজ্য পর্যটন করিয়াছিলেন। নবীন তুরস্ক তিনি বিশেষভাবে দেখিয়াছিলেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও

তিনি যান। তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়া ছাড়া প্রায় প্রত্যেকটি দেশ সম্বন্ধেই তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপের পল্লীর ও পল্লীবাসীদের সম্বন্ধে কত কথাই না তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। এই সব অঞ্চলের পরিচ্ছন্ন পরিবেশ তাঁহার মনের উপরে একটি দৃঢ় ছাপ রাখিয়া যায়। ঐ সকল স্থলের প্রতি পল্লীতেই 'ইন্' বা সরাইখানা রহিয়াছে। ভ্রমণের পর সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে এখানে আশ্রয় লইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া লইতেন।

এত দূর দূর দেশ রামনাথ ভ্রমণ করিয়াছেন, বলিতে গেলে সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায়। বহু প্রলোভন তাঁহার সম্মুখে আসিয়াছিল, তাহাতে টাকাও আসিত প্রচুর, কিন্তু সকলই তিনি অবজ্ঞা ভরে প্রত্যাখ্যান করিতেন। এ প্রকারের কত কাহিনী তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। সেই শেষ দিন—শেষ সাক্ষাৎকালের কথা এখনও যেন কানে বাজিতেছে; "যোগেশবাবু, একজন টুরিষ্টের প্রধান আদর্শ হওয়া উচিত—'non-Saving' 'অ-সঞ্চয়'। এই আদর্শ-বিচ্যুতি ঘটলে টুরিষ্টের—ধর্ম নষ্ট হবে।" কি প্রসঙ্গে তিনি আমাকে একথা বলিয়াছিলেন তাহা পরে বলিতেছি। বলিয়াছি আমরা একই ভবনে একাদিক্রমে বারো বৎসর ছিলাম। এই সময়ের মধ্যে তাঁহাকে নানা ভাবেই আমি দেখিতে সক্ষম হই। অনেক কথা, সবকিছু বলা সম্ভব নয়। কথাবার্তায় ও আলাপ-আলাপনে একটা সাদামাটা অথচ জোরালো ভাব ছিল তাঁহার। রামনাথ ছিলেন শ্রীহট্টের অধিবাসী, প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম বানিয়াচঙ্গ তাঁহার জন্মভূমি। গৌহাটী কটন কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টচার্য তাঁহার নিকট-জ্ঞাতি। বংশ-মর্যাদায় এবং শিক্ষা-দীক্ষায় তাঁহারা ঐ অঞ্চলের সেরা। রামনাথ কিন্তু বেশী লেখা-পড়া শিখিতে পারেন নাই। তিনি কৈশোরে অনুশীলন-সমিতি ভুক্ত হইয়াছিলেন। প্রথম মহাসমরে তিনি সামরিক বৃত্তি গ্রহণ করেন। যুদ্ধান্তে তিনি প্রায় দশবৎসর সিঙ্গাপুরে সামরিক দপ্তরে কেরাণির কার্য করিতে থাকেন। ১৯২৭-২৮ সালে কর্মত্যাগ করিয়া ভূপর্যটন আরম্ভ করেন। দ্বিতীয় মহাসমর শুরু হইলে ভূপর্যটন বন্ধ করিতে হয়। তদবধি তিনি একই ভবনে একই প্রকোষ্ঠে থাকিয়া প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে দেহত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন চিরকুমার। শেষ দিকে তিনি আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত হইয়া ছিলেন বটে. কিন্তু তাঁহার দরদী মন সকলকেই আত্মীয় করিয়া লইয়াছিল। এই তাঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

মানুষ—দোষেগুণে মানুষ। রামনাথের ভিতরেও দোষ গুণ ছিল নিশ্চয়। কিন্তু সত্যকথা বলিতে কি, আমি মানুষ রামনাথের মধ্যে দোষের চেয়ে গুণের ভাগই দেখিয়াছি বেশী। তাঁহার কথাবর্তার ভাষা মার্জিত ছিল না, গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট ছিল খুবই। আলাপ আলোচনা কালে তাক-মাফিক কথাও বলিতে পারিতেন না। এসকল যদি দোষের হয় বলুন। কিন্তু আসল মানুষটিতে খাদ ছিল না বলা চলে। আমরা কলিকাতার ভাড়াটিয়া অধিবাসী। বোমার যুগ অন্তে কলিকাতায় আবার লোক গিজ্‌গিজ করিতে লাগিল। বাড়ীর মালিকেরা নিরাপদ 'আশ্রয়' হইতে স্ব স্ব আবাসে ফিরিয়া আসিলেন। যে যেখানে লুকাইয়াছিল, সব আসিয়া রাজধানীতে ভিড় জমাইল। আমরা যাহারা বোমাকে অগ্রাহ্য করিয়া জীবিকার তাগিদে কলিকাতায় রহিয়া গিয়াছিলাম, তাহাদের অনেকে ভাড়া বাড়ীর অভাবে দিশাহারা হইয়া উঠিলেন। ১৯৪৪ এর শেষ হইতে কলিকাতায় ভিড় জমিতে থাকে। '৪৫এর গোড়ায় 'ন স্থানং তিলধারণং'। এই সময় বাড়ী বদল করিতে গিয়া যে কি যাতনা সহ্য করিয়াছি, আজও স্মরণ হইলে শিহরিয়া উঠি। তখন রামনাথ আমার সহায় হইলেন। ব্যাপারটি নিতান্ত ব্যক্তিগত হইলেও 'মানুষ' রামনাথকে বুঝিবার জন্য ইহার উল্লেখ করিতেছি।

ভাড়াবাড়ীর অভাবে সমগ্র উত্তর কলিকাতা তোলপাড় করিতেছি। একদিন আপার সার্কুলার রোড দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ রামনাথের কথা মনে হইল। যেখানে তিনি থাকিতেন, উত্তর কলিকাতায় সেটি একটি বিরাট বাড়ী। উত্তর কলিকাতায় বা বাঙালী মহলে অমন বড় বাড়ী ছিল কিনা সন্দেহ। সংখ্যাগুণিলে দেড় দু হাজার লোক ঐ বাড়ীতে থাকিতে পারে। 'প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম' এবং স্বাধীনতা লাভের পরে এই সংখ্যক বা ইহার বেশী লোক ঐখানে যাইয়া আশ্রয় লয়। এত লোকের ভিড় যেখানে, সেখানে যে ভালমন্দ দুই রকমেরই মানুষ থাকিবে বলাই বাহুল্য। বাড়ীর নীচে বাজার, দ্বিতলে দক্ষিণ দিকের সাড়ির এক প্রকোষ্ঠে রামনাথ থাকেন। রামনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, কিন্তু তাহা ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে গিয়া উঠিয়াছিল বলা যায় না। তাঁহাকে আনন্দবাজার অফিসে দেখিয়াছি মনে হয় মাত্র একবার। পরে হয়ত কোথাও দেখিয়া থাকিব। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তিনি ভ্রমণ-কাহিনী সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পরিষদের

ডাঃ সরসীলাল সরকার এই দিন সভাপতিত্ব করেন। আমরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ রামনাথের বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম। রামনাথ এই বাড়ীতে থাকিতেন জানিতাম, কিন্তু পূর্বে এখানে কখনও যাই নাই। জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া রামনাথের ঘরে ঢুকিতেই তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। যেন কতকালের পরিচয়। কত ঘনিষ্ঠতা। আমার বিপদের কথা শুনিয়া রামনাথ লাফাইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সমাধানের একটি উপায় বাৎলাইয়া দিলেন। তিনি ঐ ভবনের টেনাণ্টস্ এসোসিয়েশানের সভাপতি, কাজেই বাড়ীওয়ালা—(স্বোপার্জিত অর্থে তখন বিরাট ধনী) তাঁহার কথা হয়ত শুনিবেন না। অথচ ঐ বাড়ীতে ভাড়া মিলিতে পারে। বাড়ীওয়ালা কথা শুনিতে পারেন এমন একজন লোকের নাম প্রস্তাব করিলে রামনাথ তৎক্ষণাৎ তাঁহার সুপরিচিত পাৎলুন পরিধান পূর্ব্বক আমাকে লইয়া তাঁহার বাসাবাটীতে গেলেন। আমাদের প্রস্তাব শুনিয়া ঐ ভদ্রলোক তো অবাক। 'আমি কেমন করিয়া ঐ বাড়ীতে থাকিব'—এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করায় রামনাথ অমনি বলিলেন, "আপনি বাড়ীর মালিককে বলুন, যোগেশবাবুর কোন অসুবিধা হবে না, আমি তাঁর পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাজ করব।" রামনাথের নিকট হইতে এইরূপ আশ্বাস পাইয়া তিনি আমার জন্য চেষ্টা করিবেন বলিলেন। আমি অন্য সূত্র ধরিয়া এখানে 'ঘর' যোগাড় করিলাম, কিন্তু রামনাথের ঐরূপ সাহায্যে ও স্বাভাবিক প্রযত্নে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ঐ খানে যাওয়া অবধি রামনাথ আমার 'পরম আত্মীয়' হইয়া উঠিলেন। সেই শাশ্বত চাণক্য শ্লোকের মর্ম তাঁহার সংস্রবে আসিয়া বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিলাম। 'উৎসবে—ব্যসনে—শ্মশানে…' সর্বত্র রামনাথ। দীর্ঘ বারো বৎসরের মধ্যে ইঁহার কত পরিচয়ই না পাইয়াছি।

কলিকাতায় স্থিতিবান্ হইয়া রামনাথের প্রধান কাজ হইল—সাময়িক পত্রে বিশেষতঃ 'দেশ' সাপ্তাহিকে মুদ্রিত লেখাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ,—অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নূতন পুস্তক রচনা ও তৎসমূহ প্রকাশের ব্যবস্থা। বিভিন্ন প্রকাশক তাঁহার কতকগুলি বই প্রকাশ করিতেছিলেন। ইহাদের মধ্যে 'মরণজয়ী-চীন'-এর বেশ কাটতি হয়। রামনাথ নিজে কতকগুলি বই পর পর প্রকাশের উদ্যোগ করিলেন। পুস্তক রচনা ও প্রকাশনই হইল অতঃপর তাঁহার একমাত্র জীবিকা। প্রথম প্রথম ইহা দ্বারা জীবিকার্জনে তাঁহাকে বেগ পাইতে হয় নাই। তাঁহার গোপন দান বা

সাহায্যও ছিল কিছু কিছু। এই আয় হইতে ইহারও ব্যবস্থা করিতে হইত। প্রথম দিকে তাঁহার জীবিকার ভাবনা ভাবিতে হয় নাই। কিন্তু ক্রমে এমন কতকগুলি বিপর্যয় আসিল যাহাতে সমাজের উপরে প্রতিক্রিয়া হইল ভীষণ। দ্বিতীয় মহাসমরের পর মর‍্যাল value বা নৈতিক মানও অতি দ্রুত বদলাইয়া গেল। ১৯৪৬ সনের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, ৪৭ সনের স্বাধীনতা লাভ, পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে অগণিত ছিন্নমূল নরনারীর ভারত রাষ্ট্রে আগমন, পাকিস্তানের সঙ্গে অর্থ নৈতিক কাজকারবারের রদবদল— এই সকল কারণে সমাজ-জীবনের উপরে বড় রকমের আঘাত পড়িল। আমরা যাহারা এতদস্থানে বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত ছিলাম, অথচ দেশের সঙ্গে যাহাদের যোগ ছিল তাহারা বিপদগ্রস্ত হইল অত্যধিক, ভুক্তভোগী মাত্রেই একথা স্বীকার করিবেন। আয়ের পথ সঙ্কুচিত হইল, কিন্তু ব্যয়ের অঙ্ক বাড়িয়া গেল অভাবনীয় রূপে। অর্থনৈতিক তথা সামাজিক বিপর্যয় দেখা দিল ব্যাপক ভাবে। রামনাথের উপরেও ইহার সংঘাত পড়িয়াছিল খুবই। তাঁহার লেখনী কখনও থামে নাই; কিন্তু দুশ্চিন্তা, অত্যধিক পরিশ্রম, এবং আয়ের সঙ্কোচনে তাঁহার শরীর অতি দ্রুত ভাঙিয়া যায়। শেষ দিকে সরকার হইতে কিছু মাসিক বরাদ্দ হয় বটে, কিন্তু তৎকালীন প্রয়োজনের তুলনায় তাহা ছিল নিতান্তই অপ্রচুর।

এই ক'বৎসর রামনাথের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছি। দেখিতাম সাধারণ দুর্গত মানুষের জন্য তাঁহার প্রাণ কিরূপ কাঁদিত। একদিন ভোর-বেলা উঠিয়া বাড়ীর নীচে গিয়াছি। বিস্তৃত গাড়ী বারান্দা, বিস্তর লোক আর ভিখারী সেখানে রাত্রিতে শুইয়া থাকিত। দেখিলাম রামনাথ একঠোঙ্গা খাবার একটি ভিখারিণীকে দিতেছেন। আমি অবাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম। তিনি বলিলেন, "আহা বেচারি, সারা রাত্রিতে কিছু পেটে পড়েনি ও এখন খেয়ে কিছুটা সোয়াস্তি পাক।" বুঝিলাম রামনাথ মুখে যা বলেন কাজেও তাহা করিতে চেষ্টা পান। সাধারণ মানুষের অভাব, দুঃখ, দুর্গতি তাঁহাকে সাম্যবাদের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি সোভিয়েট রাশিয়ায় যান নাই আগে বলিয়াছি। কিন্তু ইহার আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্গতিই তাঁহাকে এদিকে টানিয়া আনিয়াছিল। কিন্তু এ নিমিত্ত তিনি যে সাম্যবাদী দেশ সমূহের বা এদেশের সাম্যবাদী দল ও কর্ম প্রণালীর অন্ধ সমর্থক ছিলেন তাহা নহে, তিনি ইহাদের

সমালোচনা বা নিন্দাবাদ করিতেও কসুর করিতেন না। অবশ্য ব্যক্তিগত আলাপের সময়ই এসব আলোচনা হইত। তাঁহার সকল কথায় হয়ত সায় দিতে পারিতাম না, কিন্তু তাঁহার নিজস্ব যুক্তি প্রণিধানযোগ্য ছিল।

রামনাথ শিশু ও কিশোরদের বড় স্নেহ করিতেন। তিনি ছিলেন শিশু-মহলের 'দাদু'। বাহির হইতে যাহারা ওবাড়ীতে আসিত তাহারাও তাঁহাকে 'দাদু' বলিয়া সম্বোধন করিত। তিনি যেমন ছেলেদের ভালবাসিতেন, ছেলেরাও তেমনি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। তাহার তীব্র ভৎর্সনায় কখন কখন হয়ত কোন ছেলে উত্তেজিত হইত বা মনে ক্লেশ পাইত, কিন্তু যখন তাঁহার ভৎর্সনার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিত তখনই অনুতপ্ত চিত্তে তাঁহার নিকটে আসিয়া স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিত। দেশ বিদেশের শিশুদের কথা বলিতে রামনাথ বড়ই আনন্দ পাইতেন। আরব, তুরস্ক, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, নানা দেশের শিশুদের কথাই তাঁহার মুখে শুনিতাম। তাহাদের নিয়ম সংযম এবং গুরুজনদের প্রতি আনুগত্য; আবার স্বাধীন চলা ফেরা প্রভৃতির কথা কতই না তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। শিশু কিশোরদের কথা ভাবিয়া তিনি অতি সরল ভাষায় তাঁহার বক্তব্য বর্ণনা করিতে যত্নবান ছিলেন। কিশোর-মহলে তাঁহার প্রভাব পর্যটনমূলক বই এর ভিতর দিয়া ব্যাপ্ত হয়। এবং হয়ত ইহার মাধ্যমেই কতকটা স্থায়িত্বও লাভ করিবে। শুধু শিশু ও কিশোর কেন, তাঁহার প্রীতিপূর্ণ উদারপ্রাণ যুবক ও বয়স্কব্যক্তিদেরও তাঁহার নিকট আকৃষ্ট করিত। মানুষ রামনাথকে যতই দেখিয়াছি ততই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতিতে মন ভরিয়া উঠিয়াছে।

এখন রামনাথের সাহিত্যচর্চা সম্বন্ধে কিছু বলি। তিনি খবরের কাগজ রীতিমত পড়িতেন, বই পুঁথিও যে না পড়িতেন এমন নয়। বাংলা ভাষা ও রচনা শিক্ষার উপায় সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাঁহাকে বাংলা ক্লাসিক্‌স্, যেমন বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি পড়িতে বলিয়াছিলাম। রামনাথ এসকল পড়িয়াছিলেন কিনা জানি না। তবে অবিরাম লেখনী চালনা হেতু তাঁহার রচনা অনেকটা সহজ ও সরল হইয়া আসিতেছিল। তাঁহার পুস্তকগুলি জনপ্রিয় হইবার ইহা একটি কারণ। বাংলা ভাষার যুক্তাক্ষর 'ন' 'ই' 'উ'-কার প্রভৃতি সহজ ও একপ্রকার করা সম্পর্কে বহু সময় আলোচনা করিতেন। "যাজ্ঞা" কে "যাচনা" লিখিলে ক্ষতি কি? এরূপ কথাও বলিতেন। কোন কোন বইয়ে পরীক্ষামূলক ভাবে শব্দের বানান

এইরূপ করিয়াছেন, মনে হইতেছে। তাঁহার শেষ দিকের বইগুলি যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা ইহার সাক্ষ্য দিতে পারেন। সব সময়, তাঁহার কথায় সায় দিতে না পারিলেও, বুঝিতাম ভাষাকে সহজ সরল করিবার দিকে তাঁহার বেশ ঝোঁক রহিয়াছে। আমার চক্ষু পীড়ার কথা উঠিলেই রামনাথ বলিতেন "যোগেশবাবু, আমার লেখা correct করতে করতেই আপনার চোখ গিয়েছে। তখন কি আমি লিখতে পারতাম, না ভাষার উপরে কোন দখল জন্মেছিল। যেখানে যেমনটি দেখতাম. কালির আঁচড়ে কোন রকমে লিখে পাঠাতাম।" ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমার পরিশ্রমের কথা রামনাথ 'দেশ'-কর্ত্তৃপক্ষ স্থানীয় কাহারও মুখে নিশ্চয়ই শুনিয়াছিলেন। এ কথাটি তাঁহার বরাবর মনে ছিল। তিনি 'প্রশান্ত মহাসাগরে অশান্তি' পুস্তকখানি আমার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

রামনাথ শেষ দিকে কয়েক বৎসরই রক্তের চাপে ভুগিতেছিলেন। অসুস্থ অবস্থায়ই নিজের বই ব্যাগে করিয়া পুস্তক বিক্রেতাদের দোকানে জমা দিয়া আসিতেন, পূর্ব্বের জমা দেওয়া যে যে বই বিক্রয় হইত কমিশন বাদে তাহা লইয়া বাড়ী ফিরিতেন। তাঁহার অসুখ বাড়িয়া গেল। মাঝে মাঝে তাঁহার নিকট গিয়া কিছুক্ষণ বসিতাম। মধ্যে কিছু দিন ঘন ঘন যাইতে পারি নাই। কোজাগরী পূর্ণিমা রাত্রির প্রথম দিকে তাঁহার ঘরে গেলাম। রামনাথ শুইয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন, অতি তৎপরতার সহিত একখানি বই আমার হাতে দিয়া বসিলেন।

রামনাথ এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ সাইকেলে ও পদব্রজে পরিভ্রমণ করেন। এ কারণ তাঁহার "ভূপর্যটক" উপাধি সার্থক হইয়াছিল। তিনি এতগুলি দেশ পর্যটন করিয়াছেন নিতান্তই সম্বলহীন অবস্থায়। বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করিতে কতলোকের নিকট হইতে তিনি অর্থ সাহায্য পাইয়াছিলেন। বহুক্ষেত্রে তাঁহার সহিত আলাপ-আলাপনে তাঁহার ভ্রমণের কথা শুনিয়া লোকে মুগ্ধ হইতেন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, এত দেশ ভ্রমণেও তাঁহার অর্থকষ্ট তেমন হয় নাই। যদি বা কখন হইয়াছে কোন এক অভাবিত উপায়ে তাহা বিদূরিত হইত। একমাত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে তাঁহাকে বিফল মনোরথ হইতে হয়। তিনি বলিয়াছেন "মার্কিণ মুল্লুকে পা দিতেই আমাকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। একমাস আমি জেলে ছিলাম। ওখানে নিয়ম উপযুক্ত পরিমাণ টাকা জমা দিয়ে তবে সেখানে বিচরণ করার

বা থাক্‌বার অধিকার পাওয়া যায়। আমি জেলের যে প্রকোষ্ঠে ছিলাম সেই প্রকোষ্ঠের দেওয়ালে দেখলাম বড় বড় গুণ অঙ্ক কষা বাংলায়। কার এই কাজ? জানতে বড় কৌতূহল হলো। পরে শুনতে পাই বিখ্যাত অঙ্কবিদ সোমেশ বসু অর্থাভাবে একবার এই জেলের অধিবাসী হন। আমি বেশ যোগ্যস্থানেই ছিলাম।"

শেষ সাক্ষাতের দিনটির কথা বলিয়াই এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। ইহার আভাস আগেই একটু দিয়াছি। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, যখন ঘরে ঢুকিলাম তখন রামনাথ শুইয়াছিলেন আমাকে দেখিয়াই লাফাইয়া উঠিলেন। তিনি একখানি বই আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "যোগেশ বাবু, আমার জীবন ধন্য, বসুমতী সাহিত্য-মন্দির আমার কয়েকখানি বই নিয়ে এই 'রামনাথ গ্রন্থাবলী' প্রকাশ করেছেন। কত বিখ্যাত বিখ্যাত সাহিত্যিকের বই তাঁরা বার করেন। এ শ্রেণীতে তাঁরা আমাকে ফেলেছেন, আমি সাহিত্যিক নই, আমার জীবনে আর কি কাম্য থাক্‌তে পারে। পুস্তক প্রকাশন সম্পর্কে দু-চারটি বৈষয়িক কথার পর রামনাথ বলিতে লাগিলেন, "আমি কত দেশ ভ্রমণ করেছি, সব দেশের কথাই কিছু কিছু লিখেছি। এক গ্রেট-ব্রিটেন ছাড়া। বিলাত-ভ্রমণ লিখে আমার এই কাহিনী শেষ করবো। আমি মরবার পূর্ব্বে এ বিষয়টি লিখতে না পারলে আমার কথা অপূর্ণ থেকে যাবে। মরবার আগে যেন আমি এটি লিখে যেতে পারি।" ইহার পর তিনি বিলাত ভ্রমণ কিরূপে সাঙ্গ করিয়াছিলেন সাগ্রহে তাহা বলিতে থাকেন। তিনি বলিলেন, আমি যখন লণ্ডনে পৌছি তখন আমার কয়েকটি পেনি মাত্র সম্বল। ইষ্ট এণ্ডে গিয়ে একখানা কাম্‌রা ভাড়া করলাম। দু'দিন খাইনি, ক্ষিধেয় পেট চিঁচি করছে, রাস্তায় বার হলাম। এক মুদির দোকানে গেলাম, ছোট্ট দোকান কিন্তু আন-কোরা বিলাতী। দোকানীকে দেখে মনে হ'ল বাঙালী। আলাপে বুঝলাম, তিনি সিলেটি মুসলমান। আমার চেহারা দেখে ও কথা শুনে বুঝে নিয়েছিলেন, আমি অভুক্ত। আমাকে কিছু চাল, ডাল, তেল, নুন ধারে দিলেন। বলে দিলেন রান্না নিজের মতই করবেন। কিন্তু সম্বর দিবেন না। সম্বরের ঝাঁঝ এরা সইতে পারে না। তখন খুব বরফ পড়ছে। জুতো একেবারে ভিজে গেছে। দোকানী আমার পায়ে ভিজে জুতো দেখে বল্‌লেন, এজুতো এ সময় পড়বেন না; জুতো ছাড়ুন, নইলে নিউমোনিয়া হবে। আমি যে ভূপর্যটক এ পরিচয় তাঁকে দিয়েছি। আমার অবস্থার কথা জেনে একটু সময় নিয়ে বললেন,

পরদিন যেন ঐসময় তাঁর সঙ্গে দেখা করি। ফিরে এসে চাল-ডাল সিদ্ধ করে পেট পুরে খেলাম। এত পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন ছিলাম যে, সেই যে সন্ধ্যায় খেয়ে শুয়েছি, উঠেছি পরদিন বেলা আটটায়!"

রামনাথ আবার বলিতে লাগিলেন "নির্দিষ্ট সময়ে দোকানীর কাছে গেলাম। বলা বাহুল্য আজও চাল-ডাল আমায় দিয়েছিল। দোকানী পাশের এক জুতোর দোকানে আমাকে নিয়ে গেল। এই দোকানের ম্যানেজারের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে আমায় তাঁর নিকট নিয়ে যায়। আমাকে জুতো ও মোজা পছন্দমত নিতে বল্‌ল। দামের কোন বালাই নেই, আর মূল্য দিবই বা কি করে। ফিরবার সময় ম্যানেজার বলে দিলেন, আমি যেন পরদিন তার সাথে দেখা করি। জুতার দোকানে নির্দিষ্ট সময়ে যাওয়া মাত্রই ম্যানেজার আমাকে পাশের একটি রেস্তোরাঁয় নিয়ে গেলন। রেঁস্তো-রাঁর মালিকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে নিজ দোকানে চলে গেলেন। বুঝলাম রেস্তোরাঁর মালিকের সঙ্গে আগেই তাঁর কথা হয়েছিল, আমার সম্পর্কে। মালিক উপস্থিত মত আমার ভূপর্যটন সম্বন্ধে তার গ্রাহকদের নিকট কিছু বলতে বললেন। আমি তো আমার সিলেটি ভঙ্গি ও ভাঙ্গা ইংরেজীতে পর্যটনের কথা বলে চলেছি। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনছে, রেস্তোরাঁয় ভিড় জমে গেছে; আমি সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি। মালিক এসে কানে কানে বলে গেলেন Please stop. You have talked more than an hour, I will not pay you more than five pounds—এখন থামো, একঘণ্টার উপর বলেছ। আমি তো তোমাকে পাঁচ পাউণ্ডের বেশী আর দেব না। দক্ষিণা স্বরূপ পাঁচ পাউণ্ড পেলাম। জুতোর দোকানী, মুদি দোকানী নিজ নিজ পাওনা নিয়ে গেল, ঘরভাড়াও কিছু দিলাম, আমার হাতে রইল পুঁজি দু'পাউণ্ড। রেস্তোরাঁর মালিক আর একটি রেস্তোরাঁর মালিকের নিকট আমার পরিচয়-পত্র দিলেন। এইরূপে দিনের পর দিন বক্তৃতা দিতে দিতে চলেছি। আমার কোনই আর অভাব রইল না। এই ভাবে সমগ্র ব্রিটেন ও স্কটল্যাণ্ড ঘুরেছি। আয়র্ল্যাণ্ডে যাবার সময় আর হল না। ইতিমধ্যে যুদ্ধ (মহাসমর) বাধল। শরীরও খারাপ হয়ে পড়ল। দেখলাম ভাড়া ও যাতায়াতের খরচাদি কুলবার মত আমার হাতে প্যাসেজ-মানি রয়েছে। তখন আমি জাহাজে চড়ে স্বদেশে রওনা হলাম। আমার যা টাকা ছিল,

বোম্বাই পৌঁছান পর্যন্ত তাতেই কুলিয়ে গিয়েছিল। আবার আমি যে-কে সেই—নিঃসম্বল ভূপর্যটক।"

রামনাথ অত্যন্ত উল্লাস ভরে এই কথাগুলি আমাকে বলিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি যে অমূল্য কথাগুলি আমাকে বলিলেন তাহার উল্লেখ আগেই করিয়াছি। 'Non Saving' বা সঞ্চয়ের অপ্রবৃত্তি প্রত্যেক ভূপর্যটকের ধর্ম হওয়া উচিত তবেই তাঁহার উচ্চাশা সফল হইবে। আপনি যে সব অদ্ভুত অদ্ভুত অভিজ্ঞতা অর্জন করিবেন তাহা বর্ণনা করিয়া প্রচুর অর্থ রোজগার করিতে পারেন। কিন্তু একবার যদি সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি জাগিল তখনই তাহার মৃত্যু। কেননা ভূপর্যটকের স্বাভাবিকী মনোবৃত্তির পদে পদে অপহ্নব ঘটিবে।' রামনাথের এই শেষ উক্তিটি প্রত্যেকেরই প্রণিধানযোগ্য। এই সাদাসিধা বেপরোয়া হৃদয়বান মানুষটির কথা আমি আর কতটুকু বলিতে পারি।

স্মৃতির মণিকোঠায়

চণ্ডীচরণ বিশ্বাস

চণ্ডীচরণ বিশ্বাস বালক-বৃদ্ধ সকলের নিকট 'চণ্ডী বিশ্বাস' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি আমাদের মনের অনেকখানি জুড়িয়া ছিলেন। তাঁহাকে বৃদ্ধ বয়সে দেখিয়াছি। যখন তিনি মারা যান—আমি বোধ হয় তখন কলেজে পড়ি। কিন্তু ছেলেবেলায় তাঁহার সেবাপরায়ণতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। পক্ককেশ বেঁটে মানুষটি, একটি লাঠি তাঁহার সম্বল। তিনি ছিলেন বিপত্নীক। দুষ্টলোকে বলিত তাঁহার পত্নীর অপঘাত মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু চণ্ডী বিশ্বাস এতই আমাদের আপনার-জন ছিলেন যে এ কথায় কেহ কান দিত না, আমাদের মনেও ইহা জানিবার জন্য কোন কৌতূহলের উদ্রেক হয় নাই।

দশ বার বৎসর পূর্বে তাঁহার সম্বন্ধে এক সাহিত্যিক বন্ধুকে বলি, আরও অনুরোধ করি গ্রামীন পরিবেশে তাঁহার মতো এক সেবাব্রতী ব্যক্তিকে নায়ক করিয়া যেন একটি গল্প লেখেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তেমন রসোত্তীর্ণ হয় নাই। সেণ্ট পলের একটি উক্তির কথা একাধিক স্থলে উল্লেখ করিয়াছি, এখানেও করি। খ্রীষ্ট ভক্ত নিপীড়িত সাধুসন্তদের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন "Ye are the salt of the earth" অর্থাৎ তোমরা পৃথিবীর লবণ। লবণ না দিলে যেমন তরকারী স্বাদু হয় না, সাধু-সন্তরা মানব-সমাজে বিচরণ না করিলে সমাজ বাসের অযোগ্য হইয়া উঠে। কথাটি যে কত সত্য, বলিয়া কি বুঝাইব। প্রতিটি পল্লীতে সেবাব্রতী কর্মতৎপর এক বা একাধিক ব্যক্তি প্রায়ই দৃষ্ট হয়। চাণক্য শ্লোকাংশটির যেন মূর্ত প্রতীক তাঁহারা। সমাজে যদি সমুদয় লোকই বিষয়ী, বুদ্ধিমান ও হিসাবী হইতেন তাহা হইলে সমাজ কি বিসদৃশ আকারই না ধারণ করিত! বিষয়বুদ্ধি-বিবর্জিত বেপরোয়া লোকেরও প্রয়োজন। নির্বোধ না থাকিলে বুদ্ধিমানের কদর হইবে কিরূপে। পরহিতব্রতী চণ্ডীচরণ দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক ছিলেন। তবে তিনি প্রচলিত অর্থে যাহাকে আমরা 'নির্বোধ' বলি তেমনটি ছিলেন না।

আমাদের গ্রামে মঙ্গল ব্রহ্ম নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাকে আমরা

দেখি নাই। তবে তাঁহার কথা বয়স্কদের প্রমুখাৎ শুনিতাম। তিনি আমার পিতামহের প্রিয় সহচর বা সহকর্মী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য —তিনি ছিলেন পরহিতব্রতী সেবাপরায়ণ। বিষয়ী লোকের মত তিনি নিজেকে লইয়া বিব্রত থাকিতেন না। আমাদের গ্রামে বাংলা ছাত্রবৃত্তি স্কুল ছিল, তাঁহার তাড়নায় কোন ছেলে স্কুল পালাইতে পারিত না। তখন ছেলেদের বেতন সামান্য ছিল। কিন্তু এই সামান্য বেতনও অনেকে দিতে চাহিত না। মঙ্গল ব্রহ্ম মহাশয় এই বেতন যেন তেন প্রকারেণ আদায় করিয়া দিতেন। তিনি কোন পদাধিকারী ছিলেন না, কিন্তু নিজ হইতেই তিনি ইহা করিতেন। সে কালে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাস ও ফেল করা ছাত্র [অবশ্য তখন বয়স্ক] আমি দেখিয়াছি। তাঁহাদের সাহিত্যজ্ঞান বেশ জন্মিয়াছিল। তখন তো অতশত বুঝিতাম না এখন ভাবিয়া বিস্মিত হই। আমার এক আত্মীয়ের বাড়ী হইতে 'মেঘনাদবধ-কাব্য' ও হেমচন্দ্রের কোন কোন পুস্তক পাই। হিতবাদী সংস্করণ রবীন্দ্রগ্রন্থাবলীও উদ্ধার করি। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় মেঘনাদ বধ কাব্যের উপরে প্রশ্ন থাকিত। ছেলেদের এখানি ভাল করিয়া পড়িতে হইত।

এখন আসল কথায় আসি। চণ্ডীচরণ সাক্ষর কি নিরক্ষর ছিলেন জানি না। তবে যে সব ছেলে মন দিয়া লেখা পড়া করিত তাহাদের তিনি বড় ভালবাসিতেন। আমরা গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুল দেখি নাই, তখন ইহা উঠিয়া গিয়াছিল। পাড়ায় পাড়ায় পাঠশালা কয়েকটি মাত্র ছিল। যেরূপ শুনিয়াছি, মঙ্গল ব্রহ্ম ছিলেন একধরনের কিন্তু চণ্ডীচরণ ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে দুইয়েরই সামঞ্জস্য—উভয়েই ছিলেন সেবাব্রতী। চণ্ডীচরণের খাওয়া-পরার ভাবনা নাই। এক 'মিতা' ছিলেন তাঁহার। তাঁহার নামে নাম। 'মিতার' বাড়ীতেই ছিল তাঁহার আস্তানা। মিতার আপদে বিপদে তো সর্বদা সহায়ই, ইহা ছাড়া পল্লীর অন্য দশজনের হিতকর্মেও তিনি নিরতিশয় তৎপর। ও-অঞ্চলে খালবিলের অন্ত নাই। আমাদের গ্রামটি কিঞ্চিৎ উঁচু, বিল নাই। কিন্তু খাল অনেক। উত্তর দক্ষিণ এবং পূর্ব দিকে খাল, আবার গ্রামের পেট চিরিয়া তিনটি খাত। গ্রাম্য-পথে এ-পাড়া ও-পাড়া করিতে হইলে বহু সাঁকো পার হইতে হয়। ও-দিকে সাঁকোকে 'চার' বলে। সাঁকো পুল বা সেতু অর্থে 'চার' কথাটির আমদানী হইল কোথা হইতে ভাষাতত্ত্ববিদ বলিবেন কি? বাঁশ, শুপারী গাছ, খেজুর গাছ বা নারিকেল

গাছের খানিকটা খালের বা সোঁতা খালের উপর শোয়াইয়া দিয়া এই 'চার' করা হয়। 'চার' না থাকিলে যাতায়াতের অসুবিধা অথচ মধ্যে মধ্যে ইহা থাকিত না। যেখানেই বা যখনই এইরূপ বিপত্তি উপস্থিত হইত সেখানেই দেখিতাম চণ্ডী বিশ্বাস হাজির। তিনি লোক লাগাইয়া এবং নিজে গতরে খাটিয়া বাঁশ এবং অন্য গাছের খণ্ড এ বাড়ী ও বাড়ী হইতে সংগ্রহ করিতেন। কখন গৃহস্থকে বলিতেন, কখন বলিতেন না। ইহাতে কেহ কিছু মনে করিত না। চণ্ডী বিশ্বাস লইয়া গিয়াছেন ইহাই যথেষ্ট। তাঁহার নাম ছিল 'পাসপোর্ট'।

কাহারও অসুখ-বিসুখের কথা শুনিলে চণ্ডীচরণ স্থির থাকিতে পারিতেন না। তিনি তাহার পার্শ্বে গিয়া বসিতেন। রোগীকে আশ্বাস দিতেন, গৃহস্বামী আত্মীয়-স্বজনদের নানারূপ পরামর্শ দান করিতেন। কবিরাজদের মতো তিনি নাড়ী দেখিয়া রোগীর অবস্থা নিরূপণ করিতে পারিতেন। প্রত্যেক গৃহই ছিল তাঁহার নিজ গৃহ। নর-নারী-শিশু সকলেই তাঁহার উপস্থিতিতে কেমন যেন আশ্বস্ত হইয়া উঠিত, তাহাদের প্রাণে বল আসিত। সকাল-বিকাল-রাত্রি যে কোন সময়েই তাঁহাকে রোগীর পার্শ্বে দেখা যাইত। দিনরাতে অন্তত একবার তিনি আসিবেনই। আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বলি। পিতৃদেব বর্ষাকালে জ্বরে পড়িলেন। একবার জ্বর হইল শ্রাবণ কি ভাদ্র মাসে। বর্ষা-জল-কাদা—গ্রাম্য-পথে যাতায়াত কতই না কষ্টকর। সেই জল কাদা ভাঙ্গিয়া রাত্রি দশটা নাগাদ চণ্ডীচরণ আসিয়া হাজির। তখন তিনি বৃদ্ধ, বয়স সত্তরের কম নয়। তিনি তখন আমাদের বাড়ী হইতে একটু দূরে থাকিতেন। অন্যদের কাজকর্মে ব্যস্ত থাকায় তিনি দিনমানে আসিতে পারেন নাই, তাই অত রাত্রেও একবার দেখিবার জন্য আসিয়াছেন। তিনি পিতার শয্যাপার্শ্বে বসিলেন, সময়োপযোগী উপদেশ দিলেন, অন্য নানা কথা বলিয়া কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া গেলেন। একবারের কথা মাত্র এখানে বলিলাম।

শুধু ব্যসনে বা বিপদে নয়, উৎসবে আমোদে আহ্লাদেও তাঁহাকে গ্রাম-বাসী সকলে পাইতেন। তবে তিনি ছিলেন কর্মী, বসিয়া থাকা তাঁহার অভ্যাস নয়। বিবাহে বা শ্রাদ্ধে কোথায় কিরূপ আয়োজন করিতে হইবে তাহাও তিনি দেখিতেন। প্রচুর অর্থে একটি সম্পত্তি কিনিয়া জনৈক প্রতিবেশী বিপদে পড়িয়াছিলেন। চণ্ডীচরণ বিষয়ী লোক নন, তথাপি

তাঁহার ডাক পড়িল। তিনি বিপন্নের যষ্টি হইয়া এখানে সেখানে যাইতে লাগিলেন। একবার তাঁহার উপর নিতান্তই অকারণে তাঁহার এক নিকট আত্মীয় আঘাত করে; খুব কষ্ট পাইয়াছিলেন। গ্রামের লোক ঐ আত্মীয়টির কৃতকর্মে বিশেষ দুঃখিত হয় এবং চণ্ডীচরণের দ্রুত আরোগ্যের নিমিত্ত যথাবিহিত চেষ্টা করে। চণ্ডীচরণ পরার্থে সমস্ত জীবনটাই বিলাইয়া দিয়াছিলেন। দুই একটি কথা বা দুই একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা তাঁহার ত্যাগের পরিমাপ করা যায় না। তাঁহার ধন সম্পদ কিছু ছিল না, কিন্তু প্রাণ ছিল। পল্লীবাসীর সেবায় তিনি মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তাই তিনি সমাজের 'লবণ'।

নিশিকান্তের মা

রতনদা—বিখ্যাত দেশকর্মী শ্রীযুক্ত রতনমণি চট্টোপাধ্যায়। সেদিন জিজ্ঞাসা করিলেন তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর ছেলেদের পড়িতে কি বই দেওয়া যায়। শুনিবামাত্রই বলিলাম রামায়ণ মহাভারত। আজকাল কাহারও কাহারও মুখে শুনি রামায়ণ মহাভারত বড় কঠিন, আর অত বড় বই কেমন করিয়া ছেলেদের হাতে দেওয়া যায়। একথা কিন্তু মোটেই যুক্তিসঙ্গত নহে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে এ কথা বলিতেছি। রামায়ণ মহাভারত বলিতে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী বা, কাশীরাম দাসের মহাভারত। ছোটদের রামায়ণ ছোটদের মহাভারত এক সময়ে বাহির হইয়াছিল, সুলিখিত বই। কিন্তু ইহার বহুল প্রচারে খানিকটা অসুবিধাও হইয়াছে মনে হয়। কেননা কাহিনী বা গল্পগুলি জানিয়া ফেলিলে মূল পড়িতে আগ্রহ স্বভাবতঃই হ্রাস পায়। আবার বড় হইলে ছন্দোবদ্ধ রামায়ণ মহাভারত পড়িবার সময় হইবে না। এখন তার-বেতারের যুগ: লোক ছুটিয়া চলিয়াছে, দুদণ্ড বসিয়া রস-করিয়া অত বড় বই পড়িবার সময় কোথা? তাই রতনদার জিজ্ঞাসা মাত্রই বলিয়াছিলাম—রামায়ণ মহাভারত পড়িতে দিন।

এই রামায়ণ মহাভারত প্রসঙ্গেই নিশিকান্তের মা'র উল্লেখ করিতেছি। আমরা বালক, তিনি বৃদ্ধা, তখন তাঁহার বয়স পঁয়ষট্টি কি সত্তর বৎসর হইবে। ছোটখাটো মানুষটি, দ্রুত চলেন, কম কথা বলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন রামায়ণ-মহাভারত-গত প্রাণা। তাঁহার সম্বন্ধে কতটুকুই বা জানিতাম; তিনি সধবা, নিজ পুণ্যবলে সধবা অবস্থায়ই মারা যান। তখন ইস্কুলের নীচের কোন এক শ্রেণীতে পড়ি। তিনি লিখিতে পড়িতে জানিতেন না। অর্ধশতাব্দী পূর্বে ষাট সত্তর বৎসরের বৃদ্ধা ক'জনেই বা লেখাপড়া জানিতেন!

কিন্তু অক্ষর জ্ঞান না থাকিলেও ভারতীয় ঐতিহ্য সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁহাদের কত গভীর জ্ঞান ও শ্রদ্ধা ছিল তাহার পরিচয় পাইয়াছি প্রচুর। আমার জনৈক বন্ধুকে [বর্তমানে উত্তরপাড়া কলেজের অধ্যক্ষ] বলিতে শুনিয়াছি তাঁহার ঠাকুরমা পড়িতে পারিতেন কিন্তু লিখিতে পারিতেন না। গ্রামীণ মহিলাদের মধ্যে এ রকম ক্বচিৎ দেখা গেলেও কিছু কিছু ছিল।

বৈশাখ মাস। রামায়ণ মহাভারত পাঠ ও শ্রবণ তখন এক বিশেষ রীতি ছিল। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ইহা শুনিতেন। কোন বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় ব্যক্তি সুর করিয়া এই গ্রন্থ দুইখানির কিয়দংশ পড়িতেন, শ্রোতার দলে থাকিতেন বেশীর ভাগ বৃদ্ধ বৃদ্ধা। নিশিকান্তের মাও এমন কিছু বিশেষ নন। তবে তাঁহার মতো অমন নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা কুত্রাপি দেখি নাই। ইহা সেই ছেলেবেলায় আমাকে যে কত মুগ্ধ করিয়াছিল বলিতে পারি না। তিনি সম্পর্কে ছিলেন আমার পিতার মামীমা। ছুটির দিনে তাঁহাকে রামায়ণ পড়িয়া শোনানো, শৈশবে দেখিয়াছি, পিতৃদেবের একটি কর্তব্য মধ্যে ছিল। তিনি সুর করিয়া রামায়ণ এবং কখন কখন মহাভারত পাঠ করিতেন, তাঁহার পাঠ বড়ই মিষ্ট লাগিত। তাঁহার মত সুর করিয়া পড়িতে চেষ্টা করিতাম, কিন্তু মনে হইত কোথায় যেন ফাঁক রহিয়া গিয়াছে। পিতৃদেবের অনুপস্থিতিতে নিশিকান্তের মা আমাকে ধরিয়া বসিতেন। সেই কথাই এখন বলি।

আমি তখন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীতে সবে ভর্তি হইয়াছি। নিশিকান্তের মা অন্যান্য সময়েও, বিশেষতঃ বর্ষাকালের রাত্রির অবসরে এই গ্রন্থ দুইখানির পাঠ শুনিতে চাহিতেন। তাঁহার সঙ্গে জুটিতেন সরোজিনী পিসীমা। তিনি স্বামী-পুত্র হারাইয়া ধর্ম কর্মে মন দিয়াছেন। রাত্রিযোগে রামায়ণের কিয়দংশ প্রায়ই পড়িয়া শুনাইতাম। আমি ছেলেমানুষ, শিশু বলিলেও হয়, রাত্রি বারোটা একটা পর্যন্তও পড়িতাম। ঘড়ি ছিল না, আন্দাজে বলিতেছি। অধিক রাত্রি যে জাগিতাম তাহাতে সন্দেহ নাই। দিনের পর দিন এইরূপ রাত্রি জাগিয়া রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিয়াছি। চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত বোধ হয় এইরূপ চলিয়াছিল। তবে মধ্যে মধ্যে যে ফাঁক না যাইত তাহা নয়। নিশিকান্তের মা সম্পর্কে আমার ঠাকুরমা। আমার উপর জোরও চলিত, একারণে অনেক দিন তাঁহার নির্দেশে বিশেষ বিশেষ অধ্যায় পড়িতে হইত। মনে হইত সমগ্র রামায়ণ মহাভারতের বিষয়াদি তাঁহার জানা। এইরূপে রীতিমত পাঠনার দরুণ এই গ্রন্থ দুইখানির বিষয়-

বস্তু ও কাহিনী উপাখ্যানাদি প্রায়ই আমি জানিয়া ফেলিলাম। পঞ্চম শ্রেণীতে মর‍্যাল ক্লাসে উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর "ছোটদের রামায়ণ" আমাদের পড়িয়া শুনানো হইত। হেড পণ্ডিত মহাশয় পড়াইতেন। তখন দেখি তাঁহার মুখে যাহা শুনিতেছি তাহার অধিকাংশই তো আমার জানা।

রামায়ণ মহাভারত পাঠের রেওয়াজ এখন বড় একটা দেখি না। গত বৈশাখে আমতলায় বসিয়া এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক রামায়ণ পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার স্বরের ভিতরে পিতৃদেবের স্বরের যেন রেশ মিলিল। বড়ই আনন্দ পাইলাম। ছেলেবেলায় রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিতে দিলে নিজস্ব ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিবে, সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষার উপরে দখল হইবে। শুধু রামায়ণ মহাভারত কেন মঙ্গল-কাব্যগুলিও তাহাদিগকে পড়িতে দেওয়া উচিত। সব যে বুঝিবে তাহা নয়, সব বুঝিবার দরকারও নাই। বাংলা ভাষার শব্দ সম্পদ সম্বন্ধে জ্ঞান হইবে। বাংলা সাহিত্যের স্বরের সঙ্গেও তাহাদের পরিচয় ঘটিবে। রতনদা আমার কথার যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিলেন। নিশিকান্তের মা'র মধ্যে যে নিষ্ঠা দেখিয়াছি তাহা যেন আমাতেও অনুক্রামিত হইয়াছিল। তাঁহাকে আজ বারবার নমস্কার করি।

জলধর সেন

ভারতবর্ষ সম্পাদক রায় বাহাদুর জলধর সেনের কথা স্মৃতিপথে বড়ই উদয় হয়। তিনি সম্পাদক, ঔপন্যাসিক, বিখ্যাত 'হিমালয়' রচয়িতা। এ সমুদয়ই তাঁহার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করে না। তিনি ছিলেন বাঙ্গালী সাহিত্যিক-সমাজের দাদা। এই 'দাদা' কথাটির মধ্যেই তাঁহার সম্যক পরিচয়। তিনি স্নেহশীল, প্রীতিপরায়ণ, উদীয়মান সাহিত্যিকের উৎসাহদাতা, আশ্রয় স্থল। দাদাকে কতবার বলিতে শুনিয়াছি, "আমি সাহিত্যসেবী নই, আমি সাহিত্যিকের সেবক।" 'সাহিত্যসেবী নই' একথা অবশ্য বিনয় কিন্তু পরবর্তী অংশ অতি সত্য। আর এই জন্যই তিনি ছিলেন সাহিত্যিক মাত্রেরই দাদা।

'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু'এর সম্পাদকীয় বিভাগে প্রবেশ করিয়াই সহকর্মী-প্রধান-রূপে পাইলাম ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি প্রৌঢ়, আমি যুবক। কি জানি কেন প্রথমাবধিই আমাদের উভয়ের মধ্যে একটি প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। ব্রজেন্দ্রবাবু আমাকে খুবই স্নেহ করিতেন।

আমিও তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতাম। তখন ১৪ নং পার্শীবাগান লেনে (ইউনির্ভাসিটি সায়ান্স কলেজের উত্তর পার্শ্বের গলি) ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বস্থর ভবনে বেশ একটি আড্ডা জমিত। বহু বিদগ্ধব্যক্তি, অধ্যাপক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষাব্রতী, শিল্পী, ব্যবসায়কর্মী আসিয়া এখানে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা ও গালগল্প করিতেন। যতদূর মনে হয় এইখানেই সর্ব প্রথম জলধর সেন—'দাদা'কে দেখি। আরও কয়েকজনকে ক্রমে ক্রমে দেখিলাম—রাজশেখর বস্থ (পরশুরাম), শিল্পী যতীন্দ্রনাথ সেন, কবি শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ লাহা প্রভৃতিকে। গিরীন্দ্রশেখরের বড়দা রসিক প্রবর শশীশেখর বস্থকেও এখানে প্রথম দেখি। জলধর দাদা কালা—কানে শুনেন না, চেঁচাইয়া বলিলে তবে কিছু কিছু শুনেন। নীরবে বসিয়া থাকেন, মুখে বর্মা চুরুট, মাঝে মাঝে অবশ্য কিছু কিছু বলেন। এখানে তাঁহার সঙ্গে পরিচয় হইয়া থাকিবে হয়ত, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইল অন্য ক্ষেত্রে।

মানসী ও মর্মবাণীর স্থবোধ দত্ত 'রবি-বাসর' পরিচালনা করিতেন। কিন্তু ১৯২৯ কি ৩০ সনে এই সাহিত্যিক সভাটি পুনর্গঠিত হইল। তখন ডিক্টেটরের যুগ। রবিবাসরের সদস্যগণ জলধরদাদাকেই ডিক্টেটর করিলেন। বাংলায় নাম দেওয়া হইল সর্বাধ্যক্ষ। জলধর ভোলানাথ মানুষটি, তিনি ডিক্টেটর—একথা তো ভাবাই যায় না। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক বা সেক্রেটারী হইলেন এবং জলধরদাকে পুরোভাগে রাখিয়া তিনিই রবিবাসর পরিচালনায় অগ্রসর হইলেন। রবি-বাসরের পাক্ষিক অধিবেশনগুলির প্রসিডিংস বা কার্য বিবরণ লেখার ভার পড়িল আমার উপর। তখন নরেন্দ্রনাথ বস্থ (রবিবাসরের বর্তমান সম্পাদক) এই বৈঠকটির বিশেষ আনুকূল্য করিতেন। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের উত্তর দিক্‌কার বিরাট কলিকাতা হোটেলের দ্বিতলের একটি কক্ষ প্রায়ই ছাড়িয়া দিতেন রবিবাসরের পাক্ষিক অধিবেশনের জন্য। নিয়ম ছিল, রবিবাসরের সদস্য সংখ্যা অনধিক পঞ্চাশ জন হইবে এবং পক্ষান্তে এক একজন সদস্য ইহার অধিবেশন আহ্বান করিবেন। কলিকাতা হোটেলে, সর্বাধ্যক্ষ জলধরদা'র গৃহে, প্রবাসী অফিস ভবনে এইরূপ নানা স্থলে বিভিন্ন সদস্যদের আহ্বানে রবিবাসরের পাক্ষিক অধিবেশনগুলি হইত। কখন কখন কলিকাতার বাহিরেও তখন অধিবেশন ডাকা হইত। একবার আমরা সভা করিতে যাই অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর আগড়পাড়াস্থ ভবনে। এই অধিবেশনে কবি শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা "সাহিত্যে আর্ট"—কি এইরূপ একটি

শিরোনামায় একটি চমৎকার প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি এ ধরনের সাহিত্য বিষয়ে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। আমরা কোন কোন প্রবন্ধ প্রবাসীতে পত্রস্থ করি। দুইটি অধিবেশনে আচার্য যদুনাথ সরকারের উপস্থিতি ও বক্তৃতা দানের কথা অন্যত্র বলিয়াছি। ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় "প্রেতাত্মা" সম্বন্ধে একবার ঘণ্টাখানেক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথও প্রবন্ধ পাঠ করিতেন। জলধরদা বা আমাদের সর্বজন প্রিয় 'দাদা' কি কলিকাতায়, কি কলিকাতার বাহিরে সর্বত্র রবিবাসরের অধিবেশনে যাইতেন। একবার তাঁহার প্রবন্ধ পাঠের কথা ছিল। আমরা সকলে নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষায় আছি। দাদা হঠাৎ একটি লেখা পকেট হইতে বাহির করিয়া বলিলেন 'বড় চমৎকার জিনিস আছে,' বলিয়াই ব্রজেন্দ্র বাবুকে পড়িতে দিলেন। লেখাটি ব্রজেন্দ্র বাবুরই। 'সমাচার দর্পণ' হইতে বহুলাংশ তিনি 'সংবাদ পত্রে সেকালের কথা' নাম দিয়া ধারাবাহিক ভাবে ভারতবর্ষে প্রকাশ করিতেছিলেন। এই কিস্তিতে ছিল শান্তিপুর নিবাসিনী সুতাকাটুনীর পত্র। বড়ই মর্মন্তুদ, উপভোগ্যও বটে। দাদা নিজের বাটিতেও অধিবেশন ডাকিতেন এবং আমাদিগকে জলযোগে আপ্যায়িত করিতেন।

তৃতীয় দশকের গোড়াতে কলিকাতায় জয়ন্তীর হিড়িক লাগিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের সপ্ততি বর্ষ পূর্তির জয়ন্তী হইয়া গেল। রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু শতবার্ষিকী হইল। ইহার ফাঁকে ফাঁকে আরও অনেক জয়ন্তী হয়। আমরা ও রবিবাসরের পক্ষে জলধরদার সত্তর বৎসর পূর্তির উৎসব উদ্‌যাপিত করিলাম। রামমোহন লাইব্রেরীতে উৎসবের আয়োজন হয়। ছোট্ট আয়োজন, কিন্তু পরিচ্ছন্ন এবং খুবই আন্তরিকতাপূর্ণ। অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতি। প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) এবং আরও বহু নামজাদা সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। রবিবাসরের পক্ষে কবি শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা একখানি মানপত্র পাঠ করেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও অভিনন্দন-পত্র পঠিত হয় ও তাহার পর বক্তৃতা। শরৎচন্দ্র বোধ হয় তখন অসুস্থ ছিলেন। দুই তিন মিনিট অন্তর অন্তরই মঞ্চ হইতে নীচে নামিয়া যাইতেছেন। এই অন্তর্বর্তী সময়ে বার বার 'বীরবল' সভাপতির আসনে বসিতে থাকেন, ইহাতে সভার কার্যে কিছু ব্যাঘাত হইল বটে, কিন্তু আন্তরিকতায় সব মানাইয়া গেল। জলধরদার গুণমুগ্ধ সকলেই; বহু বক্তা তাঁহার প্রশস্তি করিলেন। কে কি বলিলেন পৃথক ভাবে তা বড় একটা মনে নাই। তবে এক বিশেষ কারণে

একটি বক্তৃতা মনে আছে। ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্তক গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস প্রথম জীবনে সাহিত্য সেবায় জলধর দাদার নিকট হইতে প্রেরণা পাইয়াছিলেন। তিনি ভক্তি গদগদ কণ্ঠে এ ধরনের কয়েকটি কথা বলিয়া একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম পংক্তি "ওগো আমার জলধর……" ইত্যাদি। প্রথম কলি বলিতে বলিতেই তিনি গান ধরিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য ; মঞ্চের এদিক হইতে ওদিক নৃত্য করিতে করিতে 'ওগো আমার জলধর' গান। হল কাঁপাইয়া করতালি ধ্বনি। অমন গম্ভীর পরিবেশ মুহূর্ত মধ্যে হালকা চটুল হইয়া গেল ; আমরা উপভোগ করিলাম বটে, কিন্তু মনে মনে কষ্ট পাইলাম। যাহা হউক শেষ রক্ষা হইল। জলধরদা একটি সুন্দর বক্তৃতা দিলেন। এখানেও তিনি বলিলেন "আমি সাহিত্যিক নই। সাহিত্যিকদের সেবক মাত্র।" আমরা জলধরদার প্রতি মনে মনে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাইয়া যথাস্থানে ফিরিয়া গেলাম।

ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন জলধরদার বিশেষ অনুরক্ত, স্নেহভাজন এবং বিশ্বস্ত। আমরাও, ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গীরাও তাঁহার স্নেহলাভে সক্ষম হইলাম। ব্রজেন্দ্রবাবুর 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, (১ম সং) তখন বোধ হয় বাহির হইয়াছে। তাঁহার সাকরেদি করিতে করিতে দেখিলাম ঊনবিংশ শতকের মহামনা ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সমকালীন সাহিত্য হইতে অনেক নূতন কথা জানা যাইতেছে। এই সব মনীষীর জীবন ও কার্যকলাপ আলোচনা-গবেষণায় রত হইলাম। ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন আমার এ কার্যের প্রধান উৎসাহ-দাতা। বিখ্যাত পার্শী ধনী ও দানবীর রুস্তমজী কাওয়াসজী সম্বন্ধে একটি তথ্যভিত্তিক বড় প্রবন্ধ রচনা করিলাম। আমরা তখন প্রবাসীর সম্পাদকীয় বিভাগে কর্মে লিপ্ত। কিন্তু দ্রুত প্রকাশনার নিমিত্ত ব্রজেন্দ্রনাথ আমার এ প্রবন্ধের বিষয় জলধরদাকে বলিলেন। জলধরদা আমার প্রবন্ধটি সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং 'ভারতবর্ষের' পরবর্তী সংখ্যায় উহার অর্ধেকটা প্রকাশিত হইল (চৈত্র, ১৩৩৮)। দ্বিতীয়ার্ধ বাহির হয় পরবর্তী জ্যৈষ্ঠ মাসে। এই আমার প্রথম নাম সংযুক্ত মুদ্রিত রচনা। প্রথম লেখা এইরূপ দ্রুত প্রকাশে কত যে উৎসাহিত হইয়াছিলাম বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। আরও উৎসাহিত হইলাম একটি কারণে। একদিন দেখি জলধরদা স্বয়ং প্রবাসী অফিসের দোতলায় আমাদের কক্ষে আসিয়াছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ প্রবাসীতে আসা অবধি কখন কখন জলধরদা প্রবাসী অফিসে আসিতেন বটে,

কিন্তু এবার আগমনের লক্ষ্য ছিলাম আমি। "ভায়া, এই নাও" বলিয়া পকেট হইতে একখানি দশটাকার নোট বাহির করিয়া আমার বুক পকেটে গুঁজিয়া দিলেন। বুঝিলাম ইহা আমার লেখার দক্ষিণা। এ দিন ছিল শনিবার। আমি মেসের অধিবাসী। রবিবার বৈকালে ভৃত্য বিদ্যাধরকে দিয়া ইহার কিয়দংশ হইতে খাবার আনাইলাম এবং মেসের সকল বন্ধুকেই বাঁটিয়া দেওয়া হইল, বলিয়াছিলাম আমার 'পাকা দেখার' খাবার। কি ক্ষণেই না এই কথাটি মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল। সত্যিকার বিবাহিত জীবনে 'লক্ষ্মী'র আর সাক্ষাৎ মিলিল না। সরস্বতী ঠাকুরাণীর আঁচ পাইয়া তিনি কি চিরতরে বিদায় লইয়াছেন? জলধরদার নিকট হইতে সেদিন যে উৎসাহ ও প্রেরণা পাই, জীবনে তাহা পাথেয় স্বরূপ হইয়া আছে। এইরূপ কত তরুণই না তাঁহার নিকট হইতে উৎসাহ লাভ করিয়াছেন; এখন বুঝিতেছি জয়ন্তীর দিনে গুরুসদয় আনন্দাতিশয্যেই নৃত্যপর হইয়াছিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে 'ভারতবর্ষে' আরও লেখা প্রকাশিত হয়, তাহাতেও আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রথম দিনের সে অনুভূতির তুলনা নাই।

'জাল প্রতাপচাঁদ' সম্পর্কে জলধরদার অত্যধিক ঔৎসুক্য ছিল। তিনি একখানি পুস্তক লিখিবার বাসনাও হয়ত প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'সমাচার দর্পণে' জাল প্রতাপচাঁদ ঘটিত মামলার আনুপূর্বিক বিবরণ বহুদিন ধরিয়া প্রকাশিত হয়। ব্রজেন্দ্রবাবুর মুখে জলধরদা একথা শুনিয়া থাকিবেন। তিনি এই বিষয়গুলি নকল করাইয়া লইতে চাহিলে ব্রজেন্দ্রবাবুর নির্দেশে আমি উহা নকল করি। ষোল পৃষ্ঠা পরিমিত এক্সারসাইজ খাতার ত্রিশখানা নকল করিয়া দিয়াছিলাম। কেমন করিয়া দিনের পর দিন ইহা নকল করিয়াছিলাম এখন ভাবিলে বিস্মিত হই। জলধরদা ইহার সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। আমরা অনেকে ব্রজেন্দ্রবাবুর নেতৃত্বে রবিবাসর ছাড়িয়া সাহিত্য পরিষদে যোগ দিলাম। কিন্তু জলধরদাকে আমরা কখনও ভুলি নাই, তিনিও আমাদের ভুলেন নাই। আমাদের সময়ে সাহিত্য পরিষদ তাঁহাকে 'বিশিষ্ট সদস্য' শ্রেণীভুক্ত করিয়া লন। এটি খুবই সম্মানের পদ। পরিষদের তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের ভোটে এক একজন বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন। তাঁহার স্নেহ প্রীতি বরাবর অটুট ছিল। দেখা হইলেই সেই মিষ্ট সম্ভাষণ "ভায়া কেমন আছ?"

রামকমল সিংহ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও রামকল সিংহ অভিন্ন বলিয়া সাধারণের নিকট প্রতিভাত হইতেন ; রামকমল ছিলেন ইহার সহিত জড়িত। তিনি প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর কাল অকুণ্ঠচিত্তে সাহিত্য পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে অতি নিকট হইতে অন্যূন পঁচিশ বৎসর কাল দেখিয়াছি। এমন পরিষদ-গত প্রাণ দুইটি এই দীর্ঘকালের মধ্যে চোখে পড়ে নাই! রামকমলবাবুর আদি নিবাস মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমায়। তিনি উত্তর-বঙ্গীয় বিখ্যাত সিংহ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। রামকমলবাবুর মত বিনয়ী সদালাপী মানুষও বোধ হয় খুব কমই দেখিয়াছি।

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ব্যোমকেশ মুস্তাফী প্রভৃতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে একটি ঐতিহ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের সময়েরই মানুষ রামকমল সিংহ। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর বা ব্যোমকেশ মুস্তাফীকে দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদেরই হাতে গড়া রামকমল সিংহকে দেখিয়া বুঝা যাইত তাঁহারা কতবড় মানুষ ছিলেন। রামকমল তাঁহাদের ঐতিহ্য বহন করিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু তিনি যেন অতিরিক্ত আরও কিছু। যেখানেই গণতন্ত্র সেখানেই দল এবং দলাদলি। রামকমল বাবু এই দল ও দলাদলির ঊর্ধ্বে ছিলেন। পক্ষ প্রতিপক্ষ দুই তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান দিতেন। আমরা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমাদের পূর্ববর্তীয়েরাও ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। রামকমল সিংহের বিদায়-অভিনন্দন সভায় ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁহার এই অপক্ষপাতের কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমরা কয়েকজন 'রবিবাসরীয়' সদস্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সদস্যশ্রেণী ভুক্ত হই বোধ হয় ১৯৩১ সনে। যতদূর মনে হইতেছে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে পরিষদে একবার মাত্র দেখিয়াছি। অন্যত্র তাঁহাকে অতি নিকট হইতে দেখিয়াছিলাম। আমরা যখন পরিষদে যাই তখন সভাপতি ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। আমরা পড়াশুনা বিশেষতঃ গবেষণা কার্যের সুবিধার নিমিত্তই পরিষদে ঢুকি। রামকমলবাবু আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। আমি অপেক্ষাকৃত অল্প-বয়স্ক, সাহিত্য-ক্ষেত্রে শিক্ষানবীশ মাত্র, তথাপি তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করিতে ভুলিলেন না। পড়াশুনার সব রকম সুবিধাই তিনি করিয়া দেন। পার্শী

দানবীর রুস্তমজী কাওয়াসজী সম্বন্ধে গবেষণাকালে ছয় মাসের অধিককাল প্রত্যহ অপরাহ্ণে প্রবাসী আপিস হইতে সাহিত্য পরিষদে যাইতাম এবং রাত্রি আটটা পর্যন্ত সমানে বই-পুঁথি-পত্র লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতাম। একটি দিন বা একটি বারের জন্যও কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই।

রামকমলবাবু ছিলেন পরিষদের মধ্যমণি, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া পরিষদ-চক্র ঘুরিতেছে বলিয়া মনে হইত। কার্য নির্বাহক সমিতির দিন অনেক নূতন নূতন লোক দেখিতাম। তাঁহারা কিছুকাল থাকিয়া ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে সভার কাজকর্ম সারিয়া যে যাহার গন্তব্যস্থলে চলিয়া যাইতেন। তাঁহাদের আগমনে পরিষদে খানিকটা উচ্ছলতা দেখা দিত ও তাঁহাদের অন্তর্ধানে পরিষদ আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিত—কাব্য করিব না, মনে হইত পরিষদ যেন শীতকালের নদীর মত আবার স্বাভাবিক শান্তভাব ধারণ করিয়াছে!

কর্মকর্তারা কেহ কেহ অবশ্য মাঝে মাঝে আসিতেন, রামকমলবাবুর নিকট বহু বিষয়ে তত্ত্বতল্লাস করিতেন, কখনও বসিয়া গল্পগুজব করিতেন, কখন বা কাজ হইলেই চলিয়া যাইতেন। তবে পরিষদের একজন কর্মকর্তার উপস্থিতি প্রায়ই লক্ষ্য করিতাম—তিনি বোধ হয় পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক ছিলেন—মৌলবী আবদুল গফুর। শুনিয়াছি তাঁহার নিবাস বসিরহাটের সন্নিকটে এবং এখনও জীবিত। পরিষদে একটি গড়গড়া ছিল, তিনি আসিলেই বেহারা তামাকু সাজিয়া দিত। তিনি তামাকু সেবন করিতে করিতে নানা গালগল্প করিতেন। ফাঁকে ফাঁকে রামকমলবাবু এবং আমরা উহাতে যোগ দিতাম। এই গড়গড়াটি কোথায় গেল জানিবার কৌতূহল হইয়াছে অনেক দিন। কর্মকর্তা পদেও পরিষদে কত সুধী সজ্জনের সমাগম হইত। 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের' আবিষ্কর্তা বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদবল্লভ পরিষদ মন্দিরে প্রায়ই আসিতেন। তাঁহাকে ইতিপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে দেখিয়াছি। তখন জানিতাম না ইনি কে। বোধ হয় রামকমলবাবুই তাঁহার সহিত আমার আলাপ করাইয়া দেন। 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের' আবিষ্কারের ফলে বাংলা সাহিত্যের একটি সুন্দর দিক খুলিয়া গিয়াছে। পরিষদ এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া ধন্য। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের সারগর্ভ ভূমিকা গ্রন্থখানিকে বিদ্বজ্জন সমাজে পরিচিত করাইয়া দিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা স্নাতকোত্তর বিভাগ খোলা হইতেই সার্ আশুতোষ গ্রন্থখানিকে অন্যতর পাঠ্যরূপে গ্রহণ করিয়া বসন্তরঞ্জনকে ইহার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করিলেন।

এ হেন বসন্তরঞ্জনকে দেখিলাম। দেখিলাম শিশুসুলভ সরল প্রাণ, একান্ত বিনয়ী এবং তরুণদের কার্যকলাপের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল। প্রথম পরিচয়েই যেন তাঁহার স্নেহপাশে আবদ্ধ হইলাম। পরে যতবার দেখা হইয়াছে তিনি কুশলবার্তা তো লইতেনই, উপরন্তু তাঁহার আলাপ হইতে বুঝিতাম যে আমাদের মত বয়ঃকনিষ্ঠদের কার্যকলাপের সঙ্গেও তিনি পরিচিত।

পরিষদ মন্দিরে আরও বহু পণ্ডিত ও মনীষী-প্রধানকে দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে প্রথমেই মনে হয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়কে। যতদূর মনে হয় তিনি কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের দর্শনের অধ্যাপক পদ হইতে তখন অবসর গ্রহণ করিয়া কাশীবাস করিতেছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতেন এবং কলিকাতায় আসিলেই পরিষদ মন্দিরে পদার্পণ করিতেন। দর্শন শাস্ত্রে বিশেষতঃ ন্যায় দর্শনে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য। ন্যায়-দর্শনের উপর তাঁহার গবেষণা-মূলক এক বিরাট গ্রন্থ পরিষদ কয়েক খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে ও সদালাপে আমরা তরুণেরা মুগ্ধ হইতাম। তাঁহাকে পরিষদ মন্দিরে বহুবার দেখিয়াছি এবং তিনি বরাবরই আমাদের কুশলবার্তা ও কার্যকলাপের খোঁজখবর লইতেন। তৃতীয় দশকের শেষদিকে কৃষ্ণনগরে যে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয় তাহাতে আমরা কলিকাতা হইতে একসঙ্গে যাত্রা করি। কৃষ্ণনগর যাইবার সময় রাণাঘাটে আমরা গাড়ী বদল করি। প্লাটফর্মে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের তৎকালীন অধ্যাপক শ্রীনির্মলনাথ চট্টোপাধ্যায় আমাদের কয়েকজনের গ্রুপ ফটো তোলেন। ইহাতে ছিলেন মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন,শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত এবং আমরা দু তিন জন। বলা বাহুল্য এই ফটোখানি আমার নিকট একটি অমূল্য সম্পদ হইয়া আছে। ফণীভূষণের মত অমন নিরহঙ্কার, বিনয়ী, প্রীতিপরায়ণ মানুষ কদাচ দেখিতে পাই।

পরিষদ মন্দিরে সুবিখ্যাত বিশ্বকোষ সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণবকেও কয়েকবার দেখিয়াছি। তখন তিনি বয়োবৃদ্ধ ; এবং প্রায়ই অসুস্থ থাকিতেন। তিনি অল্পকাল মধ্যেই ইহধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন। কবি কামিনী রায় পরিষদের অন্যতম সহ সভাপতি ছিলেন। তিনি কোন কোন সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি বিদুষী মহিলা। বেথুন স্কুল ও কলেজের ইতিহাস রচনাকালে তাঁহার ছাত্র ও কর্মজীবনের পরিচয় সবিশেষ পাই। ইহা

পরবর্তী কালের কথা। কবি কামিনী রায় শান্ত-স্বভাবা ; দেখিবামাত্র মনে মাতৃভাবের উদয় হইত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে আমাদের সময়ে একবার পরিষদ মন্দিরে অভ্যর্থনা করা হয়। এই সময় অতি নিকট হইতে তাঁহাকে দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। রমেশ ভবন দ্বিতল করিবার নিমিত্ত যে প্রথম জনসভা হয় তাহাতে পৌরোহিত্য করেন সরোজিনী নাইডু।

পরিষদের যতরকম উদ্যোগ আয়োজন সকলের সঙ্গেই ছিলেন রামকমলবাবু। এ সকলের মূলেও ছিলেন তিনি। আমরা কৌতুক করিয়া বলিতাম চীফ একজিকিউটিভ অফিসার—যেমন করর্পোরেশনের। সত্য কথা বলিতে কি রামকমলবাবু ঠিক এই কথাটির মূর্তরূপ ছিলেন। আমরা আগের কথা জানি না, যে সময়ে পরিষদে যাইতে লাগিলাম সে সময় হইতেই রামকমলবাবুকে পরিষদ আগলাইয়া থাকিতে দেখিতাম। পরিষদের কাজকর্মতো আছেই, ইহা ছাড়া আগন্তুক অভ্যাগতও কম ছিল না। সকলের সঙ্গেই তাঁহার আলাপ আলোচনা করিতে হইত। পরিষদকে তিনি কত ভালবাসিতেন এই সব আলাপ আলোচনা হইতে তাহা বুঝা যাইত। কি ভাবে পরিষদের সম্পদ বৃদ্ধি হইতে পারে সেদিকে তাঁহার সজাগ দৃষ্টি। কাহার নিকট কি বই আছে, কোথায় কি পুঁথি পাওয়া যায়, পরিষদের কোন বইয়ের অভাব অবশ্যই পূরণ করিতে হইবে এ সব বিষয়েও তিনি কর্মতৎপর ছিলেন। পুরানো বইয়ের দোকানে ঘোরা আমার এক সময়ে অভ্যাস ছিল। 'দাসী' ও অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য পত্র পত্রিকার ফাইল যাহা কিছু পাইতাম স্বল্পমূল্যে কিনিয়া পরিষদে তাঁহার নিকট পৌছাইয়া দিতাম। প্রবীণ বা নবীন সকল সাহিত্যিকের প্রতিই তাঁহার স্বাভাবিক প্রীতির সম্পর্ক ছিল। এজন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাহিত্যিককে তাঁহার সান্নিধ্যে আসিতে দেখিতাম। পরিষদের উদ্দেশ্য বহুবিধ, এই সকল উদ্দেশ্য অনুযায়ী কর্মপরিচালনায় যে তৎপরতা ও নিষ্ঠা আবশ্যক তাহাতে এক সময় যেন খানিকটা হানি ঘটিয়াছিল। আমরা নূতন সদস্যেরা ব্রজেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে পরিষদের উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হইলাম। পরিষদে নূতন কর্মীর প্রবেশে ইহার উন্নতি অবধারিত এই বিশ্বাসে রামকমল আমাদিগকে সর্বপ্রকারে সহায়তা করিতে লাগিলেন। পরিষদেরই উন্নতি ছিল তাঁহার কাম্য। ইহা তিনি অ-পক্ষপাত হইয়াই করিতেন। একারণ প্রবীণেরা কখনও তাঁহাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন না। তিনি যে আমাদের পক্ষপাতী হইয়াছেন একথাও ঘুণাক্ষরেও আমরা বুঝিতে পারিতাম না। পরিষদে নূতন দল আসিয়া ইহার

বিভিন্ন বিভাগে কর্ম-কুশলতা দেখাইতে লাগিলেন। বাংলা ক্লাসিক্স্ প্রকাশ এই সময়ের একটি প্রধান কার্য। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় একে একে বঙ্কিম রচনাবলী, মধুসূদন রচনাবলী, রামেন্দ্র রচনাবলী প্রভৃতি বাহির হইতে থাকে। প্রবীণ কর্মী রামকমলবাবু সম্পূর্ণ সহযোগিতা করিতে লাগিলেন। যতই দিন যাইতে লাগিল পরিষদের সঙ্গে তাঁহার একাত্মতা আমাদের নিকট প্রকট হইয়া পড়িল।

এক নাগাড়ে দীর্ঘকাল পরিষদের সেবা করিয়া রামকমলবাবুর শরীর অপটু হইয়া উঠিল। তিনি আর রীতিমত কার্য করিতে পারিতেন না। সামান্য কিছু পেনসেন লইয়া তিনি পরিষদের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। বিদায়ের দিনে তাঁহাকে একটি সভায় অভিনন্দিত করা হয়। আচার্য যদুনাথ সরকার তখন পরিষদের সভাপতি। এ সভায় তিনিই পৌরোহিত্য করেন। নবীন প্রবীণ পরিষদের বহু সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের কথা প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি বক্তৃতায় রামকমলের কর্মতৎপরতা এবং অপক্ষপাত দৃষ্টির বিশেষ প্রশংসা করিলেন। তাঁহারা—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ কুমার, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং নিজে যুক্তভাবে এক সময়ে প্রবীণ নেতাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি তখন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন প্রবীণদের প্রতিও যেমন নবীনদের প্রতিও তেমনি রামকমল সিংহ সমান ব্যবহার করিতেন। আচরণের তারতম্য তাঁহাতে তিনি কখন লক্ষ্য করেন নাই। বিদায়ের সভায় রামকমলবাবু একেবারে অভিভূত হইয়া পড়েন। গদগদ কণ্ঠে সামান্যই বলিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেই তাঁহার পরিষদ-প্রীতি সম্যক প্রকাশ পাইল। তিনি অবসর-জীবন অধিকদিন যাপন করিতে পারেন নাই, অল্পকাল পরেই ইহধাম ত্যাগ করেন।

সুরেশচন্দ্র দেব

নূতনের প্রতি অনুরক্ত হইয়াও অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন সুরেশচন্দ্র দেব। দেখিলেই মনে হইত, কোন অজানা অতীতের ঐতিহ্য বহন করিয়া চলিয়াছেন এই নাতিদীর্ঘ ক্ষীণকায় মানুষটি। তাঁহাকে প্রথম কখন দেখি বা প্রথমে কোথায় আলাপ হয় ঠিক স্মরণ হইতেছে না। তবে ইংরেজী দৈনিক 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' প্রকাশের পর হইতেই যে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে

আসিয়াছিলাম একথা পরিষ্কার মনে আছে। আমি তখন আনন্দবাজার পত্রিকা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত দেশ সাপ্তাহিকের সম্পাদকীয় কর্মে লিপ্ত ছিলাম। দিনের পর দিন অতি নিকট হইতে সুরেশচন্দ্রকে দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে তিনি আমাদের অতিপ্রিয় সুরেশদা হইয়া উঠিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকাকালীন আমার মাত্র দুইখানি বই বাহির হয়। সুরেশদা প্রতিটি বইয়ের সম্বন্ধেই নিজ প্রীতিপূর্ণ অভিমত জানাইলেন সম্পাদকীয় স্তম্ভে। তাঁহার এতাদৃশ সহৃদয় ব্যবহারে মুগ্ধ না হইয়া পারি নাই। একবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হইল বাঁকুড়া জেলার বিখ্যাত বিষ্ণুপুরে। অল্পসময়ের মধ্যে নানা স্থান হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া বিষ্ণুপুরের উপর একটি ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিয়া দিই 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড'-এর জন্য। এক এক শ্লিপ লিখিতেছি, সঙ্গে সঙ্গে চাহিয়া লওয়া হইতেছে; টাইপের পর সুরেশদা দেখিয়া দিতেছেন, অমনি প্রেসে পাঠানো হইতেছে। পর দিন প্রাদেশিক সম্মেলন, প্রবন্ধটি চিত্রসহযোগে পত্রিকায় প্রকাশিত হইল। এমনি করিয়া দিনের পর দিন সুরেশদার সান্নিধ্যে আসিতে লাগিলাম।

সুরেশচন্দ্রের পরিচয় ক্রমে ক্রমে পাইলাম। তিনি শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী ছিলেন। মনস্বী বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয় যৌবনে পদার্পণ করিতেই। সংবাদিকতায়ও তাঁহার হাতে খড়ি হয় বিপিনচন্দ্রের নিকট। সুরেশচন্দ্র ছায়ার মত তাঁহার অনুসরণ করিতেন। সুরেশদার মুখে বিপিনচন্দ্রের কথা অনেক শুনিয়াছি। অসহযোগের মরশুমে সুরেশচন্দ্র শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর 'সার্ভেণ্ট' দৈনিকের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের খাদি প্রতিষ্ঠানের সহিতও পরে যুক্ত হন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় সুরেশচন্দ্র কারাবরণ করেন। কিন্তু সাংবাদিকতা ছিল তাঁহার স্বকীয় বৃত্তি। তিনি ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন সংবাদপত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। একখানি সর্বতথ্যসম্বলিত সাময়িক পুস্তকের ("Indian Annul Register") রাজনৈতিক অংশ তিনি কয়েক বৎসর যাবৎ লিখিয়া দিয়াছিলেন। 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' রচনাকালে উহা হইতে অনেক তথ্য পাইয়াছিলাম। 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' হইতে বিদায় লইয়া তিনি অন্য কোন্ পত্রিকায় যুক্ত হইয়াছিলেন স্মরণ হইতেছে না।

সুরেশচন্দ্র বিপিনচন্দ্রের পরিবারের সঙ্গে একান্তভাবে মিশিয়া গিয়াছিলেন! প্রথম পরিচয়ের বহু বৎসর পরে বিপিনচন্দ্রের জীবিতকালেই তাঁহার এক

কন্যার পাণিগ্রহণ করেন সুরেশচন্দ্র। সুরেশচন্দ্রের অবারিত দ্বার; আমরা ক্রমে তাঁহার সহধর্মিনীর সঙ্গেও পরিচিত হইলাম। বিলাত যাত্রাকালে (১৯০৮) বিপিনচন্দ্র এই কন্যাটিকে সিস্টার নিবেদিতার নিকট রাখিয়া যান। তিনি নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়া সেবাব্রতে দীক্ষা লইলেন। নিবেদিতার স্কুলে তিনি কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। পরে ভারত স্ত্রীমহামণ্ডলের কর্মী হইয়াছিলেন। বিপিনচন্দ্র বিলাত হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া 'হিন্দু রিভিউ' প্রকাশ করিলে এই কন্যা অন্য কার্যের ফাঁকে ফাঁকে পিতাকে যথারীতি সাহায্য করিতেন। সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার যখন বিবাহ হয়, তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই তিনি লেডী অবলা বসুর নারী শিক্ষা সমিতির অধীন শিল্পভবনের কর্মে লিপ্ত হন। সুরেশচন্দ্রের মৃত্যুর পরেও তিনি এখনও পর্যন্ত নারী শিক্ষা সমিতির কর্মীরূপে তাহাতেই লিপ্ত রহিয়াছেন। তাঁহার নাম শ্রীযুক্তা অমিয়া দেব।

সুরেশচন্দ্রের সাংবাদিক জীবনের শেষ পনর বৎসর কাল বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। নিজ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, সুরেশচন্দ্র আদর্শ সাংবাদিক ছিলেন। এলাহাবাদস্থ 'লীডার' দৈনিকের প্রখ্যাত সম্পাদক সি. ওয়াই. চিন্তামণি একবার বলিয়াছিলেন সাংবাদিকের সর্বপ্রথম যে গুণটি থাকা আবশ্যক তাহা হইল 'অনুসন্ধিৎসা'। সুরেশচন্দ্রের ভিতরে এই 'অনুসন্ধিৎসা' দেখিয়াছি পূর্ণমাত্রায়। ছোট-বড় নানা ধরনের বই, পত্রপত্রিকা পুস্তকাবলী সকলের ভিতরেই তিনি জ্ঞাতব্য বস্তু যেন খুঁজিয়া পাইতেন। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়্যু' পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদকীয় লেখক হিসাবে তিনি কিছুকাল যাবৎ কার্য করিয়াছিলেন। কোথায় কোন্ কাগজের টুকরা পড়িয়া আছে, সুরেশচন্দ্র সে সমুদয় খুঁজিয়া বাহির করিতেন এবং তাহাতে কোথায় কি কথা আছে তন্ন তন্ন করিয়া পড়িতেন। অনেকসময় পাইতেন, অনেকসময় পাইতেন না। কিন্তু সবসময় সংশয়-বিবর্জিত খোলা মনে সকলই সংগ্রহ করিয়া তাহার মধ্যে কোথায় কি তথ্য বা যুক্তি পাওয়া যাইতে পারে তাহা দেখিতেন। অনেক সময় কাগজপত্র খুঁজিতে খুঁজিতে এমন টানা-হেঁচড়া করিতেন যে কাহারও কাহারও তাহা পছন্দ হইত না। কিন্তু এই মানুষটির মধ্যে অদম্য অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাইয়া আমরা কত যে মুগ্ধ হইতাম তাহা বলিবার নয়। এই অনুসন্ধিৎসা গুণটির চর্চা প্রায় প্রত্যেক সাংবাদিকেরই কর্তব্য। শেষ দশ বৎসর সুরেশচন্দ্র রক্তের চাপে ভুগিতে

ছিলেন। কোন কোন সময় দীর্ঘদিন তাঁহাকে শয্যাশায়ী থাকিতে হইত। তখন পড়াশুনা না করিয়া সময় কাটানো তাঁহার পক্ষে কি কষ্টকরই না হইত। রোগমুক্ত হইয়াই তিনি পুনরায় যেন তাঁহার স্বভাবে ফিরিয়া আসিতেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁহার জ্ঞানার্জন-স্পৃহা প্রবল ছিল। অজানাকে জানিয়া লইবার এমন ঐকান্তিক আগ্রহ ক্বচিৎ কখন দেখিয়া থাকিব। সাংবাদিকের অন্যতম গুণ তিক্তকষায় বা অম্লমধুর ক্ষিপ্র রচনা—তাহাও তাঁহাতে দেখিয়াছি যথেষ্ট। যেখানে কঠোরতা আবশ্যক সেখানে তিনি কঠোর হইতেন, যেখানে মৃদু ভর্ৎসনা দরকার সেখানে মৃদু ভর্ৎসনা করিতেন। যেখানে স্বাগত করা প্রয়োজন সেখানে স্বাগত করিতেন। কিন্তু ইহার দ্বারা আসল মানুষটিকে ধরা যাইত না।

সাংবাদিক জীবনের কঠোরতা সুরেশচন্দ্রের চিত্তকে আদৌ ম্লান করিতে পারে নাই। তিনি ছিলেন খুবই স্নেহপ্রবণ এবং প্রীতিপরায়ণ। আমরা কনিষ্ঠেরা তাঁহার নিকট হইতে যে কত স্নেহ-প্রীতি লাভ করিয়াছি, বলিয়া শেষ করিতে পারিব না। তিনি পরিচিত বন্ধুদের প্রত্যেকের বাড়ীতে গিয়া মধ্যে মধ্যে খোঁজখবর লইতেন। সুরেশচন্দ্র বর্তমান লেখকের বাসাবাটিতেও আসিতেন। তিনি কখনও শুধু হাতে আসিতেন না। কখনও বিস্কুট, কখনও লজেন্স, কখনও আখের খণ্ড—যা'হোক কিছু ছেলে মেয়েদের জন্য আনিবেনই। কৃষিতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রযত্নে কলিকাতায় কয়েক বৎসর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গ পল্লীমঙ্গল সমিতি চালু হইয়াছিল। আমরা অনেকে তাহার সভ্য হই। সুরেশচন্দ্রও একজন সভ্য ছিলেন। আমরা কলিকাতার উপকণ্ঠে কখনও কিছু দূরে সমিতির উদ্যোগে স্থানীয় অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে যাইতাম। মাঝে মাঝে সুরেশচন্দ্রও আমাদের সঙ্গে যাইতেন। কি নিজ গৃহে, কি অন্যত্র সকল স্থলেই সুরেশচন্দ্রের প্রীতিপরায়ণতা লক্ষ্য করিয়াছি। স্বাভাবিক সারল্য এবং প্রীতিপরায়ণতার নিমিত্ত তিনি ছোট-বড় সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। আমরা একবার সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানে সুরেশচন্দ্রের সঙ্গী হই—শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ ও বর্তমান লেখক। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের আহ্বানে আমরা যাই। আমরা সকালের দিকে ওখানে গেলাম, সতীশবাবু তখন ছিলেন না। তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত আমাদের স্বাগত করিলেন। দেখিলাম সুরেশচন্দ্রকে তাঁহারা কি শ্রদ্ধার চক্ষেই না দেখেন।

কিছুক্ষণ পরে সতীশচন্দ্র আসিলেন। তিনি তখন পঞ্চাশের মন্বন্তর লইয়া একখানি গ্রন্থ রচনায় লিপ্ত হইয়াছিলেন। কালীদা'র "Famines in India" বইখানি আগেই বাহির হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গেই বেশীর ভাগ সতীশবাবুর কথাবার্তা হইল আহারের পূর্বে ও পরে। আমরা বিকালে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

সুরেশচন্দ্র আমাদিগকে বিশেষ প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে নিরিবিলিতে থাকিবার নিমিত্ত তিনি কলিকাতা হইতে দশ মাইল উত্তরে 'বসুনগরে' (মধ্যমগ্রাম) বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছিবার অল্প কয়েকদিন পরেই তিনি ইহলীলা সংবরণ করেন। এই অল্প ক'য়দিনের মধ্যেই তিনি স্থানীয় অনেককেই প্রীতির বন্ধনে বাঁধিতে সক্ষম হন।

কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমাদের সকলের বিপ্লবী 'কিরণ-দা'। ছোট্ট বেঁটে মানুষটি, হাতে লাঠি চলনে বলনে কেমন একটা একগুঁয়ে ভাব। তিনি কাহাকেও তোয়াক্কা করেন না। বয়সে, কর্মনিষ্ঠায় তিনি সকলের উপরে; তাই তাঁহার মুরব্বিয়ানা প্রত্যেকেই মাথা পাতিয়া লন। যাহা ভাল বুঝিতেন তাহাই তিনি করিতেন। বিবেকের নিকট অন্য সকলই তুচ্ছ। এইরূপই ছিলেন সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ আমাদের কিরণ-দা।

কিরণ-দাকে প্রথমে দেখি দৌলতপুরে সেই ১৯২২।২৩ সনে তখন আমি বাগেরহাট কলেজের ছাত্র। কিরণ-দা বিপ্লবী, কিন্তু রচনাত্মক কর্মেও তিনি উৎসাহী ছিলেন। তরুণ ও ছাত্রদের প্রতি তাঁহার অগাধ স্নেহ। দৌলতপুর হিন্দু একাডেমীর ছেলেরা এবং আশেপাশের যুবকবৃন্দ তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। তাঁহার কথায় তাহারা ওঠে বসে। কিরণ-দা দৌলতপুর হিন্দু একাডেমীর অনতিদূরে রেল লাইনের পশ্চিম পার্শ্বে 'সত্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখানে যুবকবৃন্দের শরীরচর্চার জন্য ব্যায়ামাগার ছিল। চরখা, তাঁত ইত্যাদিও বোধ হয় ছিল। পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বৎসর পূর্বের কথা, আমরা একবার অল্প সময়ের জন্য মাত্র তথায় গিয়াছিলাম। সব কথা ঠিক ঠিক মনেও নাই। ঐ সময়কার কিরণচন্দ্রের অনুরক্ত ছাত্র-শিষ্যগণ দ্বারা আমার কথার যাথার্থ যাচাই করা যাইতে পারে।

কিরণচন্দ্র 'সত্যাশ্রম'-এ খুলনা জেলা জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে আহ্বান করিয়াছিলেন। সভাপতি পদে বৃত হন অধ্যক্ষ কামাখ্যাচরণ নাগ। কামাখ্যাবাবু তখন বাগেরহাট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বা অধ্যক্ষ, আমরা কলেজের ছাত্র। তিনি আমাদের কয়েকজন ছাত্রকে সঙ্গে করিয়া দৌলতপুরে আসিলেন, একথা পূর্বে বলিয়াছি। আমরা যথাসময়ে সত্যাশ্রমের প্রাঙ্গণে নীত হইলেই একটি খর্বকায় তেজস্বী মানুষ আমাদিগকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। প্রকৃতপক্ষে নির্দিষ্ট সভাপতি কামাখ্যাবাবুই তাঁহার লক্ষ্য, আমরা সঙ্গের ছাত্রেরা উপলক্ষ্য মাত্র। দেখিলাম তাঁহার হাফহাতা একটি কোর্তা গায়ে ঘাড়ের উপর দিয়া চাদর ঝুলিতেছে। পরনে মোটা খদ্দরের ধুতি, হাঁটুর অল্প নিম্নে লম্বিত। কামাখ্যা বাবুর সঙ্গে তাঁহার কত কথা ; কথায় তিনি মজিয়া গেলেন। মনে হইল যেন উভয়েই উভয়ের পূর্ব-পরিচিত। সভার কার্য সুষ্ঠুভাবে সমাধা হইল। কিরণ-দা কিছু বলিলেন, সভাপতি বক্তৃতা করিলেন ; সভার অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ, যেমন প্রস্তাবাদি ইত্যাদিও নিশ্চয়ই হইয়া থাকিবে। কিন্তু এত দিন পরে স্পষ্ট কিছুই মনে পড়িতেছে না।

ইহার পর দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের মধ্যে জাতীয় জীবনে বহু চড়াই-উৎরাই অতিক্রান্ত হইয়াছে। অসহযোগের পর বিপ্লবী প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছে। দুই দুইবার সত্যাগ্রহ আন্দোলন হইল, বিপ্লবীরা তাহাতে কায়মনে যোগ দিলেন। এই সময়কার ব্যর্থতার মধ্যেও পুনরায় বিপ্লব কার্য্যাবলী সংঘটিত হইতে থাকে। এই বিপ্লব কার্যকে সরকার নাম দিলেন 'টেরোরিজম' বা সন্ত্রাসবাদ। কোন কোন লেখক বিপ্লবের বদলে সন্ত্রাসন কথাটির ব্যবহার করিয়া বর্তমানেও যেন আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন। দ্বিতীয় সত্যাগ্রহের কয়েক বৎসর পরেই আসিল আগষ্ট বিপ্লব। বিপ্লবীরা এই সকল মুক্তি আন্দোলনেও একান্তভাবে যোগ দিয়াছিলেন। এই বিপ্লবীদের পুরোভাগে ছিলেন বর্ষীয়ান কিরণ-দা। দ্বিতীয় মহাসমর শেষ হইতে না হইতেই কারাগার হইতে বাহিরে আসিলেন রাজনৈতিক বন্দীরা। বিপ্লবীরাও একে একে কারামুক্ত হইলেন। কিরণ-দা সরস্বতী প্রেস ও সরস্বতী লাইব্রেরীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। যুদ্ধের ভিতরে কোন কোন সূত্রে উভয়ের কর্মকর্তাদের সহিত আমি পরিচিত হই। এই পরিচিতি শীঘ্রই বন্ধুত্বে পরিণত হইল।

কারামুক্ত হইয়া কিরণ-দা সরস্বতী প্রেসের উপরিতলে বাস স্থাপন করিলেন। তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত উপরে উঠিলে তিনি প্রথম আলাপেই

আমাকে একেবারে আপন করিয়া লন। তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন, বিভিন্ন সময়ে কারাগারে তাঁহার উপর কতই নিপীড়ন হইয়াছে। শরীরের কোন কোন অঙ্গ একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি নিজের কথা খুব কম বলিতেন। বিভিন্ন প্রশ্ন উত্তরের ফাঁকে ফাঁকে যেন ইহার কিছু কিছু বাহির হইয়া যাইত। তখন তাঁহার আহারাদিও নিয়মিত, আমি যাইতেই ঔষধস্বরূপ কিছু খাইতে দেখিলাম। কিরণ-দা নিজের কথা মোটেই বলিতে চাহিতেন না। তাঁহার সমবয়সী কর্মীরা এখন প্রায় অন্তর্হিত; কাজেই তাঁহার কর্মময় জীবনের অনেকটাই অজানা থাকিয়া যাইবে। গত তিন-চার বৎসর যাবৎ কিরণ-দার মৃত্যুদিনে স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হইতেছে। দেখিয়াছি, প্রায় বক্তাই বলেন, কিরণ-দা নিজেকে একান্ত ভাবে গোপনে রাখিতেন, নিজের সম্বন্ধে কথাবার্তা কিছুই বলিতে চাহিতেন না। তথাপি পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে এখনও কিছু কিছু জানা সম্ভব। ইহারই বা রেকর্ড বা নজীর কোথায়?

কিরণ-দা যশোহর জিলার ভুগিলহাট গ্রামের অধিবাসী। ইহা একটি গণ্ডগ্রাম। এখানকার ভট্টাচার্যেরা খুবই প্রসিদ্ধ। ভট্টাচার্য বংশের এক ভদ্রলোকের মুখে শুনিয়াছি—তাঁহার বয়স ষাট হইবে—তাঁহারা শৈশবে নূতন নূতন লোকের মুখ দেখিতেন। ইহারা নদীপথে নৌকায় আসিতেন, আবার নৌকায় চলিয়াও যাইতেন। পরে শুনিয়াছেন, ইহারা কিরণচন্দ্রের চেলা। একবার কিরণ-দা'র বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হইবার জন্য সরকার পক্ষে কি উদ্যোগই না হইয়াছিল। কিরণচন্দ্র গ্রামবাসীর চিত্ত এতই জয় করিয়াছিলেন যে, কেহই তাঁহার বিরুদ্ধে যান নাই। এজন্য সরকারের হস্তে গ্রামবাসীদের কম নির্যাতন ভোগ করিতে হয় নাই। কিরণ-দার কর্ম ও জীবন সম্পর্কে এই রকম ছিটেফোঁটা খবর যাহা পাওয়া যায় তাহাই লিখিয়া রাখা ভাল। কিরণচন্দ্র প্রথম যৌবনেই বিপ্লবী দলের সংস্রবে আসেন। তিনি দ্বারে দ্বারে 'যুগান্তর' বিক্রী করিতেন। ক্রমে বিপ্লবীদলের মধ্যে দুইটি দলের উদ্ভব হয়। একেবারে গোড়াকার অনুশীলন সমিতির নামে অনুশীলন দল এবং যুগান্তর পত্রিকার নামে যুগান্তর দল। কিরণ-দা শেষোক্ত দলের অনুরক্ত হইয়া পড়েন। ১৯১০-৪৫ এই পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে অন্যূন ত্রিশ বৎসর কাল কিরণচন্দ্র কারাগারে ইংরেজ সরকারের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু সময় বাহিরে থাকিতেন ততটুকু সময়ই বিভিন্ন সংগঠন-

মূলক কার্যে ব্যাপৃত হইতেন। তাঁহার সকল কার্যই কর্তৃপক্ষ সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। যখনই যে কোন আন্দোলন উপস্থিত হইত তখনই কিরণ-দা'র উপরে সরকারের রোষকষায়িত লোচন পড়িত, তিনি তাহাদের মনে এমনই ভীতির সঞ্চার করিয়াছিলেন। এত ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যেও কিরণচন্দ্রর মনের সরসতার হানি ঘটে নাই। তাঁহার মন ছিল সাহিত্যধর্মী। সরস্বতী প্রেস ও সরস্বতী লাইব্রেরির কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি একাত্ম হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহার নিমিত্ত তাঁহার প্রযত্ন ও দরদ সর্বজনবিদিত।

যুদ্ধান্তে কারামুক্তির পর বর্তমান সরস্বতী প্রেস ভবনের উপরিতলে তাঁহার সঙ্গে অল্প আলাপেই বুঝিলাম কিরণ-দা আমার জাতীয়তামূলক গ্রন্থ ও রচনাদির সহিত পরিচিত। যুদ্ধের সময় এখান হইতে প্রকাশিত 'মন্দিরায়' প্রায় দেড় বৎসর ধরিয়া 'জাতি বৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ' উন্মেষের রীতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখি। মন্দিরার তৎকালীন কর্ণধার ছিলেন শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়। ঐ সময় মন্দিরার বিশিষ্ট লেখকবৃন্দ কারাগারে ছিলেন। কিরণ-দা আমার এই প্রবন্ধগুলিও পাঠ করিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম। কতকাল আগে তাঁহাকে একবার মাত্র দেখিয়াছি। এবারে তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াই একেবারে তাঁহার আত্মীয় বনিয়া গেলাম। ইহার পর হইতে তাঁহার স্নেহপ্রীতি অযাচিত ভাবেই লাভ করিতে থাকি। প্রতি শনিবার তিনি প্রেস বাড়ীর নিম্নতলে বসিয়া আমাদের একটি করিয়া লজেন্স দিতেন। ঐ দিনটি আমাদের বড় প্রিয় ছিল। লজেন্স একটি তো পাইতামই, তাঁহার হাত হইতে দ্বিতীয়বার পাইতেও কম চেষ্টা করি নাই। এই চেষ্টা সফল হইলে কতই না আনন্দ হইত আমাদের!

১৯৪ সনে ব্রিটিশ জাতি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইল, আমরা স্বাধীন হইলাম। কিন্তু স্বাধীনতাকে সার্থক করিতে হইলে বিবিধ বিষয়ে যে পরিষ্কার জ্ঞান থাকা আবশ্যক কিরূপে তাহা অর্জন করা সম্ভব? কিরণ দা তরুণ সমাজকে যোগ্য নাগরিক ও কর্মকুশল করিতে চান। ইহার বহুতর উপায় আছে; একটি হইল পাঠাগার। এখানে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, জ্ঞান-বিজ্ঞান-মূলক বিবিধ গ্রন্থ সংগৃহীত হইবে যুবক ছাত্রদের পাঠের নিমিত্ত। তিনি এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কলিকাতা গোলদীঘির উত্তর দিকে একটি ভবনের দ্বিতলে 'প্রজ্ঞানানন্দ পাঠাগার' স্থাপন করেন। এই পাঠাগারের জন্য

তিনি কত রকম চেষ্টা করিয়াছেন নিকট ও দূর হইতে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাঁহার তাজা সাহিত্যধর্মী মন সাহিত্যিকগণকে তাঁহার নিকট আকৃষ্ট না করিয়া পারিত না। স্মৃতিসভায় সাহিত্যিক-সমাগম এবং বিভিন্ন সাহিত্যিকের বক্তৃতা হইতেও তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 'প্রজ্ঞানানন্দ পাঠাগার'টিকে কেন্দ্র করিয়া আবার একদল তরুণ কিরণদার সঙ্গে আসিয়া মিলিত হন। তাঁহাদের কাহাকেও কাহাকেও আমি জানি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, অথচ কত বিনয়ী। অধিগত বিষয়ের নির্দিষ্ট কুঠরীর মধ্যে না থাকিয়া তাহা ব্যাপকতর হইবে, আবার সমাজের কল্যাণেও তাহা সরাসরি প্রযুক্ত হইবে—এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই কিরণ দা পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পাঠাগারের পাঠক-সভ্যদের দেখিয়া এই আদর্শসিদ্ধির বিষয়ে অনেকটা নিঃসন্দেহ হইয়াছি। বর্তমানে জগতে স্বাধীনতা মানে ঘরকুনো হইয়া থাকা নয়, দেশ-বিদেশের হালচাল জানিয়া নিজেদেরও তৈরী করিয়া লইতে হইবে, যাহাতে আমরা বাহিরের জগতের সঙ্গে সমান তালে চলিতে পারি। 'প্রজ্ঞানানন্দ গাঠাগার' সাধারণের শিক্ষার জন্য নয়। সাধারণকে যাহারা শিক্ষিত করিয়া সুপথে চালনা করিবেন তাঁহাদের শিক্ষাদানের নিমিত্তই 'প্রজ্ঞানানন্দ পাঠাগার'। ইংরেজীতে একটি কথা আছে "Educate your leaders"—নেতাদের শিক্ষিত কর; কিরণদা'র উদ্দেশ্য ছিল ঠিক অনুরূপ। তাঁহার মৃত্যুর পর পাঠাগারটির স্থায়িত্ব সম্পাদনের আয়োজন হইয়াছে শুনিয়া আশ্বস্ত হইয়াছি।

দৃঢ়চিত্ততা এবং কষ্ট-সহিষ্ণুতা এই দুইটির মহৎগুণের অধিকারী ছিলেন আমাদের কিরণদা।

কিরণচন্দ্রের কষ্ট সহিষ্ণুতা তো ইতিহাসের বস্তু হইয়া আছে। কারাগারে বিভিন্ন সময়ে তাঁহার শরীরের উপরে বিস্তর নির্যাতন হইয়াছিল। আমি তাঁহার কষ্ট-সহিষ্ণুতার সামান্যমাত্র পরিচয় দিতে পারি নিজ অভিজ্ঞতা হইতে। গোলদীঘির সন্নিকটে রাস্তায় পড়িয়া গিয়া ভীষণ আঘাত পাইয়াছেন। শুনিয়া শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়ের সঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে গেলাম একটি বাড়ীর ত্রিতলে। তিনি চোটের কথা বলিতেই চাহেন না। মুখে আগের মত মৃদু হাসি—একথা সেকথা কত কি বলিলেন। আমাদের বুঝিতেই দিলেন না তাঁহার আঘাত কতখানি লাগিয়াছে। পরে শুনিয়াছি ইহা সামলাইয়া উঠিতে তাঁহার বেশ কিছু সময় লাগে।

তিনি প্রাণপ্রিয় সরস্বতী প্রেসভবন ছাড়িয়া অকস্মাৎ অন্যত্র চলিয়া গেলেন। আর সেখান হইতে ফিরিয়া আসেন নাই। তাঁহার জীবনের শেষ কয়দিন কাটে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। কি অসহ্য যন্ত্রণা ! কিন্তু তাহা যেন কিছুমাত্র তাঁহাকে স্পর্শিতেছে না। অনবরত হাসিমুখে আমাদের সঙ্গে কথা বলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। শ্মশানে দলমতনির্বিশেষে বহু ব্যক্তি সমবেত হইলেন। কিরণ-দা ছিলেন সকল মতবিরোধের ঊর্ধ্বে। এমন চিরকুমার ত্যাগব্রতী সাধক সন্ন্যাসীর তিরোধানে আমরা সকলেই মর্মাহত হইলাম। তাঁহার আদর্শ অক্ষুণ্ণ থাকুক এই প্রার্থনা।

রাধাচরণ চক্রবর্তী

গৃহের অঙ্গনে শিউলি ফুল ফোটে, কিছুক্ষণ গন্ধ ও মাধুরী ছড়াইয়া শুকাইয়া যায়। ফোটে অসংখ্য, কিন্তু সকলই ক্ষণস্থায়ী। এইরূপে ছেলে-বেলায় প্রবাসীর পাতায় দু' লাইনের কবিতা দেখিতাম অনেক। পড়িতাম, পড়িবার সময় বেশ ভাল লাগিত। কিন্তু পরে আর মনে থাকিত না। এই দু' লাইনের কবিতাগুলির রচয়িতা দু'জনা—রাধাচরণ চক্রবর্তী ও চণ্ডীচরণ মিত্র। মিত্রজাবহু পূর্বে মারা গিয়াছেন। সে যুগে সাহিত্যিক হিসাবে তিনি বেশ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। রাধাচরণ চক্রবর্তী গত হইয়াছেন প্রায় পনের বৎসর পূর্বে। তাঁহার কথা বোধহয় এখন লোকে অল্পই জানেন। যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেন জানিতেন তাঁহারা কি তাঁহাকে স্মরণ করেন ? কি জানি কেন কবি রাধাচরণ আমার চিত্তে একটি বড় স্থান অধিকার করিয়া আছেন। একটি কারণে তাঁহার নিকট আমি বড়ই কৃতজ্ঞ। কি কারণ ক্রমে বলা যাইবে।

রাধাচরণ ছোট কবিতা লিখিতেন, বড় কবিতাও লিখিতেন নিশ্চয়ই। কিন্তু ক্ষুদ্র শিউলি ফুলের মত তাঁহার দু'লাইনের শিশু কবিতাগুলিই প্রথমে আমাকে তাঁহার কবি-মানসের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেয়। তাঁহাকে চাক্ষুষ দেখি বহু পরে, তখন আমি 'প্রবাসী' 'মডার্ণরিভিয়ু'র সম্পাদকীয় বিভাগে কর্মে লিপ্ত হইয়াছি। রাধাচরণ মাঝে মাঝে প্রবাসী আপিসে আসিতেন। ঐ সময় তিনি বঙ্গলক্ষ্মী সম্পাদনায় লিপ্ত ছিলেন। 'বঙ্গলক্ষ্মী' মাসিক পত্রিকা ; গুরুসদয় দত্তের সরোজনলিনী মহিলা সমিতির মুখপত্র। সম্পাদক হিসাবে রাধাচরণ চক্রবর্তীর নাম থাকিত কিনা মনে নাই তবে তিনিই আসলে উহা

সম্পাদনা করিতেন একথা শুনিতাম। বেঁটে মানুষটি, রং ফরসা, কথা কম বলেন, কিন্তু দৃষ্টি তীব্র ; চলনে বলনে কি রকম একটা কবিসুলভ চাঞ্চল্য বা অস্থিরতা, মুখে হাসি লাগিয়াই আছে। বঙ্গলক্ষ্মী তখন বেশ জাঁকালো হইয়া উঠিয়াছিল। ভাল ভাল লেখকের রচনায় ইহা পুষ্ট হইত। বুঝিতাম রাধাচরণ বাবুই ইহা সংগ্রহ করিতেন। প্রথম যুগের ফাইলগুলি খুবই মূল্যবান। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ হইতে অ-নামী পত্রিকার মত স্থানাভাবের অজুহাতে "weed out" করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। পরে দেখিয়াছি কোন কোন খ্যাতিমান লেখকও বঙ্গলক্ষ্মীর পুরাণো ফাইল দেখিবার জন্য আঁকুপাঁকু করিতেছেন। রাধাচরণ বাবুর সময়েই বঙ্গলক্ষ্মীর সহকারী সম্পাদকরূপে আসিয়া যোগ দেন শ্রীযুক্ত ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়। তিনিও কবি কিন্তু বর্তমানে কয়েকখানি উপন্যাস রচনা করিয়া নাম করিয়াছেন। তিনি রাধাচরণের সম্পাদনা কার্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে পারিবেন।

রাধাচরণ 'বঙ্গলক্ষ্মী' কবে পরিত্যাগ করিলেন বলিতে পারিব না। সে অনেক দিনের কথা, হয়ত তখন শুনিয়া থাকিব, এখন কিন্তু সঠিক মনে নাই। কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল রাধাচরণ বাবুকে দেখি নাই অনেক দিন। আমার কর্ম জীবনেই কত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। প্রবাসী হইতে দেশ সাপ্তাহিকে চলিয়া যাই। সেখানে দুই তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। একদিন মেসে বসিয়া আছি, দেখি রাধাচরণ বাবু হঠাৎ আমার নিকট আসিলেন। কুশলবার্তা বিনিময়ের পর তিনি বলিলেন "আমি একটি ছেলেদের কাগজের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছি ; আপনাকে এই কাগজে কিছু লিখতে হবে।" আমি তো অবাক! আমি লিখি বটে কিন্তু ছেলেদের জন্য তো কিছু লিখি নাই। তিনি বলিলেন "যোগেশ বাবু আপনি আমার কাগজে লিখুন, মনে করলেই ছেলেদের মত করে আপনি লিখতে পারবেন।" তাঁহার কথায় বুঝিলাম তিনি আমার লেখার সঙ্গে পরিচিত। প্রবাসীতে থাকিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণায় লিপ্ত হই। আবার ওখানে থাকিতেই বৈদেশিক রাজনীতি সম্পর্কে কিছু কিছু লিখিতে সুরু করি। তখন আবিসিনিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ইটালি সৈন্য পাঠাইয়া নিরস্ত্র আবিসিনিয়া ক্রমে দখল করিয়া লইতেছে। নানা পত্র পত্রিকা এবং পুস্তকাদি পাঠ করিয়া আবিসিনিয়া দেশ ও হাবসি জাতি সম্পর্কে কত প্রবন্ধ তখন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লিখিয়াছিলাম। কেহ কেহ প্রধানত এই প্রবন্ধগুলির উপর নির্ভর করিয়া

পুস্তক লিখিয়াছিলেন ; কেহ ঋণ স্বীকার করিতেন, কেহ বা করিতেন না। আলাপে বুঝিলাম, রাধাচরণ বাবু শুধু আমার লেখার সঙ্গে পরিচিত নন তিনি এগুলি বিশেষ অনুধাবনও করিয়াছেন। আমি ছেলেদের জন্য এ যাবৎ কিছু লিখি নাই তাহা সত্ত্বেও তাঁহার পীড়াপীড়িতে অগত্যা রাজী হইলাম। তাঁহার কাগজে ছেলেদের মত করিয়া প্রথম লিখিলাম। যতদূর মনে হইতেছে লেখাটি ছিল লেনিন সম্বন্ধে। হিটলারের জীবনীও বোধ হয় পরে লিখিয়াছিলাম।

কিছুকাল যায়। দেখি রাধাচরণ বাবু পুনরায় আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, নানা কারণে ঐ কাগজের সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার সম্পাদনায় আর একখানি মাসিক বাহির হইয়াছে নাম "অত্রি"। এখানি নিছক ছেলেদের কাগজ নয়। বড়দের লেখা ইহাতে চলিবে। আমি সম্মত হইলাম। মুসোলিনীর আত্মজীবনী (ইংরেজী) পড়িয়াছিলাম। পড়িতে পড়িতে মুগ্ধ হইয়া যাই। মুসোলিনী আদতে সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। তাহার রচনা সাহিত্যিক প্রসাদগুণে পরিপূর্ণ। ইংরেজী অনুবাদ এত ভাল, না জানি মূল ইহা অপেক্ষা আরও কত চমৎকার। আর একখানি আত্মজীবনী পরে পড়িয়াছিলাম ট্রট্স্কীর "My life" কত ভাল লাগিয়াছিল ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না। মুসোলিনীর আত্মজীবনীতে প্রথম পড়িলাম… "Music of the Machine" বা যন্ত্রের তানলয় সমন্বিত সঙ্গীত। মুসোলিনী এখানেও সঙ্গীত শুনিয়াছিলেন। পড়িবার সময় পাঠকও যেন এই সঙ্গীত শুনিতে পান। নূতন পরিবেশে ভারতবর্ষে তো যন্ত্রের ছড়াছড়ি। মুসোলিনী ভুল করিয়াই রাষ্ট্রনেতা হইয়াছিলেন। আর ইহাই তাঁহার সাহিত্যিক-মানসের অপমৃত্যু ঘটাইল। তিনি রাষ্ট্রনেতা না হইলে বিশ্ব সাহিত্য কতই না সমৃদ্ধ হইতে পারিত। মুসোলিনীর সংক্ষিপ্ত জীবন-কথাও পড়িয়াছি একখানি ইংরেজী বইয়ে। এখানি সমসাময়িক রাষ্ট্র-নেতাদের জীবনী গ্রন্থ। রাধাচরণ বাবুর 'অত্রি' পত্রিকায় মুসোলিনী শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিলাম। তিনি বড় খুশী হইলেন।

ঐ সময়ে শুধু লিখিতাম। পুস্তক প্রকাশিত করিব ইহা কখনও ভাবি নাই। ছেলেদের পাঠোপযোগী কয়েকটি জীবনী প্রবন্ধ ইতিমধ্যেই লেখা হইয়াছে। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র একদিন বলিলেন "এগুলি দিয়ে তো বেশ একখানি বই হয়। বই প্রকাশ করুন না।" শিশুসাহিত্য লিখিয়া খগেন্দ্রবাবু তখনই বেশ নাম করিয়াছেন। বড়দের জন্যও তিনি গল্পাদি

লিখিতেন। তবে শিশু মনোহারী গল্প রচনায়ই তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তিনি একদিন তাঁহার জানা প্রকাশকের নিকট আমাকে লইয়া যান। প্রকাশক পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তুর কথা শুনিয়াই পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু তাঁহার একটি মস্ত বড় 'ফ্যাড্'—চলিত ভাষায় সব লিখিতে হইবে। আমি 'বাঙ্গাল' মানুষ, কলকাতা বা রাঢ়ের চলিত ভাষায় লেখা কি আমার কাজ? যা' হোক করিয়া লেখাটি চলিত ভাষায় রূপান্তরিত করিলাম। পাঠ করিয়া বুঝিলাম বিপদ উৎরাইতে পারিয়াছি। এই প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত আমার কয়েকখানি ছেলেমেয়েদের বই একে একে লিখিলাম। "সাহসীর জয়যাত্রা" নামে এই জীবনী প্রবন্ধগুলি গ্রথিত হইয়া প্রথম বাহির হইল। তখন স্বতঃই মনে হইতেছিল রাধাচরণ বাবুর কথা "আপনি মনে করলেই ছেলেদের উপযোগী করে লিখতে পারবেন।" 'সাহসীর জয়যাত্রা' বইয়ের ভূমিকায় রাধাচরণ বাবুর কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিলাম। এই বইখানির এক সময় খুব কাটতি হইয়াছিল। বইখানি এখন আর চালু নাই। এ কারণ রাধাচরণ বাবুর কথা এখানে বিশেষ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম। খগেন্দ্রবাবু কীর্তিমান, তাঁহার সাহিত্য-সাধনা এখনও সবেগে চলিতেছে। এ প্রসঙ্গে তাঁহার প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

অত্রি বেশি দিন টিকিল না। ইহার পর রাধাচরণ বাবু কোন পত্রিকার সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না; মাঝে মাঝে তাঁহাকে দেখিতাম, খুবই শীর্ণ, কাপড়চোপড়ও জীর্ণ। বুঝিতাম তিনি অত্যন্ত বিপদের মধ্য দিয়া চলিতেছেন। কিন্তু মুখের হাসিটি আগেকার মত লাগিয়াই ছিল। একবার শুনিলাম তিনি কতকগুলি বদভ্যাসও করিয়া ফেলিয়াছেন। বিপদ কখনও একাকী আসে না। পরে শুনিলাম, রাধাচরণ চক্রবর্তী আর ইহজগতে নাই। রাধাচরণের জীবনটাও ছিল ঐ শিউলি ফুলের মত। অবস্থা বিপর্যয় না ঘটিলে তিনি দীর্ঘকাল বঙ্গবাণীর সেবা করিতে পারিতেন। কিন্তু দুঃখ করিয়া আজ আর লাভ নাই।

বটুকদেব মুখোপাধ্যায়

বটুকদেব মুখোপাধ্যায়কে অনেকে হয়ত জানেন না। তাঁহার নাম খুব কম লোকেই শুনিয়া থাকিবেন। এই কম-জানা স্বল্প পরিচিত ব্যক্তিটি আমার মনে

এক গভীর ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিয়া রাখি।

মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম শুনেন নাই বাংলাদেশে এরূপ লোক বিরল। ভূদেববাবু শেষ জীবনে চুঁচুড়ায় গঙ্গাতীরে স্বগৃহে কাটাইয়াছেন। ঐ সময় একবার কিছুকালের নিমিত্ত বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বাড়ীর অনতিদূরে বাসাবাটিতে অবস্থান করিতেছিলেন। উভয় পরিবারে তখন খুবই ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ভূদেববাবুর দুই পুত্র—গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় ও মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়। বটুকদেব গোবিন্দদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বটুকদেবের বার তের বৎসর বয়সে পিতামহের মৃত্যু হয়। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, পিতামহ নাতি-নাতিনীদের লইয়া নানারূপ গল্পগুজব করিতেন। তাঁহার গল্পের মধ্যে কত উপদেশ। তাঁহাদের শৈশব ও কৈশোরের শিক্ষার ভার লইয়াছিলেন পিতামহ ভূদেব।

ভূদেব বাবুর একটি সুসমৃদ্ধ পারিবারিক গ্রন্থাগার পৌত্র বটুকদেব সযত্নে আগলাইয়া রাখিয়াছিলেন। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য তখন চুঁচুড়ায় বাসাবাটীতে সপরিবারে অবসর জীবন যাপন করিতেছিলেন। তিনি ছিলেন ভূদেব লাইব্রেরী ও আমাদের যোগসূত্র। দীনেশবাবু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই গ্রন্থাগার হইতে নিজ দায়িত্বে অনেক বইপত্র আনিয়া দিতেন। ক্রমে তাঁহার মারফত আমিও কিছু কিছু আনাইতে থাকি। ১৯৪৪ কি ৪৫ সন হইবে, হিন্দুমেলার মালমশলা সংগ্রহের জন্য "সাধারণী" সাপ্তাহিক দেখিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। সে যুগের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার চুঁচুড়া হইতে 'সাধারণী' সম্পাদনা করিতেন। আগে দীনেশ বাবুর দ্বারা তাঁহার পুত্র শ্রীযুত অজরচন্দ্র সরকারের গৃহে 'সাধারণী' দেখিতে যাই। 'সাধারণীর' ফাইল দেখিয়া অধ্যাপক দীনেশচন্দ্রের বাড়ীতে মধ্যাহ্ন ক্রিয়া সমাপন করি।

এইবার ভূদেব লাইব্রেরী দেখার সময় করিয়া উঠিতে পারি নাই। দ্বিতীয়-বারে শুধু ভূদেব লাইব্রেরী দেখিবার উদ্দেশ্যেই চুঁচুড়ায় গেলাম। ইতিমধ্যেই এই গ্রন্থাগারের কিছু কিছু বই দীনেশবাবুর সহায়তায় আনাইয়া লইয়াছিলাম। বটুকদেব একথা জানিতেন। তাঁহার বাটীতে গ্রন্থাগার দেখিতে যাইব, বটুকবাবু একথা দীনেশচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছিলেন। নির্দিষ্ট দিনে চুঁচুড়ায় গেলাম। যতদূর মনে হয় তখন চৈত্র মাস। রোদের খুব প্রখরতা। দুপুর

বেলা আহারে বসিয়াছি, এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক গলদ্‌ঘর্ম হইয়া আসিয়া নিম্নতলে যে ঘরে বসিয়া আমরা আহারে লিপ্ত সে ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন; ঢুকিয়াই ঐ ঘরে রক্ষিত তক্তপোষে শুইলেন বিশ্রামের জন্য। দীনেশচন্দ্র স্বাভাবিক মৃদুস্বরে তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। তখন জানিলাম ইনি ভূদেববাবুর পৌত্র বটুকদেব মুখোপাধ্যায়। আমরা তো গ্রন্থাগার দেখিতে যাইবই তবু তিনি কেন অত রৌদ্রে কষ্ট করিয়া আসিলেন বলায় মৃদু হাসিয়া বলিলেন "এমন কি কষ্ট হয়েছে, মন বল্‌ল তাই চলে এলাম!" আহারাদি সারিয়া খানিক বিশ্রামান্তে আমরা একযোগে ভূদেব ভবনের দিকে চলিলাম; মনে হইল তীর্থ দর্শনে যাইতেছি।

ভূদেব ভবনের দ্বিতলে গ্রন্থাগারটী সংরক্ষিত। পারিবারিক গ্রন্থাগার ইতিপূর্বে যতগুলি দেখিয়াছি তাহার মধ্যে এটি শুধু সমৃদ্ধই নয়, সযত্নে রক্ষিত দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। দীনেশবাবু ঘুরিয়া ঘুরিয়া গ্রন্থাগারটি আমাকে দেখাইলেন। এখানে এমন কিছু বই ও পত্র পত্রিকা আছে যাহা ভূ-ভারতে কোথায়ও আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। দীনেশবাবু বলিলেন হয়ত লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে থাকিতে পারে। কিন্তু এদেশে কোথায়ও পাওয়া যাইবে না। ভূদেববাবু এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক ছিলেন দীর্ঘকাল। প্রথম দিককার বহু বৎসরের ফাইল ভাল বাঁধাই অবস্থায় এখানে পাইবেন। আরও এমন কতকগুলি পত্রিকার ফাইল এখানে রক্ষিত হইয়াছে যাহা অন্য কোথায়ও পাওয়া আর সম্ভব নয়। হিন্দুমেলার প্রথম দিককার ইতিহাস রচনায় এই সকল পত্র পত্রিকার ফাইল হইতে বিস্তর উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি। এ বিষয়ে আরও কিছু পরে বলিব।

নৈহাটির পথে কলিকাতায় ফিরিব। ও-পথে এই নূতন যাইতেছি। গঙ্গা পারাপার হইতে হইত খেয়ানৌকায়। লঞ্চ চালু হইয়াছে এই সবে ক'বৎসর মাত্র। বটুকদেব ও দীনেশচন্দ্র খেয়া ঘাটে আসিলেন। আমি নৌকায় উঠিতে যাইব এমন সময় বটুকদেব বলিলেন "আমিও আসি। নৈহাটীতে খুড়িশাশুড়ীকে একবার দেখে আসব।" মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পর্কে তাঁহার খুড়শ্বশুর এইরূপ যেন আমাকে বলিয়াছিলেন। গঙ্গা পার হইয়া বটুকদেব আমার সঙ্গে বরাবর আসিলেন। তিনি আমার হইয়া টিকিট কিনিলেন। ওভার ব্রীজ পার হইয়া নির্দিষ্ট প্লাটফরমে আমাকে লইয়া গেলেন। গাড়ী তখনই প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া। তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে

ছুটিয়া গিয়া আমার হাত ধরিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন ; বটুকদেব যদি আমার সঙ্গে না থাকিতেন তাহা হইলে ঐ সময় তাড়াতাড়ি গিয়া গাড়ী ধরা আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব হইত না। সারাপথ বটুকদেবের সৌজন্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি ফিরিলাম। খুড়ি-শাশুড়ীকে দেখা তো উপলক্ষ্য ; তাঁহার লক্ষ্য ছিলাম আমি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে, কি প্রবাসী আপিসে ঠিক স্মরণ নাই একদিন দীনেশবাবু আমাকে বলিলেন বটুকদেব বলিয়াছেন, এবারে যেদিন চুঁচুড়ায় যাইব তাঁহার সঙ্গে বসিয়া তাঁহারই বাড়ীতে আহারাদি শেষ করিতে হইবে। বটুকবাবুর অনুরোধ অপর পক্ষে আদেশ। সানন্দে তাঁহার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। চুঁচুড়া তো আমার নিকট তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। সেখানে রহিয়াছেন সুপণ্ডিত দীনেশচন্দ্র আর সৌজন্যের প্রতীক বটুকদেব। চুঁচুড়ায় গেলে বরাবর দীনেশবাবুর বাড়ীতেই প্রথমে উঠিতাম। এবারেও গেলে দীনেশবাবুর বাড়ী হইতে ভূদেব ভবনে তাঁহার সঙ্গে যাই। নিজের কার্য সমাপনান্তে বটুকদেব, তাঁহার পুত্র ও আমি একসঙ্গে আহার কার্য সমাধা করিলাম। তিনি প্রসঙ্গতঃ তাঁহার প্রথম জীবনের কথা বলিলেন। বটুকদেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। রসায়নে প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া তিনি এম, এ পাস করিয়াছিলেন। যতদূর স্মরণ হয় তখন এম-এস-সি হয় নাই। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক হন। পত্নীবিয়োগের পর তিনি কর্মত্যাগ করিয়া চুঁচুড়ায় ফিরিয়া আসেন। ইহার পর আর কোন কাজে লিপ্ত হইয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না।

ঐ দিন আহারান্তে তাঁহার একটি বিশেষ হবির কথা প্রথম জানিলাম। দেশ বিদেশের ডাক টিকেট সংগ্রহ করা এদেশের অনেকের তখন হবি বা বাতিক (অবশ্য ভাল অর্থে) হইয়া উঠিয়াছে। এ সম্বন্ধে কিছু কিছু লেখা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বাহির হইতে দেখিয়াছি। বটুকদেব বিজ্ঞানের ছাত্র। তিনি ডাক টিকিট সংগ্রহ করিয়াই নিরস্ত হন নাই। তিনি বৈজ্ঞানিক উপায়ে ঐ সকল সাজাইয়া রাখিয়াছেন। এমন সুন্দর করিয়া সাজান যে দেখিলে চোখ জুড়ায়। তিনি বহু দেশের রকমারি ডাক টিকেট আমাকে দেখাইলেন। তাঁহার পুত্রও এ বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ডাক টিকেট সম্পর্কে তিনি অনেক লিটারেচার সংগ্রহ করিয়াছেন। একখানি বড় বই আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, এখানা ডাক টিকিটের অভিধান—ডাক

টিকিটের জন্মকথা, ক্রমিক বিবর্তন, উন্নতি, বর্তমান রূপ—কত কি কথা ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। আবার ডাকটিকিটের ছবিও দেখিলাম প্রচুর। এই হবি বা বাতিক্‌কে বটুকদেব নিতান্তই সহজ করিয়া লইয়াছিলেন। আমাকে সব দেখাইতে ও বুঝাইতে তাঁহার কতই না আনন্দ! তাঁহার কথা মনে হইলেই অন্যান্য বিষয়ের মত তাঁহার ডাক টিকেট সম্পর্কে আন্তরিক আগ্রহের কথাও মনে স্বতঃই উদিত হয়। দীনেশবাবুকে পরে তাঁহার এই ডাক টিকেট হবির কথা বলিয়াছিলাম। তাঁহাকে মৌন থাকিতে দেখিয়া বুঝিলাম তিনিও এ বিষয়ে জানেন।

বটুকদেবের আগ্রহাতিশয়ে ভূদেব স্মৃতি সভা অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। প্রথম প্রথম এই সভাটি নিম্নতলের একটি প্রশস্ত কক্ষে হইত। একবার সভাপতিত্ব করেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী। বটুকদেবের আমন্ত্রণে আমিও সভায় যোগ দিয়াছিলাম। দীনেশবাবু ভূদেব গ্রন্থাগার হইতে একখানি বই আনিয়াছিলেন। বইখানির নাম মনে নাই। বোধ হয় সিন্ধু-অভিযান সম্পর্কে কোন ইংরেজ ঐতিহাসিক কর্তৃক ইংরেজীতে লিখিত। ভূদেব বাবু বইখানি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছিলেন এবং প্রতি পৃষ্ঠার মার্জিনে নিজ মন্তব্য লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। দীনেশবাবু এই মন্তব্যগুলির কিছু কিছু পাঠ করিয়া ভূদেবের অনুসন্ধিৎসা ও স্বাধীন চিত্ততার পরিচয় দিলেন। সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় নিজ ভাষণে আমাদিগকে অনেক নূতন কথা শুনাইলেন। তিনি সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন কাশীতে। ভূদেব প্রতিষ্ঠিত বিশ্বনাথ-ট্রাষ্ট হইতে বৃত্তি পাওয়ায় কাশীতে তাঁহার পক্ষে অবস্থান এবং অধ্যয়ন সম্ভব হইয়াছিল। বিশ্বনাথ ট্রাষ্টের কল্যাণে কত ছাত্র যে সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য অধিগত করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। সভা অন্তে আমরা স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেলাম। এখন ভূদেব স্মৃতি সভা একটু জাঁকাল রকমের হইয়া উঠিয়াছে। দুই বৎসর পূর্বে পুনরায় ভূদেব স্মৃতি সভায় যোগ দিয়া ধন্য হইয়াছি। বটুকদেব এই স্মৃতিসভা প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। এই সভার সঙ্গে বটুকদেবের নামও জড়িত থাকিবে নিশ্চয়।

বটুকদেবের সাহিত্যিক প্রীতি ছিল অসাধারণ। দীনেশবাবুকে তিনি খুবই শ্রদ্ধা করিতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের মত অল্প বয়স্কদেরও তিনি কম প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। ভূদেব গ্রন্থাগার হইতে বহু দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান পত্রপত্রিকা দীনেশবাবুর মাধ্যমে আমরা পাইতাম বটে, কিন্তু এ ব্যাপারেও বটুকদেবের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থন ছিল। বহু মূল্যবান

অমৃতবাজার পত্রিকার প্রথম তিন বছরের ফাইল ভূদেব লাইব্রেরি হইতে প্রথম ব্যবহার করিতে পাইলাম দীনেশবাবুর সহায়তায় এবং বটুকদেবের প্রীতি-পরায়ণতায়। একথা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার না করিলে বিশেষ প্রত্যবায় হইবে। পত্রিকা হইতে কতকগুলি বিষয় সংকলন করিয়া "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ" শীর্ষক একখানা পুস্তক প্রকাশিত করি ইহাতে বটুকবাবুর প্রতি আমার ঋণ স্বীকার করিয়াছি। পুস্তকখানি পাইয়া তিনি বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। বহুকাল কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখিতে পারি নাই। একদিন শুনিলাম বটুকবাবু মরদেহ ত্যাগ করিয়াছেন। কিছুকাল পরে আরও শুনিলাম ঐ মূল্যবান গ্রন্থাগারটি তালা বদ্ধ। বিদ্যার এই অমূল্য ভাণ্ডারটিকে কি আর উদ্ধার করা সম্ভব নয়? আজ যখন তৎকৃত আগেকার অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতার কথা মনে করি তখন হৃদয় কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হইয়া উঠে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আধুনিককালে বাঙালীর দুঃখ-দুর্দশার কথা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যেমন বলিয়াছেন এমনটি আর কাহারও মুখে তো শুনি নাই। তিনি বিপর্যস্ত বাঙালী জাতির ছিলেন বিশেষ আশা-ভরসা। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে কাশ্মীরে এক অতি বেদনাদায়ক পরিবেশের মধ্যে। কোথায় গেলেন শেখ আবদুল্লা—যিনি একদা ভারতরাষ্ট্রের একান্ত বিশ্বাসভাজন ছিলেন এবং যাঁহার অবজ্ঞা-মিশ্রিত ঔদাসীন্য ও তাচ্ছিল্যের দরুনই শ্যামাপ্রসাদের অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে! ভারতরাষ্ট্রের বিশ্বাসভাজন বলিয়াই তো আবদুল্লার এত সাহস হইয়াছিল—এ কথা আজ কে না জানেন? বাঙালীর চিত্তজয়ী ভারতগত-প্রাণ শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু এ সময়ে জাতির পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

শ্যামাপ্রসাদবাবুকে জানিতাম বহু পূর্ব হইতেই। যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহার প্রচুর কৃতিত্ব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁহার সংস্রব ব্যারিস্টারী সনদ লইয়া বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর হইতেই। সে মনে হয় ১৯২৫-২৬ সন হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সঙ্কটময়মুহূর্তে তিনি ইহার ভাইস-চ্যান্সেলার বা উপাধ্যক্ষ হন। দুই দুই বার তিনি উপাচার্য-পদে বৃত হইয়াছিলেন। ২৪শে জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-দিবস। এই দিনটিকে স্মরণীয় করিবার জন্য তিনি বিশেষ উৎসব-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। যুবক ছাত্রদের প্যারেড-কুচকাওয়াজ ইহার অঙ্গীভূত ছিল। তখন বিপ্লববাদকে দমন করিতে সরকার খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। হাজারে হাজারে যুবক বিপ্লবকর্মের অভিযোগে কারাদণ্ডে দণ্ডিত বা আবাস হইতে বহুদূরে অন্তরিত। বাহিরের যুবক-সমাজও সন্ত্রস্ত। এই সময়ে উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদের উক্তপ্রকার উৎসবানুষ্ঠানে যুবচিত্তে যেন পুনরায় আশার সঞ্চার করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্যামাপ্রসাদবাবুর দ্বিতীয় কার্য বড়ই সুদূর-প্রসারী এবং যুগান্তকারী। বাঙালীর মাতৃভাষা বাঙলাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় তথা

উচ্চতর শিক্ষায় স্থান করিয়া লইতে বড়ই বেগ পাইতে হয়। দীর্ঘকালের প্রয়াসের ফলে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইল বটে, কিন্তু বাঙলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-প্রচেষ্টা পদে পদে ব্যাহত হইতেছিল। শ্যামাপ্রসাদ বিশ্ববিদ্যালয়-পরিচালিত প্রবেশিকা-পরীক্ষায় বাঙলার মাধ্যমে করাইতে সার্থক প্রয়াস পাইলেন। সাহিত্য-বিজ্ঞানের (Art and Science) মূল বিষয় সম্বন্ধে পাঠ্যপুস্তক-রচনারও আয়োজন করিলেন। বিভিন্ন বিদ্যায় পরিভাষা তৈরির জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে তিনি একটি পরিভাষা কমিটি গঠন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়-নির্দিষ্ট পরিভাষা সাহিত্য-রচনায় প্রযুক্ত হইতেছে। ইহার দ্বারা ভাষা-সাহিত্যের অপরিসীম উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর সরকারী আয়োজনে প্রশাসনিক পরিভাষাও প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রচারিত পরিভাষা এ-কার্যে একান্ত সহায়তা করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

শ্যামাপ্রসাদবাবু ইতিপূর্বেই রাজনীতিতে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি অবিলম্বে হিন্দু-মহাসভার নেতৃপদে সমাসীন হন। তখন মুসলীম লীগের দৃঢ় হিন্দু বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক মানসিকতা এবং কংগ্রেসের উগ্র তোষণ-নীতি হিন্দু-মহাসভাকেও একটি রাজনৈতিক দলের মর্যাদা দান করে। হিন্দুসমাজকে পদে পদে বিপর্যস্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া আদৌ যুক্তিসম্মত নয়, বিধিসম্মতও নয়। হিন্দুমহাসভা এ-কারণে হিন্দুসমাজের সময়োপযোগী কার্যনির্ধারণে অগ্রসর হইলেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইহার নেতৃপদে সমাসীন হইয়া জাতীয়তার আদর্শ মানিয়া লইয়াও হিন্দুসমাজ সংগঠন এবং হিন্দুসমাজের রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণে অগ্রসর হইলেন। তিনি চিন্তাশীল মুসলমান নেতাদের দ্বারাও আদৃত হন এবং 'ফজলুল হক মন্ত্রিসভা'য় দায়িত্বপূর্ণ অর্থমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু তখন দ্বিতীয় মহাসমরের মরসুম চলিতেছিল। আগস্ট-বিপ্লবে ভারতবাসীরা একবাক্যে যোগ দেওয়ায় ব্রিটিশের ভেদনীতি চরমে উঠিল। ব্রিটিশ সরকার তাঁহার স্বদেশবাসীদের যেভাবে অত্যাচারে জর্জরিত করিতেছিলেন, তাহার প্রতিবাদে শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রিত্বপদ ত্যাগ করিলেন। ফজলুল হককেও নিতান্ত তুচ্ছ কারণে প্রধান-মন্ত্রীর পদ হইতে বরখাস্ত করা হইল অল্পকাল পরেই। এইরূপে একটি পর্বের অবসান হইল।

ইহার পর আসিল পঞ্চাশের মন্বন্তর। কি কি কারণে এই মন্বন্তর

হইয়াছিল তাহা বিশ্লেষণ করার স্থান ইহা নয়। 'মনুষ্য-কৃত' এই একটিমাত্র বিশেষণে ইহাকে বিশেষিত করা যাইতে পারে। এই 'মনুষ্য-কৃত' পঞ্চাশের মন্বন্তরকে রোধিবে কাহার সাধ্য? লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে তিল তিল করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। এই সময় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দুর্গত দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িতদের সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। তখন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সকলেই জেলে। শ্যামাপ্রসাদবাবুর সহায়তা এসময়ে আরও প্রয়োজনীয় বোধ হইল এই কারণে। তিনি সাহায্য-ভাণ্ডার খুলিয়া দিকে দিকে সাহায্য-দানের ব্যবস্থা করিলেন। বেসরকারীভাবে যতটা সম্ভব, উপযুক্ত সহকর্মীদের লইয়া তাহা সাধন করিতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করিলেন না। আহার নাই নিদ্রা নাই, দিন নাই রাত্রি নাই—দুর্গতদের সাহায্যকল্পে শ্যামাপ্রসাদ সর্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইরকমটি আমরা দেখিয়াছি স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর ছিন্নমূল নরনারীর দুর্গতি নিবারণের বেলায়। তখনও তিনি বেসরকারীভাবে কার্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন। এই কার্যে তাঁর দোসর ছিলেন ডঃ মেঘনাদ সাহা।

দূর হইতে শ্যামাপ্রসাদবাবুর কার্যকলাপ লক্ষ্য করিয়াছি। বাঙালী উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া স্বাদেশিকতা-মন্ত্রে উজ্জীবিত হইয়াছে। এই উচ্চশিক্ষাকে ব্যাহত করার অপচেষ্টা হয় সরকার কর্তৃক বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় একক্রমে আট বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার থাকিয়া একদিকে যেমন এই অপচেষ্টার মূলোৎপাটন করিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনি বিবিধ বিদ্যার শিক্ষা অনুশীলন ও গবেষণার নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগ খুলিবার আয়োজন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' পুস্তকে এই বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করি। শ্যামাপ্রসাদবাবু পুস্তকখানি পড়িয়াছিলেন কিনা জানিনা, কিন্তু পঞ্চাশের মন্বন্তরের অব্যবহিত পরেই তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হইল। মন্বন্তরের তীব্রতা কমিলেও ইহার জের চলে অনেকদিন ধরিয়া। মফস্বলের দুর্গতদের সাহায্যদান তখনও চলিতেছিল। এই সূত্রেই তখন শ্যামাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে।

শ্যামাপ্রসাদবাবু পিতা আশুতোষের মতোই গুণগ্রাহী এবং দরদী-হৃদয়। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইতে বেশী বিলম্ব হইল না। তিনি হিন্দুমহাসভার নেতৃপদে অধিষ্ঠিত থাকিলেও, সম্প্রদায় ও শ্রেণী

নির্বিশেষে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত। আমরা সমসাময়িকেরা তাঁহার মধ্যে মন্দ যে কিছু লক্ষ্য করি নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহার ভিতরে ভালো যাহা তাহা ক্রমে মন্দকে ছাপাইয়া উঠিয়া তাঁহাকে খাঁটি সোনায় রূপায়িত করিতেছিল। জাতীয়তার ভিত্তিতে ভারতমাতার শৃঙ্খলমোচন প্রয়াস ইহার মূলে ছিল অনেকখানি। আমার জাতীয়তা-ভিত্তিক গ্রন্থগুলি তিনি পূর্বে পাঠ করিয়াছিলেন কিনা জানি না, তবে আলাপে বুঝিতাম তিনি ইহার বিষয়বস্তুর সহিত পরিচিত। 'জাতিবৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ' শিরোনামায় একপ্রস্থ প্রবন্ধ লিখি 'মন্দিরা' মাসিকে। তখন 'মন্দিরা'র পরিচালকবর্গ 'যুগান্তর'-পন্থী বিপ্লবী। সকলেই আগস্ট-বিপ্লবের সময়াবধি কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। 'মন্দিরা' পরিচালনার ভার নেন শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়। এইসকল রচনা একত্র করিয়া উক্ত শিরোনামায় পুস্তক-প্রকাশের আয়োজন করি। তখন শ্যামাপ্রসাদবাবু যুব-বাঙলার অবিসংবাদি নেতা এবং জাতীয়তা-মন্ত্রের উদ্গাতাদের পুরোভাগে। তিনি সানন্দে আমার এই পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিয়া দেন। এসময়ে তাঁহার অবৈতনিক কর্মসচিব শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ আমাকে বিশেষ সহায়তা করেন। ঐ সময়ে শ্যামাপ্রসাদ-বাবু খুবই কর্মব্যস্ত ছিলেন। ভারতবর্ষের মুক্তি আসন্ন সন্দেহ নাই, কিন্তু কি ভাবে, কোন্ পথে আসিবে তাহার জল্পনা-কল্পনার অন্ত ছিল না। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে; ব্রিটেন জয়ী হইয়াও বিপর্যস্ত। তাহার জয় বিশ্ববাসীর নিকট পরাজয় বলিয়াই মনে হইতেছিল। বিক্ষুব্ধ ভারতবর্ষকে শান্ত সংযত করার বিশেষ প্রয়োজন। হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে একযোগে ছাত্র-ধর্মঘট, নৌ-ধর্মঘট, আজাদ-হিন্দ-বাহিনীর বিচার-প্রহসন ও মুক্তি, ব্রিটিশকে ভারতবাসীর সার্থক মুক্তি-সাধনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিতেছিল। বলা বাহুল্য, বাঙলার আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। দিল্লীতে 'ক্যাবিনেট মিশন' পৌঁছিয়াছে; পূর্বেকার 'ক্রিপ্স্ মিশন'-এর মতো এবারেও ডাক পড়িল বিভিন্ন দলের ও মতের অনুবর্তীদের। শ্যামাপ্রসাদবাবু অনবরত দিল্লী-কলিকাতা করিতে লাগিলেন। এহেন কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি উক্ত পুস্তকের ভূমিকা লিখিবার জন্য সময় দিয়াছিলেন।

এইসময় বাঙলায় বাঙালীর মুক্তি-সাধনা বিভিন্ন বিভাগে কৃতিত্ব এবং তৎকালীন সমস্যাগুলির আনুপূর্বিক বিবরণসহ একখানি পুস্তক-রচনার প্রস্তাব করিয়াছিলেন শ্যামাপ্রসাদবাবু। অনেকেই তাঁহার এই প্রস্তাবে সাড়া

দিলেন। আমার উপরে ভার পড়িল মুক্তি-সাধনার একখানি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিবার। মনে পড়ে, কী তৎপরতার সহিতই না বিভিন্ন বিষয়ে প্রস্তাব লিখিবার প্রয়াস চলিয়াছিল। আমিও যথাসম্ভব স্বল্পসময়ে আমার রচনাটি লিখিয়া দিলাম। কিন্তু তখন ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অতি দ্রুত পটপরিবর্তন হইতেছিল। ইহার সঙ্গে তাল রাখে কাহার সাধ্য! ভারতবাসীরা যে আর একমুহূর্তও অপেক্ষা করিতে চাহিতেছে না। ইংরেজও যেন ভাবিতেছিল, ভারতবর্ষকে আত্মকর্তৃত্ব না দিয়া উপায়ই নাই, তবে শত্রুরূপে না হইয়া মিত্ররূপে তাহার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হইলেই বিপর্যস্ত ব্রিটেনের পক্ষে নিরতিশয় মঙ্গল। জিন্না হুঙ্কার দিতেছেন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার জন্য, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এট্‌লির প্রস্তাব আসিল, সকলেই বুঝিতে পারিল ভারতবর্ষের মুক্তি আসন্ন, কিন্তু ইহা আসিতেছে এক অদ্ভুত সমাধান লইয়া—'ভারত বিভাগ'।

কেহই এজন্য প্রস্তুত ছিলেন না। মহাত্মা গান্ধী তো ননই, মনে হয় জিন্নাও নন। কিন্তু ইহাই এক স্পষ্ট রূপ লইতে চলিয়াছিল তড়িদ্‌বেগে। এসময় মুসলমান সংখ্যা-গরিষ্ঠ প্রদেশগুলির—যেমন পঞ্জাব ও বাঙলার—কী দশা হইবে? স্বভাবতই কথা উঠিল এগুলি পাকিস্তানে যাইবে। এইসময় শ্যামাপ্রসাদবাবু বাঙলা তথা হিন্দু সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশসমূহের পক্ষে যে আন্দোলন উপস্থিত করেন তাহা বাস্তবিকই বাঙালী জাতিকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। আসন্ন বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের মুখে শ্যামাপ্রসাদবাবুর সার্থক জাতীয় প্রয়াস বাঙালী জাতি চিরকাল কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। তখন বাঙলাদেশে একটি মতবাদ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। যখন ভারত-বিভাগের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আগতপ্রায় তখন বঙ্গে শহীদ্ সুরাবর্দি এবং শরৎচন্দ্র বসু 'Independent Bengal' বা 'Sovereign Bengal' অর্থাৎ স্বাধীন ও সার্বভৌম বাঙলা প্রতিষ্ঠার দাবি করিলেন। এ কথা সকলেই বুঝিতে পারিল যে, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে একটি প্রদেশ মাত্র লইয়া স্বাধীন-রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নহে। আবার যদি বা এইরূপ একটিমাত্র প্রদেশে স্বাধীন বা সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হয়, তবে গণতন্ত্রের যুগে তাহার এই স্বাধীন বা সার্বভৌম অস্তিত্ব রক্ষিত হইবার সম্ভাবনাও অতি কম। কেননা বাঙলায় মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তখন যে গণভোটের ধুয়া উঠিয়াছিল, একবার যদি এখানে গণভোট গৃহীত হয়

তাহা হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায় মুসলমানেরাই অধিক সংখ্যায় ভোট দিবে এবং তাহাদের যে-কোনো প্রস্তাব এইরূপে পাস করাইয়া লইবে। স্বাধীন বা সার্বভৌম বঙ্গ যে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের জোরে একদা পাকিস্তানে যোগ না দিবে তাহার কি নিশ্চয়তা আছে? বিশেষতঃ ঐ সময় জিন্নার হুমকি এবং সাধারণ মুসলমান সমাজের সুস্পষ্ট সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি নানা অকার্য-কুকার্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

আগস্ট বিপ্লবের পরে। বাঙলার কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ তখন সদ্য কারামুক্ত। এতদিনে যে রাজনৈতিক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে সুরাবর্দি বসুর প্রস্তাব তাঁহাদের পক্ষেও গ্রহণ করা সম্ভব হইল না। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাঙলার সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুসমাজের মুখপাত্র হইয়া এই কথাই জোরের সঙ্গে বলিলেন যে, যদি ভারত-বিভাগের ভিত্তিতেই স্বাধীনতা আসে, তাহা হইলে বাঙলার হিন্দুসমাজকে রাজনৈতিক দাসত্ব হইতে মুক্তিদানের নিমিত্ত বাঙলাকেও ভাগ করিতে হইবে। স্বদেশী যুগে ব্রিটিশের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবকে বাঙালী জাতি যেমন একবাক্যে বিরোধিতা করিয়াছিলেন, এবারে দৈবদুর্বিপাকে পড়িয়া বাঙলার হিন্দু-সমাজের আবালবৃদ্ধবনিতা বাঙলা-বিভাগের পক্ষে মত দিলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আসিল, কিন্তু তাহা আসিল ভারত-বিভাগকে ভিত্তি করিয়া। বাঙলা বিভক্ত হইল, পঞ্জাবও বিভক্ত হইল। সিন্ধু, বেলুচিস্তান সীমান্তপ্রদেশ এবং বিভক্ত বাংলা ও পঞ্জাব লইয়া পাকিস্তান গঠিত হয়। পঞ্জাব ও বাঙলার এক এক অংশ হিন্দুস্থানের (তখন ভারতরাষ্ট্র) অন্তর্ভুক্ত রহিয়া গেল। ঐ সময়ে শ্যামাপ্রসাদের মধ্যে বাঙলার হিন্দুসমাজের মানসিক প্রতিরূপই যেন আমরা দেখিতে পাইলাম। ভারত-বিভাগ ভালো কি মন্দ সে কথা এখানে তুলিয়া লাভ নাই। আপদধর্ম হিসাবে বাঙলা ও পঞ্জাবের খানিকটা অংশও অন্তত ভারতরাষ্ট্রভুক্ত হইয়াছে, ইহার জন্য শ্যামাপ্রসাদের কৃতিত্ব সবিশেষ প্রশংসনীয়।

এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি শোনা একটি কথার উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। রেলগাড়িতে মাঝে মাঝে বেশ হক্-কথা শোনা যায়। বর্তমান অবস্থা লইয়া আলোচনা। এক অল্পবয়স্ক ভদ্রলোক (যুবকও বলা যায়) বলিলেন,—আজ যদি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় থাকিতেন তাহা হইলে এমনটি অর্থাৎ এমন কংগ্রেসী অনাচার হইত না—আমাদিগকেও ইহা সহ্য করিতে হইত না।

অন্য এক ভদ্রলোক, অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক এবং প্রৌঢ় বলিয়া মনে হইল—অমনি মুখের উপর জবাব দিলেন,—এখন দলের যুগ, ব্যক্তি সেখানে তলাইয়া যায়। যে-দলের যখন প্রাধান্য, রাষ্ট্রের শাসন-কর্তৃত্ব তখন সেই দলের হাতে চলিয়া যায়। আজ শ্যামাপ্রসাদবাবুর জন্য আমরা দুঃখ করি, কিন্তু তাঁহার জনসংঘের স্বপক্ষে আমরা ক'জনে ভোট দিয়াছি?—তিনি বাঁচিয়া থাকিতে দি' নাই, এখনও নয়। ইহার পর তিনি যাহা বলিলেন তাহা অত্যন্ত সারগর্ভ। সুরাবর্দি-বসুর 'সভারেন বেঙ্গল'-এর হাত হইতে তিনিই আমাদের মুক্তি দিয়াছেন। সমগ্র বাঙলার হিন্দুসমাজ ছিল তাঁহার পশ্চাতে। 'সভারেন বেঙ্গল'—ইহা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইত কবে! কারণ ঐ ধরনের গভর্নমেণ্ট একবার হইতে দিলে, মুসলমান সম্প্রদায়েরই জিত হইত। আজ পাকিস্তানে হিন্দুরা যে অবস্থায় রহিয়াছে, সমগ্র বাঙলায় হিন্দুদের ভাগ্যেও সেই অবস্থা ঘটিত। বাঙালী হিন্দুকে শ্যামাপ্রসাদবাবুই রক্ষা করিয়াছেন।

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে শ্যামাপ্রসাদবাবু কংগ্রেসী ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের শ্রদ্ধা-প্রীতি অর্জন করিয়াছিলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইলে, নেতৃবর্গ তাঁহার গৃহে গিয়াও সাক্ষাৎ করিতে ত্রুটি করেন নাই। স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের মন্ত্রিসভায়ও তাঁহার বিশিষ্ট স্থান হইল। স্বদেশের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে, নিয়ম-শৃঙ্খলা-আনয়নে প্রথম স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই ঝাভেরি প্যাটেল যেমন, তেমনি স্বদেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ও সংগঠনে শ্যামাপ্রসাদ সর্বশক্তি বিনিয়োগ করিলেন। কিন্তু তখন কে জানিত যে শ্যামাপ্রসাদবাবু ইউনিয়ন মন্ত্রিসভায় আর বেশিদিন থাকিতে পারিবেন না। বাঙালী হিন্দুর সংহতি রক্ষার জন্য তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন। ১৯৫০ সনে পূর্ববঙ্গের দাঙ্গায় হিন্দুর জীবন একেবারে বিপন্ন হইয়া পড়ে। তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা যে নীতি অবলম্বন করিলেন তাহার সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিলেন না। দুর্গত ছিন্নমূল পূর্ববঙ্গবাসীদের দুঃখ লাঘব বেশি করিয়া করিতে পারিবেন মন্ত্রিসভার বাহিরে থাকিলে, এই আশায় তিনি মন্ত্রিত্বে জলাঞ্জলি দিয়া দুর্গত মনুষ্যসমাজের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার এই সময়কার কার্যকলাপ কাহার প্রাণে না অভূতপূর্ব বল সঞ্চার করিয়াছিল। ইহার পর শ্যামাপ্রসাদ 'নিখিল ভারত জনসংঘ, দল গঠন করেন। ইহার আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে

বাস্তবে রূপায়িত করিতে গিয়া তাঁহাকে অপরিসীম শ্রম করিতে হয়। ইহাতে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। আর এই অসুস্থ দেহেই কাশ্মীরে গিয়া কারারুদ্ধ হইলেন। সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

স্বদেশের হিতার্থে শ্যামাপ্রসাদবাবুর জীবন পণ করার কথা অল্পকথায় বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্বের যে সামান্যমাত্রও পরিচয় পাইয়াছি, সেই সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব।

একদিন সকালে আমার জাতিয়তামূলক এক কি দুইখানি বই উপহার দিতে গেলাম। তাঁহার সম্মুখে বসিয়া আছি, এমন সময় এক বিখ্যাত ব্যক্তি (তাঁহার বৃত্তি বলিব না, তাহা হইলে পাঠক হয়ত ধরিয়া ফেলিবেন) ঘরে এই বলিতে বলিতে ঢুকিলেন যে, লোকে টাকা খায় হিন্দুমহাসভার কিন্তু ভোট দেয় কংগ্রেসকে। শ্যামাপ্রসাদবাবুর সম্মুখে আমার দক্ষিণ পার্শ্বের চেয়ারে আসিয়া তিনি বসিলেন। শ্যামাপ্রসাদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এঁকে চেনেন ?" তিনি বলিলেন, "এঁকে চিনব না ?…" আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার কথার ঘোরতর প্রতিবাদ করিলাম। ঐ বিখ্যাত ব্যক্তির ভাব-গতিক দেখিয়া মনে হইল, তিনি আমার এইরূপ প্রতিবাদের আশা করেন নাই। তাড়াতাড়ি কথা সারিয়া চলিয়া গেলে, শ্যামাপ্রসাদবাবু আমাকে বলিলেন, "ওঁর কথা কিছু মনে করবেন না, উনি ঐরকম লোক।"

আর একদিন শ্যামাপ্রসাদবাবুর ঘরে বসিয়া আছি, ঘরে ঢুকিতেই দেখি এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন। তাঁহাকে তো আমাদের নমস্কার মাত্রও করিতে হয় না। এরূপ দেখিয়া মনে কিরূপ খট্‌কা লাগিল।

একদিন ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়কে (তখন তিনি রাজ্যপাল হন নাই) এই ব্যাপারটি বলিলাম এবং নিজের খট্‌কার কথা প্রকাশ করিলাম। হরেন্দ্রবাবু বলিলেন, "যোগেশবাবু, স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই লোকে এইরূপ করে এবং শ্যামাপ্রসাদবাবু নিশ্চয়ই বুঝিতে পারেন।"

শ্যামাপ্রসাদবাবু তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় সমাসীন। ইচ্ছা ছিল তাঁহার সঙ্গে একবার দেখা করি। কিন্তু লোকে 'কিউ' বা সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া একে একে তাঁহার সহিত দেখা করে জানিয়া এ-ইচ্ছা ত্যাগ করি। একদিন হরেন্দ্রবাবুকে এ কথা বলিলে, তিনি বলিলেন, "হাঁ, নিশ্চয়ই যাবেন, আপনাকে

দেখতে পেলেই তিনি ডেকে নেবেন। সারে দাঁড়াতে হবে না।" কি জানি কেন, মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদের নিকট আমার আর যাওয়া হয় নাই। শ্যামাপ্রসাদ-বাবু 'জনসংঘ' গঠন করিলেন ; আমি অন্যবিধ কর্মে ব্যস্ত থাকায় এসময়েও তাঁহার সহিত দেখা করিতে পারি নাই।

শেষবার তাঁহাকে দেখি মৃত্যুর মাত্র দুইমাস পূর্বে। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরীর সহায়তায় এবং শ্রীযুক্তা লতিকা ঘোষের প্রযত্নে কলিকাতায় ভারতীয় নৃত্যকলা-চর্চার আয়োজন হইয়াছিল। একটি শিক্ষায়তন-প্রতিষ্ঠারও সূচনা হইল এ উদ্দেশ্যে। দক্ষিণ কলিকাতায় আশুতোষ কলেজে আনুষ্ঠানিকভাবে নৃত্যকলা প্রদর্শনপূর্বক ইহা স্থাপিত হয়। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি বক্তৃতায় স্বল্পকথায় ভারতীয় নাট্যকলার উৎকর্ষের এবং বর্তমানকালেও উহার চর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন। শেষবারের তরে সেই তাঁহাকে দেখিলাম। ইহার পরই আসিল মৃত্যু। বাঙলার জাতীয় কর্মী ও নেতা রূপে তাঁহাকে বার বার নমস্কার করি।

———

পিতৃদেব

কুপুত্র যদিবা হয় কু-মাতা কখন নয়। কুমাতার 'মাতা' কথাটির স্থলে "পিতা-মাতা" দুইই বলিতে চাই। আজ পিতামাতার কথা স্মরণ করি। "শ্রদ্ধার সঙ্গে" কথাটি জুড়িয়া দিব না। কেননা পিতৃতর্পণ তো শ্রদ্ধার সঙ্গেই করিতে হয়। আমার শৈশবে মাতৃদেবী গত হন। পিতৃদেব সংযত ও মিতভাষী ছিলেন। তথাপি মাতৃদেবীর কথা তাঁহার মুখেও কিছু কিছু অবশ্য শুনিয়াছি।

মা'র মৃত্যুর পূর্বেই দিদির বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছিল, বোধ হয় দিন তারিখও ঠিক। এমন কোন আত্মীয়াও ছিলেন না যিনি আসিয়া অপোগণ্ডদের সামলাইতে পারেন। আমার কনিষ্ঠা একেবারে শিশু বোনটিকে লইয়া আরও বিপদ। পিতৃদেব উপায়ান্তর না দেখিয়া দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিলেন। দিদি বিবাহান্তে শ্বশুর বাড়ী চলিয়া গেলেন। আমার কনিষ্ঠ ভগিনীটিকে বেশিদিন বাঁচানো গেল না। মাতার মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যে ইহলীলা সম্বরণ করিল। পিতৃদেব স্নেহমমতা আমার ওপর একেবারে ঢালিয়া দিলেন। তাঁহার সান্নিধ্য আমার নিকট বড়ই মধুর ছিল। বয়স কিঞ্চিৎ বাড়িবার পরেও তাঁহার সঙ্গ আমার খুবই ভাল লাগিত। তিনি যখন যেখানে যাইতেন আমি তাঁহার সঙ্গে যাইতাম, তাঁহার কথা শুনিতাম, অন্যের কথা শুনিতাম, কিন্তু কখন ক্লান্তি বোধ করি নাই। কি-সব কথা হইত মনে নাই। কিন্তু রাজনীতির কচকচি মোটেই নয়। গ্রামের, পল্লীর বা পরিবারের সাধারণ সুখ দুঃখের কথা. বিপদে আপদের কথা, এইরূপই যেন মনে পড়িতেছে। পিতৃদেবের সঙ্গ আমাকে সঙ্কটময় কৈশোরে কত কুসঙ্গ হইতে মুক্তি দিয়াছিল।

পিতৃদেব আমার নিকটে তাঁহার প্রথম জীবনের অনেক গল্প বলিতেন। গল্প নয়, সত্যঘটনা গল্পের মত করিয়া বলিয়া যাইতেন। বাবার মা অর্থাৎ ঠাকুর মা তাঁহার দুই বৎসর বয়সেই মারা যান। বাবা মাতামহীর গৃহে মানুষ। শৈশবে খুবই কাঁদিতেন। কান্নায় মাতামহীর জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেন। মাতামহী নাতিকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য এক উপায় ঠাওরাইলেন।

তিনি শুক্‌না নিশিন্দা পাতা কল্কিতে পুরিয়া অগ্নি সংযোগ করতঃ বাবাকে হুঁকায় তাহা টানিতে দিতেন। নিশিন্দা পাতা এদিকে বড় একটা দেখি না, এই নামে আখ্যাত কিনা তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু আমাদের বাড়ীতে কি পাড়া-পড়শীর বাড়ীতে বেড়ার ধারে অনেক নিশিন্দা গাছ ছিল। এই গাছের পাতা ছেলেদের কাশির পক্ষে ভাল। মাতামহীর ব্যবস্থাপনায় কান্না কমিল, সঙ্গে সঙ্গে ঔষধেরও কাজ হইল। পিতৃদেব বলিয়াছিলেন সেই ছেলে-বেলা হইতে তামাকু সেবনের অভ্যাস। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি তামাকু সেবন করিয়াছেন। তাঁহার এই অভ্যাস কিন্তু আমাতে আদৌ বর্তায় নাই। তাঁহার সব কাজের মধ্যেই কেমন একটা সংযম ছিল। তিনি এত তামাকুসেবী কিন্তু আমাকে কখন তামাকু ভরিয়া দিতে বলেন নাই। পল্লী অঞ্চলে আগন্তুকদের আপ্যায়ন করা হইত পান তামাক দিয়া। কেহ বাড়ীতে আসিলেও আমাকে কখনও তামাকু ভরিয়া আনিতে বলিতেন না। নিজে ভরিয়া খাইতেন ও খাওয়াইতেন। এই তামাক সেবন অহরহ দেখিয়া অচেতন মনে ইহার প্রতি কেমন একটা বিতৃষ্ণা ধীরে ধীরে গাঢ় হইতেছিল। পল্লী অঞ্চলে তখন আর একটি রীতি ছিল যাহাতে ছেলেরা তামাকু সেবন সহজেই অভ্যাস করিয়া লইত। গুরুমহাশয়কে খুশি করিবার জন্য পড়ুয়ারা বাড়ী হইতে তামাকু লইয়া যাইত। কোন কোন পড়ুয়াকে তিনি তামাকু সাজিয়া আনিতে বলিতেন। সাধারণতঃ বড় পড়ুয়ারা এই কার্যে নিয়োজিত হইত। তাহারা শুধু সাজানো নয়—একটু আড়ালে রাখিয়া উহা ধরাইয়া আনিত। এইরূপে ছেলেরা তামাকু সেবন অভ্যাস করিয়া ফেলিত। এই রীতিটি মন্দ, পরে ইহা উঠিয়া যায়। তবে গুরুমহাশয় ভাল ছেলেদের তামাকু সাজিতে দিতেন না।

বাবার বিবাহ হয় অল্প বয়সে। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যতদূর স্মরণ হয় তাঁহার বয়স তখন ছিল বার এবং মার বয়স ছয়। আমি এইরূপ একটি বাল্যবিবাহের ফল। সে যুগে বাল্যবিবাহ যে সবক্ষেত্রে কু-ফলপ্রসূ হইত এমন তো মনে হয় না। কিন্তু বাল্যবিবাহে অপরিসীম সংযম চাই। তাহা দুর্বল মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বাল্যবিবাহ এখন কতকটা আইন বলে এবং অনেকটা অর্থনৈতিক কারণে রীতি বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে আমার দিদির যখন বিবাহ হয় তখন তাহার বয়স চৌদ্দ। তখন কনে চৌদ্দ পনর বৎসরে পা দিলে পিতামাতার আলাপে ও হাবভাবে ভিতরকার চাঞ্চল্য ফুটিয়া বাহির হইত। এখনকার কথা তো সকলেই

জানেন। পঞ্চাশ বৎসরের ব্যবধানে বিবাহ ব্যাপারে কি তারতম্যই না ঘটিয়াছে। উহারও প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে পিতার বিবাহ হইয়াছিল।

পিতৃদেব আমার মাতৃকুলের কথা বলিতে বড় ভালবাসিতেন। মাতামহ কিরূপ ভোজনপটু ছিলেন তাহার কথাও বাবার মুখে অনেকবার শুনিয়াছি। মাতামহ ছিলেন অত্যন্ত দরাজ হৃদয়। কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর তাহার অপোগণ্ড পুত্রকন্যাদের তিনি দেখাশুনা করিতেন। আমাদের বাড়ীতে একবার আগুন লাগিয়া সব পুড়িয়া যায়। মাতামহ ঘর তৈরীর সরঞ্জাম তাড়াতাড়িতে যাহা যোগাড় করিতে পারিয়াছিলেন নৌকা ভর্ত্তি করিয়া লইয়া আসেন। গৃহনির্মাণ তিনি নিজে তদারক করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া যান। আমাদের বাড়ীতে দুর্গাপূজা, মাতুলালয়ে কালীপূজা। বাবা বলিতেন, দুর্গাপূজার সময় মাতুলালয়ের লোকেরা এবং প্রতিবেশীরা অনেকেই আমাদের বাড়ীতে আসিতেন। আবার কালীপূজার সময় আমাদের পাড়ার অনেকেই যাইতেন। গান-বাজনা আমোদ প্রমোদ পূজা উপলক্ষে কতই না হইত। এই সব কাহিনী বলিতে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন। প্রবেশিকা পর্যন্ত বাড়ীতে থাকিয়া পড়াশুনা করি। পিতৃদেব আগেকার রীতি তখনও বজায় রাখিয়া ছিলেন। প্রতিবৎসর কালীপূজার সময় তিনি আমাকে লইয়া মাতুলালয়ে যাইতেন। একদিন থাকিয়া পরে বাড়ি ফিরিয়া আসিতেন। কখনও আমি তাঁহার সঙ্গে ফিরিতাম, কখনও বা কয়েকদিন পরে। পিতৃদেবের একটি বাফতার কোট ও চাদর ছিল। বৎসরান্তে মাতুলালয়ে যাইবার দিন তিনি উহা পরিতেন। তাঁহাকে এই সময়ে আমার বড়ই ভাল লাগিত।

পিতৃদেবের একখানি'দপ্তর' ছিল। তাহাতে পুরাতন কাগজ পত্র সযত্নে রক্ষিত হইত। তাঁহার ছাত্রজীবনে কোন কোন লেখা খাতা পত্র ইহার মধ্যে দেখিয়াছি। তিনি পিরোজপুর ইংরেজি উচ্চ স্কুলে পড়িবার সময় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রমেশচন্দ্র দত্ত একবার স্কুল পরিদর্শন করেন। পিতৃদেব R. C. Dutt বলিতেন। কি সুপুরুষ আর কি অমায়িক ব্যবহার। তাঁহার ছাত্রাবস্থায় মহকুমা হাকিম ছিলেন শশী ডেপুটি। শশীবাবু সহরের প্রধান সড়কের দুই পার্শ্বে কাছারীর কাছ বরাবর মেহগিনি গাছ রোপন করাইয়াছিলেন। আমরা এই সব গাছ খুব বৃহদাকার দেখিয়াছি। তাহার আরও অনেক হিতকর কাজের কথা পিতৃদেব বলিয়াছিলেন। পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ও ঐ স্কুলে পড়িতেন। পিতৃদেব বলিতেন উপেনবাবু

ছাত্রাবস্থায় এত মেধাসম্পন্ন ছিলেন যে, নিজের শ্রেণীর পাঠ সাঙ্গ করিয়া উপরের দুই ক্লাশের পড়া মুখস্থ করিয়া ফেলিতেন। উপেন্দ্রনাথ পরে আমাকে বলিয়াছিলেন পিতৃদেব তাঁহার সহপাঠি ছিলেন। পরবর্তী কালেও উপেন্দ্রবাবু সহপাঠী পিতৃদেবের কথা স্মরণে আনিয়াছিলেন। কলিকাতার কলেজে অধ্যয়নকালে নানাভাবে তাঁহার সহায়তা লাভ করি।

পিতৃদেবের মুখে কলিকাতার কথা ছেলেবেলায় শুনিতাম। তখন ঘোড়ার ট্রাম, গ্যাসের আলো হইয়াছে। অবশ্য গ্যাসলাইট তো এখনও দেখি। তিনি তাঁহার পিতাঠাকুরের সঙ্গে কলিকাতায় আসেন। তখন উল্টাডিঙ্গি কলিকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত ছিল। এখন শহর এত ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে, উপকণ্ঠ বা শহরতলী বলিয়া কিছুই বলা যায় না। নাকতলা হইতে বরানগর বা দক্ষিণেশ্বর মনে হয় এই তো কত কাছে। উল্টাডিঙ্গি গত শতাব্দীর শেষ দিকে একটি ব্যবসা-কেন্দ্রে পরিণত হয়। এক সময় হাটখোলাও ব্যবসার কেন্দ্র ছিল। উল্টাডিঙ্গির পরে বেলেঘাটা। কিন্তু এখন কি হাটখোলা কি উল্টাডিঙ্গি, কি বেলেঘাটা সকলেরই চেহারা একেবারে পাল্টাইয়া গিয়াছে। বাবা যে সময়ের কথা বলেন তখন উল্টাডিঙ্গি ব্যবসায়ে জমজম করিত। পূর্ববঙ্গ হইতে কাঁচা মাল আসিত, কাঁচামাল এখানে খালাস করার ব্যবস্থা ছিল। এই কাঁচামালের মধ্যে বরিশালের বালাম চাউল প্রধান। আবার বিদেশ হইতে আমদানী তৈরীমাল এখান হইতে পূর্ববঙ্গে চালান যাইত। পিতৃদেবের যৌবনে আমাদের গ্রামখানি একটা বড় রকমের ব্যবসায় ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়। গ্রামের পূর্বদিকে বড় বড় নদী, তাহার 'হুলায়' গঞ্জ। 'হুলা' কথাটির মানে জানেন না তো? একটি স্থানের বা গ্রামের শেষ। কোথায় শেষ হইতে পারে? সাধারণতঃ সেইখানে যেখানে নদী। এখনও বাখরগঞ্জে 'হুলার হাট' ষ্টেশন এই হুলা কথাটির মর্মার্থ বুঝাইতেছে। যশোহর হইতে কুণ্ডু, পোদ্দার, সাহা প্রভৃতি পদবীধারী প্রভৃতি ধনীরা আসিতেন ব্যবসায় কর্মের উদ্দেশ্যে। আমাদের পিতামহ ছিলেন দালাল। আজকাল দালাল কথাটি বড় খারাপ অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। তখন দালাল কথাটির এমন কদর্থ কেহ কল্পনাও করেন নাই। তখনও পিতামহকে সে সময় ধনিগণ এবং স্থানীয় লোকেরা আড়ৎদার বলিয়া উল্লেখ করিতেন। ইহা নিতান্তই সম্মানার্থে বলা হইত। তাঁহার আড়ত মোটেই ছিল না। দালালদের কথার নড়চড় প্রায়ই হয়, একারণ দালাল সকল ক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় ব্যক্তি নহেন। কিন্তু

পিতামহদেবের তখন 'সৎ' বলিয়া বেশ সুনাম ছিল। তাঁহার বিরাট পরিবার, যেমন বিস্তর আয় করিতেন তেমন দু'হাতে খরচ করিতেন। একটি পয়সাও জমা থাকিত না। পিতৃদেব কখনও পৈতৃক ব্যবসায় করেন নাই। ব্যবসাগত দুর্বিপাক তাঁহাকে স্পর্শে নাই।

তাঁহার উদার মন, দরাজ হৃদয়ের কত পরিচয় পাইয়াছি। তিনি লেখাপড়া কিছু শিখিয়াছেন। বিদ্যাচর্চার প্রতি তাঁহার একটা স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। গ্রামে বাংলা স্কুল ছিল। এখান হইতে ছাত্ররা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিত। ছাত্রবৃত্তি শ্রেণী পর্যন্ত পড়া কোন কোন ব্যক্তিকে তাঁহাদের প্রৌঢ় বয়সে দেখিয়াছি—বাংলা ভাষায় কি দখল! তিনি ছিলেন এ সময়ে ঐ স্কুলের সেক্রেটারী। বাংলা স্কুলের পণ্ডিতের কথা পিতৃদেবের মুখে প্রায়ই শুনিতাম। তিনি খুব ভাল শিক্ষা দিতেন। ছাত্র দরদীও ছিলেন। তাঁহার শিক্ষাগুণে ছাত্ররা বাংলা ভাষা সুন্দর আয়ত্ত করিয়াছিলেন। যাঁহারা লেখাপড়া করিতেন পিতৃদেব তাঁহাদিগকে বড়ই স্নেহ করিতেন। মাতৃহারা সন্তানকে পিতৃদেব সমস্ত কিছু দিয়া আগলাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার গভীর স্নেহ প্রগাঢ় মমতা অনুভব করিতে পারিতাম। কিন্তু কেমন যেন অলক্ষ্যে তাঁহার একটি শাসন পদ্ধতিও চলিয়াছিল। কিন্তু কখনও বুঝিতে দিতেন না, বা আমি বুঝিতে পারিতাম না, তিনি আমাকে শাসন করিতেছেন। আজকাল ছেলেদের দিনরাতে অন্ততঃ বার পঁচিশেক 'পড়' 'পড়' বলিতে হয়, তাহাতেও তাহাদের আগ্রহ বাড়ে না। পড়াতে মন বসে না। পিতৃদেবের মুখে পড়ো বলিতে শুনিয়াছি বলিয়া তো মনে পড়ে না। পিতৃদেব আমার সেই বাল্যকালেই আমাকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আশেপাশে সব ছেলে মেয়েদেরই 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করিতে পিতা মাতা বা অভিভাবকদের শুনিতাম। পিতৃদেবের প্রায়শঃ এইরূপ সম্বোধনে যখন আমার কিছু বোধ হইয়াছে তখন বেশ বিস্ময় লাগিত। কিন্তু পরে ওই বিস্ময়ের ভাব কাটিয়া যায়। পিতৃদেবের মধ্যে আত্মনির্ভর এবং আত্মপ্রত্যয় গুণটি প্রচুর মাত্রায় দেখিয়াছি। কোন কাজেই তিনি পরের উপর নির্ভর করিতেন না বা নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতেন না। সামান্য সামান্য ঘরকন্নার কাজও তিনি কখন করিতে অবহেলা করেন নাই। পিতৃদেব আদৌ বিত্তশালী ছিলেন না। পিতামহ এদিকে কখন নজরই দেন নাই। তাঁহার সন্তানদেরও এদিকে নজর দিতে দেখি নাই। পিতৃদেব সহরে যাহা কিছু রোজগার করিতেন তাহাতে আমাদের

ছোট সংসারটি নির্বিঘ্নে সহজেই চলিয়া যাইত। এই সহজ চলার জন্যই বোধ হয় লোকে মনে করিত আমরা স্বচ্ছল শুধু নই, অর্থসম্পদও আমাদের কিছু হইয়াছে। পিতৃদেব মিতব্যয়ী ছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় বিষয়ে অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। তাঁহার আত্মনির্ভর গুণটি তাঁহাকে আত্মপ্রত্যয়শীল করিয়া তোলে।

পড়াশুনা বা বিদ্যাচর্চার প্রতি আমার আগ্রহ পৈতৃক। পিতৃদেব বৈশাখমাসে ছুটির দিনে বাড়ীতে বসিয়া সুর করিয়া রামায়ণ পড়িতেন। বৃদ্ধারা শুনিতে আসিতেন। রামায়ণ পাঠে সমধিক প্রীতি পিতৃদেবের নিকট হইতে আমাতে অনুক্রামিত হইয়াছিল। পরে ইহার অনুশীলন বাড়িয়া যায়। প্রথম দিকে পিতৃদেব পড়া কিছু হয়ত দেখাইয়া দিতেন। কিন্তু তাঁহার আশ্চর্য নির্ভরতা! প্রথমে পাঠশালার গুরু মহাশয়ের উপর, পরে স্কুলে শিক্ষকদের শিক্ষা দানের উপর তিনি একান্তভাবে নির্ভর করিয়াছিলেন। আমার উপরও তাঁহার বিশ্বাস ছিল অগাধ। প্রবেশিকা পর্যন্ত বাড়ীর খাইয়া বাড়ীতে থাকিয়া পড়িয়াছি, রীতিমত পাঠাভ্যাস করি। গৃহ-শিক্ষককে কখনও একটি কপর্দকও দিতে হয় নাই। পিতৃদেবের আত্মনির্ভর গুণটি আমাতে অতিমাত্রায় অনুক্রামিত হইয়াছিল। পিতৃদেব পরের নিকট কিছু যাজ্ঞা করা বা প্রত্যেকটি কাজেই অপরের সাহায্য লওয়া পছন্দ করিতেন না। পাঠশালায় অধ্যয়ন কালে তিনি প্রতিমাসে নির্দিষ্ট দিনে গুরুমহাশয়ের দক্ষিণা চুকাইয়া দিতেন। তখনকার দিনে সামান্য দু'এক আনা বেতনও কত লোকে বাকী ফেলিয়া গুরুমহাশয়ের কষ্টের কারণ হইত। একই উচ্চ ইংরেজী স্কুলে আমি আট বৎসর পড়িয়া প্রবেশিকা পরীক্ষা দি'। স্কুলে ভাল ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলাম, বহু বৎসর বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথমস্থান লাভ করি। দেখিতাম কোন কোন ছাত্র দরিদ্র না হইয়াও পাঠোৎকর্ষের সুযোগ লইয়া অর্ধবেতন বা অবেতন দাবী করিতেছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ এই দাবী পূরণে প্রাণপণ করিতেছেন। পিতৃদেব কিন্তু এই সুযোগটি আদৌ গ্রহণ করেন নাই। উপরের শ্রেণীতে উঠিলে বেতনও বাড়িয়া চলে, পিতৃদেব নির্দিষ্ট হারে বেতন দিয়া চলিয়াছেন। ঐ সময় একটি বারের তরেও আমার মনে হয় নাই যে আমি একটু বলিলেই অর্ধবেতন বা অবেতনের সুযোগ লইতে পারি। পিতৃদেবের শিক্ষা অনন্যতুল্য। যাহার শক্তি আছে সে কেন সাহায্য চাহিবে? সাহায্য চাহিলে গ্রামের স্কুল চলিবে কিরূপে? এই সব

প্রশ্ন তাহার মনে নিশ্চিত বলবৎ ছিল। আজকাল পাড়াগাঁয়ের স্কুলেরও বেতন বাড়িয়াছে। তবে তাহাদের অনেকের ভাগ্যে নানাভাবে অর্থসাহায্য জুটিতেছে। ঐ সময় এমনটি সম্ভবপর ছিল না। আমাদের স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ইহার নামকরণ করেন সম্রাট পঞ্চম জর্জের নামে 'জর্জ হাই স্কুল'। কিন্তু ইহাতেও তখন সরকারী সাহায্য মিলে নাই।

পিতৃদেব যাহা আয় করিতেন তাহাতে আমাদের সংসার মায় পূজা পার্বণের খরচা চলিয়া যাইত। প্রবেশিকা পর্যন্ত কাহার নিকট আমার জন্য হাত পাতিতে হয় নাই। তবে বিদেশে বিভুঁইয়ে থাকিয়া কলেজের ব্যয় সম্পূর্ণ বহন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। কাজেই কলেজে যখন পড়ি তখন যাবতীয় খরচের অর্ধেকটা আন্দাজ তিনিই দিতেন, বাকিটা আহারাদির ব্যয় অন্যভাবে মিটাইতে হইত। মফস্বলের কলেজে আই, এ পড়ি। প্রথম বৎসর যে বাড়ীতে আহারাদির ব্যবস্থা হয় সেখানে তিনটি ছাত্র পড়াইতে হইত। গ্রামে থাকিতাম কলেজে যাইতাম। এ স্থান হইতে বাগেরহাট কমসে কম আড়াই মাইল দূরে। মাঝখানে একটি নদী। খেয়ায় দুবেলা পার হইতে হইত। দ্বিতীয় বর্ষে কলেজের কিছু নিকটে একটি বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা হয়। এখানেও তিনটি ছাত্র পড়াইতে হইত। কলিকাতায় বি, এ, পড়িতে আসি। এ সময়েও পিতৃদেব প্রতিমাসে যথাসাধ্য মাসহারা পাঠাইতেন। অর্ধেক ব্যয় এখানেও আমাকে মিটাইতে হইত। এই সময় পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ আমাকে পুত্রবৎ স্নেহে আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া আমার কলিকাতা বাস এবং কলেজে পড়া সম্ভব করিয়া দিলেন। আমি এম, এ একবৎসর পড়ি। পিতৃদেবের বড় ইচ্ছা আমি উচ্চতম শিক্ষা সমাপন করিয়া কর্মজীবন স্থরু করি। কিন্তু নানারকম দুর্বিপাকে সে আশা পূর্ণ হইল না। কর্ম-জীবন স্থরু করিবার পরে তাঁহার ইচ্ছা পূরণের বাসনা করিয়াছিলাম ; কিন্তু তাহাত আর হয় নাই। গত ত্রিশ বৎসরে এই সংসারে মানুষের মত বিচরণ করিতে গিয়া কত দুঃখ দুর্গতিরই না সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। মনে মনে ভাবি, পিতৃদেবের বাসনা পূরণ করিতে পারিলে হয়ত এ রকম বিপর্যয় ঘটিত না। পল্লীবাসী হইলেও তো পিতৃদেব বাঙ্গালীই ছিলেন। বাঙ্গালীর চিত্তবৃত্তি বা মানসিকতা যে উপাধির গণ্ডী ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই ইহা হয়ত তিনি দিব্য চক্ষে দেখিয়া থাকিবেন।

যাক, অনুশোচনা কখনও করি নাই, এখনও করিব না। কারণ

অনুশোচনায় কষ্টের বৃদ্ধি ছাড়া লাঘব হয় না। আমার উপর পিতৃদেবের বিস্তর আস্থা ছিল, বাড়ীতে থাকিতেই তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম। আমার একটি বন্ধু জুটিল, আমার চেয়ে দু' ক্লাস উপরে শহরের সরকারী স্কুলে পড়ে। গ্রীষ্ম ও পূজার ছুটিতে প্রতিদিন বৈকালে অন্ততঃ চার পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া তাহার সঙ্গে কাটাইতাম। কোন কোন দিন বাড়ী ফিরিতে অনেক রাত্রি হইয়া যাইত। তিনি জানিতেন আমি কোথায় যাই এবং কাহার সঙ্গে মিশি। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। তাঁহার কথাবার্তা বা হাবভাবে আমার প্রতি বিরক্তির আভাসটুকু মাত্র পাই নাই।

এই বন্ধুটির কাছে ইংরেজী, বাংলা কত বই, পত্র, পত্রিকা দেখিতাম, পড়িতাম বাড়ী লইয়া আসিতাম। দেশ-বিদেশের কত কথা তাহার মুখে শুনিতাম।

আমার প্রতি পিতৃদেবের অগাধ বিশ্বাস আমাকেও যেন বিশেষ দায়িত্বশীল করিয়া তুলিল। ইংরেজী কথাটি 'trust begets trust' এর যথার্থতা যেন পিতৃদেবের আচরণের মধ্য দিয়া আমার নিকট মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই বিষয়ের আর একটি দৃষ্টান্ত দি'।

ডায়ার্কির আমলে প্রথম সাধারণ নির্বাচন আসন্ন। ভোট ভিক্ষার তোড়জোড় চলিতেছে। পাঞ্জাবের অনাচারের অজুহাতে কংগ্রেস-পক্ষীয়েরা প্রথম নির্বাচন হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। অন্যেরা রহিলেন। আমরা একজন প্রার্থীর স্বপক্ষে ভোট ক্যানভাস করিতে লাগিলাম। পার্শ্ববর্তী গ্রামের জমিদার রায়বাহাদুর প্রার্থী হইয়াছেন। কিন্তু লোকে তাহার উপর খুবই চটা, কারণ তিনি সাধারণের উপকার কিছু করেন না এই অভিযোগ। আমরা অন্যের স্বপক্ষে এবং তাহার বিপক্ষে ভোট ক্যানভাস করিয়াছি এবং আরও শুনিলাম যে আমি (স্কুলের ছাত্র মাত্র) ঐ দলের লিডার। রায় বাহাদুর পিতৃদেবকে ডাকাইয়া বিশেষ অনুযোগ করিলেন। তিনি বাড়ীতে আসিয়া আমাকে মৃদু ভর্ৎসনা করিলেন। তাঁহার মুখে কু-কথা এই প্রথম শুনি। বড়দিনের ছুটি হইয়া গিয়াছে। আমি পরদিনই জেলা শহর দেখিতে যাইব বলিয়া বাহির হইলাম। পিতৃদেব বাধা দিলেন না, সামান্য কিছু পাথেয়ও দিয়াছিলেন। সাত আট দিন পরে বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম পিতৃদেব সব ভুলিয়া গিয়াছেন। আমি যে অতটা পথ একা একা হাঁটিয়া আসিলাম ইহাতে তিনি আনন্দই বোধ করিলেন। আমার উপর তাঁহার আস্থার কথা ভাবিয়া আজও আনন্দে আপ্লুত হই।

কলেজে পড়িতে হইবে তো, গ্রাম থেকে দূরে—এত দূরে যাইতে হইবে এ তাহারই প্রস্তুতি। কিন্তু তাঁহার অফুরন্ত স্নেহ মমতার নিদর্শন না কতবারই পাইয়াছি। বাড়ী হইতে প্রতিবেশীর নৌকায় সকালে শহরের কলেজে রওনা হইয়াছি। প্রতিবেশী বয়সে আমার চেয়ে ঢের বড়, এবং সম্পর্কে দাদা। খাল ধরিয়া নৌকা কিছু দূর অগ্রসর হইলে তিনি আমাকে বলিলেন—"ভাই, তোমার বাবা তোমাকে এত ভালবাসেন। নৌকার কাছে আসিয়া তাঁহার কি কান্না। যাতে আমি তোমাকে ভালমত পৌছাইয়া দি, এই কথা বলা আর কান্না।" আমি তখন ততটা খেয়াল করি নাই। আমার প্রতি তাঁহার মমতা থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? এই শহরে বা কলিকাতায় অবস্থান কালে আমার পত্র পাইতে বিলম্ব হইলে পিতৃদেব কত অনুযোগ করিয়া পত্র দিতেন। একবার পত্র লিখিতে বেশ কিছুদিন দেরী হইয়া গেল। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে একদা দেখা করিতে যাই। যেমন মাঝে মাঝে যাইতাম, এ দিনও তেমনি। অতঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ, কিন্তু আজ আমাকে দেখিয়াই তো চটিয়া আগুন। "তুমি তোমার বাবাকে পত্র দাও নাই। এই দেখ বড়দুঃখ করিয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছেন।" আমি লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলাম। "আজই উত্তর দিব" বলিলে একেবারে জল হইয়া গেলেন। তারপর বলিলেন "তোমরা ছেলেমানুষ বোঝ না ছেলের খবর না পেলে বাবার প্রাণ কেমন উতলা হয়। তোমার বাবাও তাই হয়েছেন। তোমরা বড় হও পরে বুঝবে।" ইত্যাদি ইত্যাদি। পূর্বেকার সমাজ-ব্যবস্থা আজ প্রায় ভাঙিয়া গিয়াছে। ছোট ছোট পরিবার লইয়া আমরা শহরবাসী হইয়া পড়ি। সন্তানের সংবাদ না পাওয়া জনিত দুঃখ আমাদিগকে স্পর্শিবার আর সুযোগ পায় না। কিন্তু অন্য নানাভাবে আমাদের দুঃখ কষ্ট বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই একটুও।

পিতৃদেবের জীবনী লিখিতে বসি নাই। কিন্তু জীবন সায়াহ্নে তাঁহার চরিত্র মহিমা যেরূপ উজ্জ্বলভাবে চোখের সম্মুখে নিয়ত ভাসিয়া উঠিতেছে তাহারই একটু আভাস মাত্র দিবার চেষ্টা করিলাম। আর দু একটি কথা বলিয়া আজিকার মত পিতৃতর্পণ শেষ করিব। আমার জ্ঞান হওয়া অবধি পিতৃদেবের মধ্যে একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতাম—সেটি তাঁহার সহজ স্বাভাবিক ধর্মপ্রবণতা। হিন্দুর ঘরে বার মাসে তের পার্বণ তাহাতে আর আশ্চর্য কি? বাড়ীতে পূজা-আর্চা হইত। আমরা সাধারণ মধ্যবিত্ত

গৃহস্থ। সাড়ম্বরে না হইলেও হইত। মনসাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, নবান্ন ও পার্বণ, সরস্বতী পূজা, বিভিন্ন ব্রতোপলক্ষে পূজাদি কত কি হইত। কিন্তু দুর্গোৎসবের জন্য আমরা যাবতীয় বালকবৃদ্ধ যেন উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিতাম। দুর্গোৎসব—কতকটা সাড়ম্বরেই হয়। এ পূজা তখন আমাদের পৈতৃক। এই দুর্গাপূজার সময় পিতৃদেবের ধর্মনিষ্ঠতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই তিন দিনের মহাপূজা শেষে প্রত্যহই অঞ্জলি দানের ব্যবস্থা। কোন কোন বৎসর মনে হয় প্রায়ই বেলায় তিথি আরম্ভ হইত। দিবসের তৃতীয় বা চতুর্থ যামে পূজা শেষ হইবার পর অঞ্জলিদানের পালা। পিতৃদেব উপবাসী থাকিতেন, অন্যেরাও থাকিতেন। আজকালকার মত চা পান করিয়া বা মিষ্টান্ন খাইয়া উপবাস করা নহে। একেবারে নিরম্বু উপবাস। একবার পূজার পূর্বে তাঁহার পায়ে লোহা ফুটিয়া উহা ফুলিয়া যায়। রুগ্ন বা ক্ষত দেহে অঞ্জলি দিতে নাই, তিনি পারিলেন না। তখন তাঁহার অন্তরে যেন কি একটা জ্বালা উপস্থিত হইয়াছিল। বাহিরে প্রকাশ নাই, কিন্তু তাঁহার হাবভাব দেখিয়া বুঝিতাম। এখানে ধর্মপ্রবণতার একটি মাত্র উদাহরণ দিলাম। লৌকিক ব্যাপারেও তাঁহার ধর্মবোধ এবং সততা কতই না লক্ষ্য করিয়াছি। দৃষ্টান্ত দিয়া আর কাহিনী বাড়াইব না। তবে একথা বলিতে পারি, আত্মীয় স্বজনের অনুরোধ উপরোধ তাঁহাকে ধর্মপথ বা ন্যায়ের পথ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই।

পিতৃদেব আমোদপ্রিয় লোক ছিলেন। গানবাজনায় তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ দেখিয়াছি। তাঁহাকে কখন কখন বলিতে শুনিতাম, মার মৃত্যুর পর গান বাজনায় তাঁর মন তেমন আর সাড়া দেয় না। দুর্গাপূজার এক প্রধান অঙ্গ আরতি। পিতৃদেব ঢাক এবং কাঁসি লইয়া নিজেই বাজাইতে সুরু করিয়া দিতেন, অপরের তাল বেতালের বাজনা হইলে তো কথাই নাই। পল্লীগ্রামে সংকীর্তন এক প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। ইহাতে তিনি পূর্ণ ভাবে যোগ দিতেন। আমরা বড় হইয়া বড় একটা দেখি নাই তবে গ্রামের সাধারণ আমোদ-অনুষ্ঠানে তাঁহার উৎসাহ সমানে লক্ষ্য করিয়াছি। প্রতি বৎসরই প্রায় আমাদের বারোয়ারী তলায় কবিগানের আয়োজন হইত আমাদের ছেলে বেলায়। কবিগান হইবে কত উদ্যোগ আয়োজন। তিনি এই উদ্যোগ আয়োজনে নানাভাবে যোগ দিতেন। রামায়ণ গান, কথকতা প্রভৃতি গ্রামে হইত। ইহাতেও তাঁহার সমান অনুরাগ। দুর্গাপূজার সময় প্রতিমা-

নিরঞ্জন ও-অঞ্চলে এক বিশেষ উৎসব। বড় নৌকায় করিয়া দুর্গা প্রতিমাকে নদীতে লইয়া যাইতে হইবে। বড় নদী বাড়ী হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে। পিতৃদেব এই আয়োজনেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন। প্রথম মহাসমরকালে ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিবারের যাহারা ব্যবসায় কর্মে লিপ্ত ছিলেন, এবং ইহার অংশীদের কাহারও কাহারও অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়াপড়িল। পিতৃদেব, যতদূর স্মরণ হইতেছে, পূজার ব্যয় তখন প্রায় সমস্তটাই নিজেই বহন করিতেন। পূজায় আড়ম্বরের হ্রাস পাইল। নদীতে দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জনে একটা বাধাও উপস্থিত হয় কাছাকাছি সময়ে। মুসলমানেরা সচেতন হইয়া উঠিল। নৌকায় প্রতিমা তুলিলে তাহাদের ধর্মের গায়ে আঁচড় লাগিবে। মৌলবীরা এইরূপ কথা পাড়িল। মুসলমানদের বড় নৌকা পাওয়া কঠিন হইল। প্রতিমা নিরঞ্জন বাড়ীর খালেই হইত। নিরঞ্জনান্তে বাড়ীতে আসার পথে একপ্রকার গান হইত। পিতৃদেব কখন কখন মূল গায়েন হইতেন। পিতৃদেবের আমোদ-প্রিয়তার দৃষ্টান্ত আরও কত পাইয়াছি। আজ তাঁহার কথাই বলিতে যাইয়া কত ঘটনাই না চোখের সামনে জীবন্ত হইয়া উঠিতেছে।

পিতৃদেব নিজের নামের মূল অংশ বানান ও উচ্চারণ করিতেন 'জগবন্ধু'। ও-যুগে এইরূপ লেখা রেওয়াজ ছিল। 'ছুঁছুন্দরী বধ কাব্য' প্রণেতা জগবন্ধু ভদ্রের কথা আপনারা অনেকেই জানেন। পিতৃদেবের এই নামটি সত্য সত্যই সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। তিনি বাস্তবিকই গ্রামের ভিতরে ও বাহিরে সকলেরই বন্ধু বা মিত্র বলিয়া পরিগণিত হন। তাঁহার শেষ বয়সে কঠিন পীড়া হইল ; আত্মীয় স্বজন ব্যতিরেকে পাড়া প্রতিবেশীরাও তাঁহার শয্যা-পার্শ্বে হামেসা আসিয়া সান্ত্বনা দিতেন। কয়েকজনকে আহার নিদ্রা ভুলিয়া সেবা শুশ্রূষায় রত থাকিতেও দেখিয়াছি। তাঁহাদের অনেকে এখন মৃত কেহ বা জীবিত। এই অবসরে তাঁহাদের প্রত্যেককেই আমার অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানাই। অসুখের মধ্যেই সহর হইতে পিতৃদেবের এক সহকর্মী আসিলেন। নিকটে বসিয়া মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইবার পূর্বেই কি অঝোরে কান্না। তাঁহার কান্না দেখিয়া আমাদেরও চোখে জল আসিল। তিনি কিছুক্ষণ থাকিয়া একটু শান্ত হইয়া, রোগীকে দু'চারটি কথায় সান্ত্বনা দিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার ঐরূপ আকুল ক্রন্দনে রোগীর অবস্থা যে খারাপ হইতে পারে একথা আমাদের কাহারও মনেই আসিল না। পিতৃদেবের কোন শত্রু ছিল না। তিনি ছিলেন সত্য সত্যই অজাতশত্রু।

———

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-১২